মতিউর রহমান মল্লিক

# র•চ•না•ব•লী

২য় খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী

## দ্বিতীয় খণ্ড

দেশজ প্রকাশন

www.nagorikpathagar.org

মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী
দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
আবুল আসাদ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ
ড. আ জ ম ওবায়েদুল্লাহ
মোশাররফ হোসেন খান
সোলায়মান আহসান
তাফাজ্জল হোসাইন খান
সাইফুল্লাহ মানছুর
সাবিনা মল্লিক
কামরুন্নেসা মাকসুদা
ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
নাঈম আল ইসলাম মাহিন

সহকারী সম্পাদক
আফসার নিজাম
ইয়াসিন মাহমুদ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪
গ্রন্থস্বত্ব : কবি পরিবার
প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

প্রকাশক
মনোয়ারুল ইসলাম
দেশজ প্রকাশন, ক-১৫/২/এ, বি-১, (৩য় তলা),
জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯
মোবাইল: ০১৭০৮১৬৯৩৩৮,
ই-মেইল : deshoz2017@gmail.com
ISBN : 978-984-98985-8-0
মূল্য : ৬১০/ (ছয়শত দশ টাকা মাত্র)।

www.nagorikpathagar.org

# সম্পাদকের কথা

বর্তমান সেক্যুলার সভ্যতার অন্যতম জনক আর্নল্ড টয়েনবী বলেছেন, 'জগতের মৌলিক মহৎ সৃষ্টি ও কাজ ঈশ্বরের ইশারা থেকে হয়'। একজন খুব বড় চিকিৎসক তাঁর মেটেরিয়া মেডিকায় বলছেন, 'চিকিৎসা আমরা করি না, ঈশ্বর করেন। ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি কোনো ফল হয় না। হঠাৎ একদিন মাথায় এসে নতুন চিন্তার উদয় হলো। ঔষধ দিলাম, রোগ চলে গেল। এই চিন্তা আমার নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা'। জগতের বিস্ময়কর সব মহৎ কর্মের ব্যাখ্যা এটাই। মহান আন্দোলন হোক, মহৎ মহাকাব্য হোক- সব মৌলিক চিন্তা ও সৃষ্টির পেছনে এবং মহৎ পরিবর্তনের মধ্যে থাকে দয়াময় আল্লাহর ইচ্ছা। বাংলা গানের জগতে মতিউর রহমান মল্লিকের রেনেসাঁর কথা যখন চিন্তা করি, তখন এটাই মনে হয় যে, বাংলা গানের এই রেনেসাঁ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা ও প্রেরণার ফল।

মল্লিকের লিখা গান, মল্লিকের গাওয়া গান বাংলা গানের চলমান ধারায় একটা বড় ঝড়, একটা বড় সয়লাব। কিন্তু এটা ধ্বংসের নয়, সৃষ্টির। বাংলা গানের চলমান ধারায় মল্লিকের গান নিয়ে আসে শক্তিমান ও সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, লক্ষ্যকে করে সুনির্দিষ্ট। এই ক্ষেত্রে মতিউর রহমান মল্লিকের কোনো পূর্বসূরী নেই। মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যে আমরা আজান শুনি, কিন্তু সেটা বিলাপের মতো। তা মসজিদের দরজা খোলে না, মুসলিম টানে না। দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন-ইসলামের লাল মশাল,' 'বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান, 'ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ইত্যাদির মতো হাজারো যুগান্তকারী কথা আমরা মহাকবি নজরুলের কবিতা-কাব্যে পাই। এগুলো আমাদের জন্যে মূল্যবান পাথেয়, কিন্তু পথ আমরা পাই না, পথের ঠিকানা এখানে নেই। আধা-অন্ধকার সেই যুগে মহাকবি নজরুলের পক্ষে তা দেয়া সম্ভবও ছিল না। ইসলামের কবি মহাকবি ফররুখ তাঁর কাব্য-মহাকাব্য-কবিতায় হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। চেয়েছেন সেই রাজতোরণের দিকে মুসলমানদের আবার নতুন অভিযাত্রা হোক। তাই তিনি 'রঙীন মখমল দিন' এর শেষ ঘোষণা করে 'মাঝি সিন্দাবাদ'কে 'নতুন পানিতে' সফরের জন্যে 'হালখুলে' দিতে বলেছেন। এখানে ফররুখ স্বাপ্নিক মহাকবি, বাস্তবের নায়ক তিনি নন। তিনি মঞ্চ পাননি, সামনে মানুষও পাননি। কিন্তু কবি মতিউর রহমান মল্লিক বাস্তবেরও নায়ক। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন, আবার মঞ্চে তিনি তাঁর গানের গায়কও। তিনি স্বাপ্নিকমাত্র নন। তাঁর আহ্বান সুনির্দিষ্ট,

www.nagorikpathagar.org

চাওয়া একেবারে সুস্পষ্ট। তাঁর গান দেশে 'পূর্ণ ইসলামী সমাজ' দাবি করে। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির জন্যে 'রাশেদার যুগ' ফিরে পেতেও তাঁর গান উচ্চকণ্ঠ। সবার উপরে কবি মতিউর রহমান মল্লিক সৌভাগ্যবান যে, তাঁর অবর্তমানে তাঁর এই গানের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়নি, ধারাবাহিকতা ধারণের জন্যে অব্যাহত পতাকাবাহীদের তিনি পেয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুল, কবি ফররুখের মতো কবি মতিউর রহমান মল্লিকও গানের জগতে একজন যুগস্রষ্টা। সফল ও ক্রমবর্ধমান একটা নতুন ধারার তিনি জনক এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অনন্যও। কবি নজরুল, কবি ফররুখ, গায়ক আব্বাস উদ্দিন মুসলিম জনতাকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যে জাগরণের বীজ তাঁদের মনে বপন করেছিলেন, সে জাগরণকে কবি মল্লিক ভাষা দিয়েছেন, পরিচয় দিয়েছেন, পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। একটা উপযুক্ত সময়ে, প্রয়োজনের মূল্যবান মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একটা ইচ্ছা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

কবি রবীন্দ্রনাথ, কবি নজরুলদের বিশাল সাহিত্য-কর্মের মতো নয় কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সাহিত্যকর্ম। তবে সংখ্যা দিয়ে সব সময় সাফল্য বিচার হয় না। ম্যাক্সিম গোর্কির এক 'মা' উপন্যাস রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছিল মধ্যমণি। একটা গান, একটা কবিতা, এমনকি একটা কথাও বদলাতে পারে অনেক কিছুই।

অপরিণত বয়সে সবাইকে কাঁদিয়ে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক। এই যুগস্রষ্টা কবির সাহিত্য-কর্মকে সংগ্রহে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফল হিসেবে মতিউর রহমান মল্লিক রচনাবলী প্রকাশিত হলো। আমরা আশা করছি এতে মানুষের চাহিদা পূরণ হবে ইনশাল্লাহ।

মল্লিক রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে ১টি কবিতার বই– চিত্রল প্রজাপতি; ৩টি গানের বই– শপথের শ্বেত পতাকা, হৃদয়ে হৃদয় রাখি, চিরকালের গান; ১টি ছড়ার বই–আসলো একুশ আসবে একুশ; এবং ২টি প্রবন্ধের বই–নির্বাচিত প্রবন্ধ ও সংস্কৃতি সংকলিত হয়েছে।

আবুল আসাদ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থিত বইসমূহ


**কবিতার বই**

চিত্রল প্রজাপতি ১১

**গানের বই**

শপথের শ্বেত পতাকা ৫৯

হৃদয়ে হৃদয় রাখি ১০১

চিরকালের গান ১৪৫

**ছড়ার বই**

আসলো একুশ আসবে একুশ ১৯৫

**প্রবন্ধের বই**

নির্বাচিত প্রবন্ধ ২২৫

সংস্কৃতি ৩৪৯


www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# চিত্রল প্রজাপতি

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

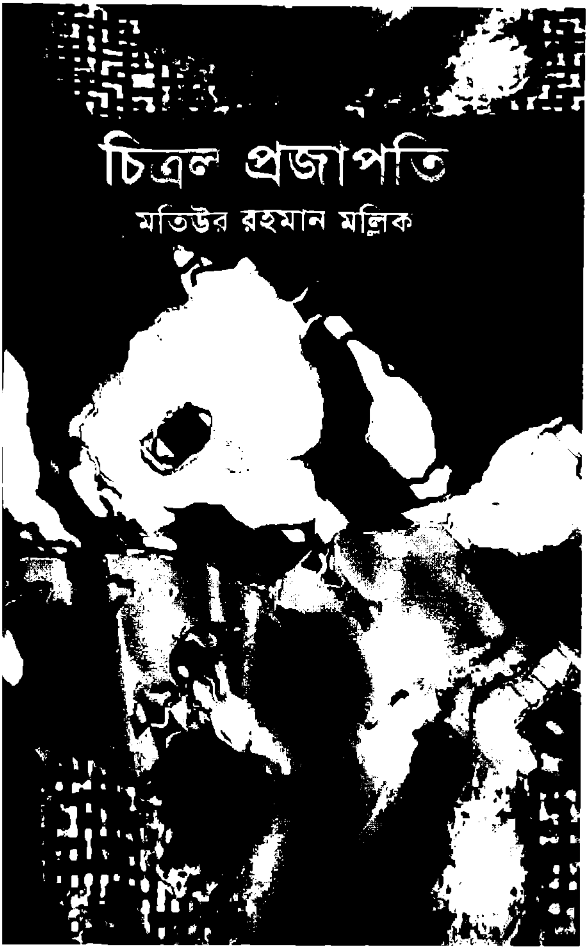


www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিত্রল প্রজাপতি'। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন আফসার নিজাম। বইটি প্রকাশ পায় ২০০৭ সালের অমর একুশের গ্রন্থমেলায়। প্রফেসরস পাবলিকেশন্স এর স্বত্বাধিকারী এ এম আমিনুল ইসলাম বইটি প্রকাশ করেন। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেন কবি ও প্রকাশক নাজমুস সায়াদাত। গ্রন্থস্বত্ব ছিলো কবিপত্নী সাবিনা মল্লিকের নামে। বইটির দাম রাখা হয়েছিলো ষাট টাকা মাত্র। বইটি কবি আল মাহমুদকে উৎসর্গ করে উপঢৌকন স্বরূপ 'কবি সম্রাট' নামে একটি কবিতা লিখেন উৎসর্গ পত্রে। বইটিতে মোট ৪১টি কবিতা স্থান পায়। বইটির পিছনের কভারে উৎকীর্ণ ছিলো কয়েকটি কাব্যপঙ্ক্তি–

"শিল্পীর আঁকা বই উড়ে যায়
বাতাসের নদী ছুঁয়ে দূরে যায়
স্বপ্ন সেলাই করে চলে যায়
রঙের গল্প খুলে বলে যায়

যায় উড়ে কবিতার সিম্বল
যায় উড়ে প্রজাপতি চিত্রল।"

www.nagorikpathagar.org

## সূচিপত্র

কবি সম্রাট/ ১৭
বৃষ্টিরা/ ১৮
বৃক্ষ এবং মানুষ/ ১৯
তুমি একটা নদীই/ ২০
ভাষা ও প্রবাস/ ২২
মৃত্তিকা অথবা আভিজাত্য/ ২৩
মুখর মানুষ/ ২৪
আর কোনো বন্ধন নেই/ ২৫
মনের মধ্যে মন/ ২৬
নতুন অভিজ্ঞানে/ ২৭
খ্যাতি/ ২৮
পদ/ ২৯
ত্যাগ/ ৩০
নিজাম এবং বাসিরের ভূগোল/ ৩১
দূর/ ৩২
পাতার বৃত্তান্ত/ ৩৩
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভেতরে/ ৩৪
অভিনয় পুরুষ/ ৩৫
কবিতা/ ৩৬
মাত্রাবৃত্ত/ ৩৭
নতুন চাঁদ/ ৩৮
সেই চাঁদ/ ৩৯
চাঁদের ভেতর/ ৪০
ফররুখ আহমদ/ ৪১

www.nagorikpathagar.org

বিজয় সরণি দিয়ে/ ৪২
রাসূল (সা.)/ ৪৩
আসবে নতুন স্রোতধারা/ ৪৪
মুখোমুখি/ ৪৫
ফলক কবিতা/ ৪৬
অস্ত্রের ভাষা/ ৪৭
একটি লোকের জন্যে/৪৮
অজেয়/ ৪৯
শোধ/ ৫০
বীজ/ ৫১
পথিক/ ৫২
শহীদ বেলাল/ ৫৩
হৃদয়/ ৫৪
বসন্ত বাও/ ৫৫
না গেলেও তো পারি/ ৫৬
শীতের লিমেরিক/ ৫৭
মানবতাবাদী/ ৫৮

www.nagorikpathagar.org

# কবিসম্রাট

[উপঢৌকন– আল মাহমুদ পরম শ্রদ্ধেয়]

তাঁকে শুধু বলা যায় কবিসম্রাট
কবির কবিও তিনি মেজর পোয়েট
ক্রমাগত খুলেছেন ভাষার কপাট
কবিতার আকাশের: অমর সনেট

আমাদের কবিগুরু–পরম পুরুষ:
বিশ্বাসী পৃথিবীর পূর্ণ নায়ক
পাথেয় বাংলাদেশ: বৈশ্বিক হুঁশ
শব্দের যাদুকর: গূঢ় বিধায়ক

পৃথিবীর পথে তাঁর মিত্র অনেক
[হুতুম প্যাঁচারা অরি সূর্যোদয়ের]
শত্রুর ধারাপাত মাত্র কয়েক
অশেষ সম্ভাবনা জগৎ জয়ের

বুকের গভীরে তাঁর মাটি-নদী-মাঠ
তাঁকে শুধু বলা যায় কবিসম্রাট।



www.nagorikpathagar.org

# বৃষ্টিরা

ঐকতানের মতো পবিত্রতম বৃষ্টিরা নাজিল হয়ে যায়
শুভ্র এবং শুভ্রতার মতো
নরম কাশফুলেরা নেমে আসে আকাশ থেকে
অথবা কোমল উপলব্ধির মতো
স্বপ্নের পাখিরা একই সঙ্গে
ডানা মেলে দিলো পৃথিবীর ওপর

বৃক্ষের ওপর প্রেমের প্রথম কান্নারা
ঝরে ঝরে পড়ে
দিগন্তের দিকে ছড়িয়ে যায়
আনন্দের প্রথম উচ্চারণের মতো
ভালোবাসার শব্দাবলী

এবং পাতায় পাতায় নাচতে থাকে
হৃদয়ের অজস্র দম্পতির প্রথম শিহরণ
যেমন এক অথৈ তন্দ্রার মধ্যে
ওঠানামা করে জীবনের পেন্ডুলাম।



www.nagorikpathagar.org

# বৃক্ষ এবং মানুষ

কোনো কোনো বৃক্ষের হস্ত, সমস্ত হস্তই প্রসারিত থাকে
একেক সময় সেই সব হাত থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ে
সৌরভের মতো অপার্থিব আনন্দ, উপঢৌকনের মতো
সুমিষ্ট পসরা অথবা উপকারের মতো নানাবিধ উদ্যোগ

একেক সময় কোনো কোনো বৃক্ষের প্রয়োজন বেড়ে যায়
এবং উৎপাদনের মতো উদযাপন থাকে বলে
প্রশংসাপত্রের মতো সনদপত্রও বেড়ে যায়
বেড়ে যায় বাড়াবাড়ির মতো অতিশয় কথামালা

একেক সময় কল্যাণ সংস্থার মতো বৃক্ষের প্রভাবের মধ্যে
এসে পড়ে তৃষ্ণার মতো পশুরা এবং বিশ্রামের মতো অসংখ্য প্রাণীকূল
কখনো অর্থকড়ির মতো অঢেল মৌমাছিরা
অথবা এসে পড়ে লালসার মতো নেশাগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা

তারপর একেক সময় কোনো কোনো বৃক্ষের পত্রত্ব থাকে না বলে
এবং পুষ্প অথবা ফলাফলের মতো নিবিড় নিমন্ত্রণ থাকে না বলে
পড়ে থাকে অন্য এক বৃক্ষের মতো ভাগ্যহীন ভাগাড়ের অভ্যন্তরে

তবুও কোনো কোনো বৃক্ষ আগাগোড়াই বৃক্ষ থেকে যায়
অর্থাৎ অনন্তকাল পর্যন্ত ভ্রুক্ষেপহীনতার মতোন
কোনো কোনো বৃক্ষের একটি সুনাম আছে
নৈঃশব্দের মতো উপেক্ষার কঠোর ভাষা আছে
ঔদার্যের মতো দাঁত ভাঙ্গা জবাব আছে, তাছাড়া...

বস্তুত কোনো কোনো বৃক্ষের অনুষঙ্গে
কোনো কোনো মানুষের অজস্র ছবি তুলে রাখার অনন্ত দরকার থেকে গেল।



www.nagorikpathagar.org

# তুমি একটা নদীই

[রেলিং ধরা নদীর কবি আবদুল হাই শিকদারকে]

তুমি নদী–
তুমি একটা নদী
শেষ অবধি
বিরামহীন ভাঙন এ-পারের, পত্তন ও-পারের
ঘর-বাড়ি-বাঁশঝাড় জোছনাসহ;
হঠাৎ হঠাৎ উধাও অহরহ

আবার নতুন পলিজমি
ঘাস
পাখি– কত ডাকাডাকি
নদী– রেলিং ধরা নদীর রোদন
অবহিত ক'জন
চঞ্চলা ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঢেকে রাখে
অনবরত আপনাকে

নাচের আড়ালে কাঁদে গোঙানীর শব্দো অধীর
যেন পাখির ওড়াল প্রচ্ছদে স্পষ্ট
তো অস্পষ্ট ডানার কষ্ট।



www.nagorikpathagar.org

তবুও উপচে পড়ো একদা বানের মতো
ক্ষুব্ধ ও উদ্ধত
তবুও ছড়িয়ে যাও প্রান্তর-জনপদ
মুছে ফেলো গচ্ছিত সম্পদ

তবুও স্বপ্ন তোমার সমুদ্র-
সমুদ্র অসীম ও রুদ্র
আবার হারানোর গৌরব একান্ত কল্লোল
ঐকান্তিক কলোরব।



www.nagorikpathagar.org

## ভাষা ও প্রবাস

কেউ এসেছিল গভীর গাঁয়ের লোক
কেউ এসেছিল কাশফুল হার মানে
কেউ এসেছিল সাধারণ ক খ গ ঘ
কেউ এসেছিল মোটামুটি এ বি সি ডি

তবুও সকলে আমূল বাংলাদেশ
বাংলাদেশের নদ-নদী-মাঠ-ঘাট
একসংসার– বহু চেনা-জানা-শোনা
অবিকল গৃহ অথবা মাতৃভূমি

কেউ আমেরিকা কেউ যে বাগেরহাট
চোখাচোখি হলো মুখোমুখি হলো খুব
ভাষাই কেবল মাঝখানে যবনিকা
খোশ-গল্পের পাট চুকে গেছে কবে।



www.nagorikpathagar.org

# মৃত্তিকা অথবা আভিজাত্য

শরীর নিয়ে কে না ভাবে?
নদীও ভাবে এবং নদীর নায়কও ভাবে
ঢেউয়ের সাথে যার চিরদিন জানাজানি
সাগর নিয়ে যার চিরকাল চিন্তা-ভাবনা
অথচ তার রহস্যময় তলদেশ
বেগানা কারো জন্যে সে কখনো
খুলে দেয়নি।

শরীর নিয়ে কে না ভাবে?
অকুণ্ঠ আকাশেরও উদ্যোগ দেখি
না হলে সে নীলিমা হতো না
না হলে সে মৃত্তিকারও ঐশ্বর্য হতো না
আর দিগন্তের মতো আভিজাত্য কখনো
নির্লজ্জ হয় না।



www.nagorikpathagar.org

# মুখর মানুষ

[মীর কাসেম আলী পরমশ্রদ্ধেয়]

বিরাট বুকের পাটা আছে ক'জনের?
বিশাল হৃদয় নিয়ে চলে কয়জনা?
অনেক দৃষ্টি ঝরে সে-কোন নয়নের?
কান্না শোনার কার সে শ্রবণ বন্ধনা?

খুব বেশি নেই পরিশ্রমের এ-উপমা।
আছে নাকি সংস্কৃতির এমন কৃষক!
অশ্রু ঝরার নাকি আছে এ-তুলনা!
পণ্য বয়ে নিয়ে চলার এ-সড়ক।

স্বপ্নগাঢ় একাই একটা প্রতিষ্ঠান
শুদ্ধতম পথের প্রিয় বীরপ্রতীক
চরিত্রময় রাষ্ট্রনীতির অভিজ্ঞান
এ-এক পুরুষ কথা-কাজে বাস্তবিক।

অনেক মানুষ, এমনি মানুষ– হোক আরো;
এমনি মুখর, এমনি মহৎ– লোক আরো।



www.nagorikpathagar.org

# আর কোনো বন্ধন নেই

এই ঘর
শুকনো পাতার এই নিগূঢ় কুটির ছাড়া
আমার আর বিশ্রামের কোনো কৌলিন্য নেই

সুতরাং থাকবে কি থাকবে না তা তোমারই সংপ্রায়
এবং কোনো কোনো অপরিহার্য উচ্চারণ করবে কি করবে না
তাও তোমারই সংপ্রায়
এবং কোনো কোনো অপরিহার্য পঙ্‌ক্তিও রোপিত করবে কি করবে না
তাও তোমারই সংপ্রায়

মূলত আমার কোনো মুদ্রা নেই
এবং মুদ্রার প্রতি শেষ পর্যন্ত
আমার কোনো দৃঢ়তাও নেই
অর্থাৎ মুদ্রার সংগে চরিত্রের
অথবা মুদ্রার সংগে বসবাসের
প্রথমাবধি যতটুকু সম্পর্ক আমার
হৃদয়ের পক্ষে
আমি তারও চেয়ে অনেক বিশ্বস্ত

নুরুল আহসান, তুমি যা-ই বলো না কেনো
হৃদয়ের বন্ধন ছাড়া আর কোনো বন্ধন নেই আমার

এই ঘর
শুকনো পাতার এই নিগূঢ় কুটির ছাড়া
আমার আর বিশ্রামের কোনো কৌলিন্য নেই।



www.nagorikpathagar.org

# মনের মধ্যে মন

মনের মধ্যে মন শুধু মন্ময়
মনের মধ্যে মন কত কথা কয় !
অসীমের মতো মন পরিসীমাহীন–
মনের অবধি পাওয়াতো সহজ নয়।

বিনীত মাটির মতো সে-মন উদার
কখনো সে-মন ব্যথার ভারে সেতার !
মেঘের নয়নে রাখে অশ্রুর ঋণ
স্বপ্ন সে-মন যেনো–আকাশ ছোঁয়ার।

মনের মধ্যে মন পাখির মতোন
আবার শুকনো পাতা-লতার বয়ন
অথবা যেমন শেষ হয় না অশেষ–
গগনের পরে আরো পরের গগন।

মনের মধ্যে মন মনের অধিক–
পথহীন প্রান্তর : অথৈ পথিক।



www.nagorikpathagar.org

# নতুন অভিজ্ঞানে

[পাঠাও বেহেশত হতে হযরত পুনঃ সাম্যের বাণী–
কাজী নজরুল ইসলাম]

প্রয়োজন ছিল তোমার উপস্থিতি
আমাদের যত সমগ্র আয়োজনে
তাহলে বদলে যেতো যে পরিস্থিতি
সকলেই মন খুঁজে
পেতো প্রতিমনে।

তোমাকে এখানে সমবেত দরকার
বিরহের মতো প্রতি নিঃশ্বাসে টানে
রুগ্ন জনতা, অসুস্থ চরাচর–
অনুভব করে
নতুন অভিজ্ঞানে।



www.nagorikpathagar.org

# খ্যাতি

খ্যাতির জন্য কেউ রহস্যময়;
দু-ঠোঁটে ঝুলিয়ে বিনয়ের সঞ্চয়–
খুব কাছে গিয়ে গতানুগতিক খেল;
সুযোগের পায়ে মাখে মালিশের তেল!

খ্যাতির জন্য কেউ ঘোর উন্মাদ;
মান-সম্মান সবই দিয়েছে বাদ।
ভালো-মন্দের বিচার করে না সে
নিজেকে বিলায় অন্যায়ে অনায়াসে।

খ্যাতির জন্য কেউ আদর্শহীন–
সব-পাতে-খায়, তাল দেয় ধি-না-ধি-ন্!
পশু ও মানুষ তার কাছে একাকার–
যে-ভাবেই হোক চায় নাম এস্তার।

খ্যাতির জন্য সেই শুধু নিশ্চল
যাঁর আছে খাঁটি প্রতিভার সম্বল।



www.nagorikpathagar.org

## পদ

পদ থেকে যতো দূরত্বে যেতে পারো
খোলা মাঠ তত– ততই মুক্ত হাওয়া।
পদের সংগে বিপদ যে অগণিত,
দায়ভার করে নিত্য আসা ও যাওয়া।

পদ থাকলেই পদ হারাবার ভয়
পদমর্যাদা পাবার কেবলই লোভ;
যার নেই পদ সেই শুধু নির্ভয়
তার অন্তরে নেই, নেই কোনো ক্ষোভ।

মহাপদ জানে মহাবিপদের ভেদ
ঝুঁকির ভেতরে ঝুঁকির গাঢ় খবর
নির্ণিত কোন শংকার সংবেদ
নয় সে জানে না সদর আর অন্দর।

তবু যে-পদের লিপ্সা ছিলো না কোনো
সে-পদের দোষ ধরে না কি একজনও?



www.nagorikpathagar.org

# ত্যাগ

শূন্য পকেটে যেও না অনেক দূর
প্রাচীন দেহের ভালো নয় আলামত
গলা নেই তবু কেনো ভাজো শুধু সুর?
পাওহীন পায়ে কতোটা চলবে পথ!

চোখের দৃষ্টি ফিকে হয়ে গেছে কবে
স্বপ্ন দেখার তবু কতো কসরত?
বার্ধক্যের সাতঘোলা উৎসবে
উড়বার আশা কেনো করো হযরত!

সাবসিডিয়ারি আর কতো দেবে রঙ?
অনেক নিয়েছো মৌলভী দেরহাম!
রিক্ত কলস বাজে কতো ঢং ঢং!
তার চেয়ে বাঁধো তৃপ্তির এহরাম।

অল্পে তুষ্টি- সেই ভালো, সেই ভালো
ঘর-হীন-ঘরে ত্যাগের সুষমা ঢালো।



www.nagorikpathagar.org

# আফসার নিজাম এবং আহমদ বাসিরের ভূগোল

[কবি রেদওয়ানুল হককে]

তীক্ষ্ণ শরীর, ধারালো দুচোখ, তীর্যক ভাষাভাষী:
তীব্র কথার অন্তরালের অকপট বিশ্বাসী–
পরিমল প্রশ্বাসী।

একদা তুমুল দুহাতে মাখবে মেধার দাপট, লাল–
সবুজের মতো স্বতঃপত্‌পত্‌ কবিতার সমকাল–
প্রজ্ঞার মহাকাল।

দৃষ্টি রাখুক প্রত্যয়তম সমবেত সুন্দর;
অবাক স্বদেশ অথবা দেখুক সব্যসাচীর ঝড়–
দীপ্র দিগন্তর।



www.nagorikpathagar.org

# দূর

দূর!
পাখিরা কি চাকরি করে?
কিংবা পুঞ্জপুঞ্জ মেঘমালা?

দূর!
নদীরা কি হিসাবরক্ষক নেই বলে
খুলে বসে হিসেবের খাতা?
কিংবা ধাবমান স্রোতস্বিনী?

দূর!
দখনে হাওয়া কি শেষ পর্যন্ত
কোনো অফিসের সদস্য সচিব থাকে!
থাকে নাকি?
কিংবা মুক্তপক্ষ কবিকুল?



www.nagorikpathagar.org

## পাতার বৃত্তান্ত

[কবি সোলায়মান আহসান প্রিয় পরম]

প্রতিটি পাতাই মোনাজাত মনে হয়
প্রতিটি পাতাই প্রার্থনারত যেন
প্রতিটি পাতাই দুই হাত পেতে আছে
প্রতিটি পাতাই বিনম্র অঞ্জলি

প্রতিটি পাতাই আকীর্ণ ক্যানভাস
প্রতিটি পাতাই কোনো রং কোনো রেখা
প্রতিটি পাতাই চিত্রলেখা ও ছবি
প্রতিটি পাতাই শিল্প ও কারুকাজ

প্রতিটি পাতাই ছন্দ-মাত্রা-তাল
প্রতিটি পাতাই কবিতার আঙ্গিক
প্রতিটি পাতাই কাব্যের পটভূমি
প্রতিটি পাতাই গানের কথা ও সুর

প্রতিটি পাতাই লালিত সিঁথির নদী
প্রতিটি পাতাই প্রজাপতি পালতোলা
প্রতিটি পাতাই সৌকর্যের ডানা
প্রতিটি পাতাই উড়ন্ত কোনো পাখি

প্রতিটি পাতাই প্রোজ্জ্বল খোলা বই
প্রতিটি পাতাই প্রেক্ষণ প্রত্যয়
প্রতিটি পাতাই ক্রমাগত নিকোষিত
প্রতিটি পাতাই পটুয়ার শেষ টান।



www.nagorikpathagar.org

# পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভেতরে

বুশের সবগুলো হিংস্র দাঁত বেরিয়ে যাবার পর
গণতন্ত্রের নামতা পড়তে গেলেই
আমরিকার অঙ্ক বেরিয়ে আসে
'কী চমৎকার দেখা গেলো'র মতো পেন্টাগনের
ভূগোলখেকো জঠর থেকে বেরিয়ে আসে ইরাকের কঙ্কাল
ফিলিস্তিনের খুলি এবং হাড়গোড়

কে বলে ঘৃণার কোনো সীমা আছে
ঘৃণার বলো ক্ষোভের বলো
প্রত্যাখ্যানের সাহসের কথাই বলো
কোনো কিছুরই কোনো সীমা নেই
বস্তুত হোয়াইট হাউজের বিরুদ্ধে
সমস্ত মানুষের ঘৃণা এখন বাঁধভাঙ্গা তরঙ্গের মতো ফুঁসছে

সর্বগ্রাসী লেলিহানের মতো গলগন্ড গজব ঢুকে পড়ছে
পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভেতরে

গণতন্ত্রের ময়াল ছাড়া বুশের আর কী নাম হতে পারে
গণতন্ত্রের আর এক হায়নার নাম রাম্‌স্‌ফেল্ড
আর এক শ্বেত ভল্লুকের নাম টনি ব্লেয়ার
অথবা পুঁজিবাদের সমস্ত ধ্বজাধারীর
কারোরই নাম মানুষ নয়
এবং শ্যারনরা একেকজন রাক্ষস ছাড়া আর কী হতে পারে?



www.nagorikpathagar.org

# অভিনয় পুরুষ

[ওবায়দুল হক সরকার পরম শ্রদ্ধেয়]

তাঁর শেষ লেখাগুলো পথনির্দেশ
শেষ দিনগুলো তাঁর নদীর মতন .
ক্রমাগত বয়ে গেছে সাগরে কেবল
অথবা আলোর পথে একা ও একক

অভিনয় পেয়ে গেলো পরম পুরুষ
বস্তুত কৃষ্টিরা পেয়ে গেলো দিক
পেয়ে গেলো দেশপ্রেম– স্বচ্ছ স্বদেশ
বৈরি বাতাসে দৃঢ় কালের লাগাম

আল্লাহর সৈনিক লড়াকু কলম
অথবা শিল্পী এক গতির প্রতীক
অথবা যুদ্ধরত ক্ষত-বিক্ষত–
আঁধারের উৎখাতে– অসম সাহস

তাঁর শেষ লেখাগুলো পথনির্দেশ
শেষ দিনগুলো তাঁর নদীর মতন।



www.nagorikpathagar.org

# কবিতা

[কবি হাসান আলীম পরম প্রিয়]

কবিতা তোমার জন্যে আমি তো কবি হতে চাই আজো
বুঝে নিতে চাই সব শিল্পের সকল নিপুণ কাজও
তুমি নির্জন, নীরবতা যেনো রহস্য সুদূরিকা
প্রশ্নের মতো দৃষ্টির মেঘ, ক্যানভাস, তুলি, রেখা
তোমার জন্যে চিকিৎসাহীন অবিকল উৎযোগ
অথবা মেধার অকৃত্রিম স্বপ্ন ও যোগাযোগ

কবিতা তোমার ভেতর বাহির মৃত্তিকা, নীল সব
তাবৎ হরিৎ নদীদের মত প্রকৃতির উৎসব
চালতের পাতা, তেঁতুল পত্র, পেয়ারার পত্রিকা
কবিতা তোমার ঠোঁটে মেখে দেয় ছন্দের চন্দ্রিকা

কবিতা তোমার জন্যে আমি তো চৌচির করি রঙ
দুই ভাগ করি রসের শরীর, রূপের রেখা বরং
তোমার জন্যে মঞ্চ ধূসর, কুয়াশার দিন-ক্ষণ
ক্রমাগত বাজে দূরের বাদ্য, ঝাপসা পর্যটন

কবিতা তোমার জন্যে স্বদেশ, প্রেমের মতোন গান
মানচিত্রের গাঢ় সংগ্রাম পায়রানিহিত প্রাণ।



www.nagorikpathagar.org

# মাত্রাবৃত্ত

কোনো কোনো বৃক্ষের
ফুলের কোনো সুখ্যাতি নেই
কেবল ফলের জন্যে অমোঘ হয়ে আছে

অথবা অন্য এক বৃক্ষের
কেবল ফুলই আছে
ফলের কোনো সৌহার্দ্য নেই
ফুলের জন্যই সুশীল হয়ে আছে মাত্র

তাছাড়া অনেক অনেক বৃক্ষের
ফুলেরও অঢেল নেই
ফলেরও অঢেল নেই
কেবল পত্র-পল্লবের পরমাশ্চর্য নিয়ে বর্তে রইলো

আহা! বৃক্ষের সংগে মানুষের
মাত্রাবৃত্তের কোনো অবশেষ নেই।



www.nagorikpathagar.org

## নতুন চাঁদ

হিংসা এবং প্রতিহিংসার দাউ দাউ অগ্নির
লেলিহান শিখা জ্বলে অবিরাম বিদ্বেষ বহ্নির
হাহাকার নামে দোযখের মতো ঘরে ঘরে রাত-দিন
সারাসরি নামে ক্রমাগত অভিশাপ যেনো সীমাহীন

লাশের পাহাড়– ঢেকে যায় পথ জনপদ ভরে যায়
কী যে বীভৎস দৃশ্য এখন শহরে নগরে গাঁয়
হু-হু করে বাড়ে পণ্যের দাম জীবনের দাম কমে
সন্ধি করেছে প্রকাশ্যে ঐ মিথ্যাবাদী ও যমে

দুঃশাসনের মত্ততা দেখে জন্তুরা লজ্জায়
শুধু পশু কেন সেই বিতাড়িত শয়তান তড়পায়
মানবিকতার সকল দুয়ারে তালা দেয় ফেরাউন
অথবা দখল করেছে স্বদেশ পুরনো সেই শকুন

তবুও আকাশে ঈদের নতুন চাঁদ আলো নিয়ে আসে
সব আঁধারের বিরুদ্ধে শুধু বিজয়ের আশ্বাসে।



www.nagorikpathagar.org

# সেই চাঁদ

সেই চাঁদ দোলে আকাশের কোলে দীপ্ত
ধনুকের মতো টান-টান খাপখোলা
এবং দীর্ঘ সাধনার পরে দৃপ্ত
অথচ অশেষ আনন্দ-চঞ্চলা
নয়তো সে চাঁদ প্রেমের আবেগে সিক্ত
সকল হৃদয়ে দিয়েছে দোদুল দোলা
ন্যায় বিচারের হাতে হাত ধরে সাম্য

সেই চাঁদ গূঢ় ছন্দের অনুষঙ্গ
যেখানে অনেক পতনের ব্যাকরণ
যেখানে অনেক ক্রূরতার অভিসঙ্গ
কলেবর দেয় অজস্র অকারণ
সেখানেও চাঁদ স্নিগ্ধ আলোর অঙ্গ
বিতাড়িত করে উদ্ধত প্রহসন

সেই চাঁদ পেয়ে পেয়ে যায় সব পাওয়া
[প্রশ্ন করে না জীবনের কোনো দৈন্য]
আরো নদী হয় পরানের খোলা হাওয়া
গান গেয়ে ওঠে সবাই সবার জন্য।



www.nagorikpathagar.org

# চাঁদের ভেতর

সকল হৃদয়ে একটা নতুন চাঁদ
অলৌকিক এক কৃচ্ছ্রতাতেই কেনা
নতুন চাঁদের আকাশ সকল দিকে
গহীন ভেতর চায় না তা আজ কে না

উদযাপনের লগ্নে তখন কেউ
মানবিকতার অথৈ অতল গানের
সুর করে যায় মৈত্রীর সম্ভারে
নয়তো বিপুল উপচে পড়া সে প্রাণের

ঢেউ খেলে ঠিক সর্বহারার দেশে
এবং অধিকারের সকল লড়াই
মোচড় দিলেন তীব্র স্রোতের মতো
উড়িয়ে দিয়ে চড়াই ও উৎরাই ...

হৃদয়ে উঠেছে চাঁদের অধিক চাঁদ
চাঁদের ভেতরে সাম্যের সংবাদ।



www.nagorikpathagar.org

## ফররুখ আহমদ

তাঁরে তো পেয়েছি নায়কের মতো বিকশিত স্বপ্নতে
মহাপুরুষ আর মহাকাব্যের মিলিত বিপুল স্রোতে
ভেতরেই তার খুদী পেয়েছিল শাহীনের প্রিয় গান
আকাশের পরে আকাশে ওড়ার প্রাবল্য অম্লান।

যে-হাত কাব্য বিশ্বাসী এক আলোকিত পরিণামে
এবং কবিতা যেন বিদ্রোহী নিত্যনিগূঢ় দামে
গভীর নিশীথ-সাধনা-সঙ্গী ডাহুকের মগ্নতা
অথবা সে এক ফুল্ল মনন : জাগরিত মানসতা।

নৈতিকতার দীপ্ত উপমা উজ্জ্বল ধ্রুবতারা
যাঁর গতি হতে গতি খুঁজে পেল অগণিত গতিহারা
বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে রওশন সত্তার
বেরিয়ে পড়ার মতো তিনি এক দূরগামী রাহবার।

অমর শিল্পী–বিশ শতকের–কবিতার সম্পদ–
অনাগত–কবি–বিস্ময় কবি ফররুখ আহমদ।



www.nagorikpathagar.org

## বিজয় সরণি দিয়ে

বিজয় সরণি দিয়ে চলে যেতে চাই
এই পথে সংসদ জিয়া উদ্যান
এই পথে প্রিয় প্রত্যাশা প্রাঙ্গণ

হতাশার যতো সুর দলে যেতে চাই

বিজয় সরণি দিয়ে চলে যেতে চাই
এই পথে দুই পাশে সবুজ চাদর
উড়িয়ে দিয়েছে কেউ জড়িয়ে আদর

যা কিছু বলার তা-ই বলে যেতে চাই

বিজয় সরণি দিয়ে চলে যেতে চাই
যে দিকে রয়েছে কাবা– মোকার্‌রামাহ্
অথবা প্রেমের নদী– মোনাওয়ারাহ্

জ্বলতে জ্বলতে আরো জ্বলে যেতে চাই

বিজয় সরণি দিয়ে চলে যেতে চাই
কিছু ফুল কিছু পাখি হাতছানি দিক
পড়ে থাক হিসেবের কেজি-দশমিক

স্বপ্নীল নীলিমার কোলে যেতে চাই।



www.nagorikpathagar.org

# রাসূল (সা.)

কারো কাছে চাননি কিছুই তিনি শুধু দিয়েই গেছেন
পাওয়ার জন্য হননি পাগল
ভাবেননিতো চাওয়াই আসল
বরং তিনি দুখীর দ্বারে নিজের সবই নিয়েই গেছেন।

পরের কথা ভেবে ভেবে কেটে গেছে জীবন যে তাঁর
বরণ করে নিয়েছিলেন
ক্ষুধার জ্বালা তাই অনাহার
দান করেছেন, নেননিতো দান সমস্ত বিলিয়েই গেছেন।

কারোর কাছে পাতেননি হাত চাননি কারো অনুগ্রহ
পরাজিত করেছিলেন সব লালসা সকল মোহ

নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেছেন ত্যাগ করেছেন নিজের চাওয়া
হৃদয় দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন হলো কিনা সবার পাওয়া
মনের সঙ্গে সমস্ত মন জীবনভর মিলিয়েই গেছেন।



www.nagorikpathagar.org

# আসবে নতুন স্রোতধারা

[কবি আবু তাহের বেলালকে]

এই সংকট থাকবে না
এই উৎকট মহাজট যাবে খুলে
এই দুর্যোগ কেটে কেটে জানি
আসবে নতুন দিন– নতুন জোয়ার নিয়ে কূলে কূলে।

মুখরিত হবে দেশ নতুন নতুন সুরে-গানে
বাজবে নতুন বীণা জনতার মনে– প্রাণে–প্রাণে
বইবে নতুন হাওয়া– নতুন নতুন পাল তুলে তুলে।

এই দুর্ভয় রইবে না
এই দুর্লয় মহাক্ষয় যাবে চলে
এই দুর্ভোগ ঠেলে ঠেলে জানি
হাসবে নতুন ভোর– নতুন ভ্রমর নিয়ে ফুলে ফুলে।

মেঘনা-যমুনা দেবে নতুন নতুন স্রোতধারা
দোয়েল–পাপিয়া–পিউ জাগাবে আবার নব–সাড়া
সুরমা–রূপসা গাবে–নতুন নতুন গান দুলে দুলে।



www.nagorikpathagar.org

# মুখোমুখি

[কবি সাজ্জাদ হোসাইন খানকে]

আমার সামনে থাকে ফুলের বাগান
ফুলের সামনে থাকে প্রজাপতিরা
আমার সামনে থাকে পাখির উড়াল
পাখির সামনে থাকে নীলিমা অথৈ

আমার সামনে থাকে পাতার নিবিড়
পাতার সামনে থাকে নরম বাতাস
আমার সামনে থাকে গাছের প্রণয়
গাছের সামনে থাকে মেঘের প্রলাপ

আমার সামনে থাকে পথের ভূগোল
পথের সামনে থাকে তৃষ্ণার নীল
আমার সামনে থাকে রঙের গজল
রঙের সামনে থাকে তুলি-ক্যানভাস

আমার সামনে থাকে চোখের ফাগুন
চোখের সামনে থাকে প্রেমের আগুন।



www.nagorikpathagar.org

# ফলক কবিতা

১.
নাটক
নানা ছলনায় নানা ভঙ্গিতে
নকলের গায়ে মূল রঙ দিতে
মিথ্যাকে করে আটক

নাটক
সত্যের মতো আসল সত্য
তুলে ধরার যে-আনুগত্য
তিক্ত এবং যা-টক।

২.
সংসার
দোজখের চেয়ে আরো ভয়ানক বলে
দোজখের চেয়ে দাউ দাউ করে জ্বলে
ধ্বংসের ঢং তার

সংসার
এখানে শান্তি এখানেই সুখ
স্বপ্নের মতো ভরে যায় বুক
বেহেস্ত থেকে এনে দেয় ঝংকার।



www.nagorikpathagar.org

## অস্ত্রের ভাষা

[চট্টগ্রামের এইট মার্ডারের পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার প্রেক্ষিতে]

একটা অস্ত্র শেষাবধি একটাই থাকে
তার শরীরের সর্বত্র একটা অস্ত্রেরই স্বভাব
একটা অস্ত্রেরই তাক করা হুমকির মতো আস্ফালন
কিংবা একটা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাবার মতো একটাই আতঙ্ক তা
একটা অস্ত্র শেষাবধি একটাই থাকে

একটা অস্ত্র স্থানান্তরিত হবার পরও একটা অস্ত্র কেবল
একটা অস্ত্রের মতোই পড়ে থাকে
গর্জে উঠলে একটা অস্ত্র একটার মতোই ছুঁড়ে মারে বুলেট
একটার মতোই বিদ্ধ করে সন্ত্রস্ত কোনো লক্ষ্য
অথবা একটা হস্তারক
ভয়াবহ কোনো হত্যাকাণ্ডের পর ঐ একটাই থাকে
একটা অস্ত্র শেষাবধি একটাই কেবল

অথচ কোনো সর্বোচ্চ দলীয় দাপটের একটা মাত্র অস্ত্রের ভাষাই
মুহূর্তের মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে অগণিত আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিলো
বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি স্বদেশ-প্রেম
মূলত আইন হাতে তুলে নেয়ার চেয়েও
আগ্নেয়াস্ত্রের ভাষায় থাকে
গৃহযুদ্ধের মতো অসংখ্য গণহত্যার অপরাধ।



www.nagorikpathagar.org

## একটি লোকের জন্যে

একটি লোকের জন্যে কি আজ হরিৎ হবে হলুদ!
সম্ভাবনার সকল বাগান সবহারা বুদ্‌বুদ্‌!
দখ্‌নে হাওয়ার আসবে পতন কুজ্‌ঝটিকার ঘায়ে!
সুনীল আকাশ দীর্ণ হঠাৎ চিল-শকুনের পায়ে!

একটি লোকের জন্যে কি আজ দিগন্তে মেঘ জমে!
বিহঙ্গদের নীড় ভেঙে দেয় হিংস্র সে এক যমে!

সাত সাগরের ঢেউ থামানোর জন্যে বালুর বাঁধ!
নয় কবুতর মারার লক্ষে ফাঁদ বরাবর ফাঁদ!

একটি লোকের জিহ্বা কি আজ ভয়ঙ্কর হিশ্‌ হিশ্‌!
গোখরা সাপের সর্বনাশক বিষের চেয়েও বিষ!
ইঁদুর পোষার রাজনীতি তার ক্ষেত করে তছনছ!
সবচে' প্রাচীন ইবলিশও বাহ! মানছে তাকেই বস্‌!

একটি লোকের জন্যে কি আজ  আসবে না সেই ভোর?
চলবে বুনেই স্বপ্নের জাল জনতার অন্তর?



www.nagorikpathagar.org

## অজেয়

বোমা মেরে মেরে মারুক মুফাস্‌সির,
বেঁচে রবে তবু পবিত্র তাফসির;
যুগ যুগ ধরে তাফসির কথা বলে,
মুফাস্‌সিরেরা হয়তোবা যায় চলে।

আলেমে দ্বীনেরা হয়তোবা চলে যায়,
সন্ত্রাসীদের নিষ্ঠুর হামলায়!
ন্যায়বাদীদের হয় জানি জান দিতে—
গডফাদারের খুনখেকো ইংগিতে।

বাড়ুক না যতো ওঁৎ পেতে থাকা গ্রাস,
বেড়াক না ঘুরে নির্মম সন্ত্রাস,
উঠুক না মেতে হন্তারকের দল,
তবু শাশ্বত আদর্শ অবিচল।

তবু মরবে না অজেয় চির অমর—
মওলানা গাজী শহীদ আবুবকর।



www.nagorikpathagar.org

## শোধ

বন্ধু আমার এখানেই ছিলো, এখন এখানে নেই,
পাওয়া যেতো যারে দুই হাত বাড়ালেই,
যারে পাওয়া যেতো এক ডাকে, দুই ডাকে,
পাওয়া যেতো যারে স্নিগ্ধ হাসির বাঁকে।

সংগী আমার মাহফিলে গিয়েছিলো,
ফিরে আসবার কথাও সে দিয়েছিলো,
তাফসীর শেষে ফিরেছে সে বহুবার,
আবার ফিরেছে– ফিরবে না কভু আর।

হৃদয় আমার বাকহীন হয়ে আছে,
অশ্রুও নেই দুচোখের ধারে কাছে,
বাঁচবার নেশা ছড়ায় না কোনো রঙ,
ঘর-সংসার শূন্য সব বরং!

তবু বাঁচবোই জীবনের সংগীতে,
আমার লোকের রক্তের শোধ নিতে।



www.nagorikpathagar.org

# বীজ

[শহীদ অধ্যাপক গাজী আবুবকর স্মরণে]

নিহত মানুষ তলোয়ার হতে পারে–
আঁধারবিনাশী সাহসের বিদ্যুৎ–
তপ্তলহুও সহসাই কাটে ধারে,
খুন খেয়ে যেই হয়েছে ডোল তাগুত।

আমরণ এক আজীবন হয়ে যায়,
আল-কোরানের দু-ধারী অধ্যাপক,
বাঁক ঘুরে ঠিক শাহাদাৎ খুঁজে পায়;
অথচ বাতিল ঢেলেছিলো হেমলক।

সমূহ অচেনা সব চেয়ে চেনা আজ,
জেহাদে যখন জিন্দেগী খোয়া গেছে,
এবং অশেষ ঈমানের কারুকাজ–
যেখানে অথৈ অশ্রুও থোয়া গেছে!

জেহাদে যখন জিন্দেগী খোয়া গেছে–
বিজয়ের বীজ অগণিত রোয়া গেছে।



www.nagorikpathagar.org

## পথিক

[সাবিনা মল্লিককে]

এমন অনেকেই আছে যে
পথ চলতে চলতে অবশেষে পথিক হয়ে যায়
কোথায় যেতে হবে ঠিক তা আর তার মনে থাকে না
তার তো মনে থাকে না কোত্থেকে সে শুরু করেছিল
যেমন অনেক যান্ত্রিক অবশেষে যান্ত্রিকই থেকে যায়

অনেক গায়ক আবার অনবরত গাইতে গাইতে
একদা বানিয়ে ফেললো নিজেই একটা গানের ভুবন
অষ্টপ্রহর গানই তার সাধ্য গানই তার সাধনা
জাগরণের মধ্যে গানের মতো নিদ্রার ভেতরেও গান
যেমন অনেক পটুয়া অবশেষে পটুয়াই থেকে যায়

একজন চিকিৎসক কি কেবল চিকিৎসকই থেকে যাবে
একজন অধ্যাপক কি কেবল অধ্যাপকই থেকে যাবে
বস্তুত একজন কবি কি কেবল কবিই থেকে যাবে ?

দেখো প্রিয়তমা
আমি তোমাকে গতকালও বলেছি–
ঘুরতে ঘুরতে একদা ভবঘুরে হয়ে যাওয়া লোকের চেয়ে
ইবনে বতুতার মতো একজন বিশ্বাসী পরিব্রাজক
আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।



www.nagorikpathagar.org

# শহীদ বেলাল

শহীদ বেলাল ভাই ছিলো মোর বন্ধু প্রিয়তম,
একই পথের পথিক ছিলাম এক বিহঙ্গ সম।

আজ সে কোথায় হারিয়ে গেছে কোন আকাশের পারে,
হেথায়-হোথায় যতোই খুঁজি আর পাবো না তারে;
আর পাবো কি সংগী হায় রে তার মতো উত্তম।

এক আদর্শের ছিলাম সৈনিক শিল্পী একই মতের,
হারিয়ে তারে তৈরি হলো অথৈ রক্ত ক্ষতের !

তার বিরহের বোঝা বইতে আর পরি না যে হায়,
এই বুঝি মোর ব্যথার ভারে বক্ষ ফেটে যায়।
কুল আলমের কোথাও কি এর নাইরে উপশম !



www.nagorikpathagar.org

## হৃদয়

এবং যেখানে হৃদয় থাকার কথা ছিলো
সেখানে হয়তো হৃদয় নাও থাকতে পারে
এবং যেখানে থাকার কথা ছিলো
ভালোবাসার
সেখানে ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত
পাওয়া যায় না অনেক সময়।

অনেক মেঘে বৃষ্টি নেই
অনেক বাতাসে নেই প্রাণ
অনেক পাখির গান নেই
অনেক বৃক্ষের নেই পুষ্প
এবং অনেক পুষ্পের নেই ঘ্রাণ।

অনেক মৃত্তিকার নদীও নেই
এবং অনেক নদীর নেই গতিবেগও ।

এবং যেখানে হৃদয় থাকার কথা ছিলো
সেখানে হয়তো হৃদয় নাও থাকতে পারে
এবং যেখানে থাকার কথা ছিলো
ভালোবাসার
সেখানে ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত
পাওয়া যায় না অনেক সময়।



www.nagorikpathagar.org

## বসন্ত বাও

বসন্ত-বাও এলো এলো বনে বনে–
জীবনের জয় এলো এলো জনে জনে।
স্বপ্নের বেলা বয় খুব চুপ চুপ,
অন্তর সাড়া দেয় ঠিক অদ্রূপ।

বাসন্তী রঙ এলো এলো গনগনে,
ভুবনে ভাবনা এলো এলো চনমনে।
ভ্রমণের বাসনায় দোলে দোলে বুক,
নীল নীল নীলিমা ও মাটি উন্মুখ।

ফুলেল লগন এলো এলো ক্ষণে ক্ষণে,
গানের গগন এলো এলো মনে মনে।
ভ্রমরের দিন এলো সুর গুনগুন–
কবির হৃদয় হলো আনন্দে খুন।



www.nagorikpathagar.org

# না গেলেও তো পারি

কোথাও যাবার জন্য এক সময় আমার
অসম্ভব তাড়া থাকতো
যেমন নববর্ষের মোচড় খাওয়া মেঘতরঙ্গের তাড়া থাকে
যেমন পূর্ণিমার তরলিত জোয়ারের তাড়া থাকে
যেমন বাঁধভাঙ্গা বিহঙ্গদের অগ্রগতির তাড়া থাকে
অথচ এখন এই পঞ্চাশ বছর বয়সের
অবক্ষয়ের মধ্যে কেবলই গুঞ্জরিত হতে দেখি–
পারি, না গেলেও তো পারি।

এবং তখন
চোখে পড়তো না নীলাম্বর
চোখে পড়তো না নদ-নদীর অনিবার্য দুই ধার
চোখে পড়তো না বৃক্ষরাজির স্থির অধ্যয়ন
অথবা মনে পড়তো না মৃত্তিকার
মগ্নতার মতো অধিবাস

অন্তরের পূর্বাহ্নে অন্তঃকরণই এক সময় বেরিয়ে পড়তো
যেমন পদদ্বয়ের আগেভাগে পদক্ষেপ বেরিয়ে পড়তো
যেমন দৃষ্টিপাতের আগেভাগে বেরিয়ে পড়তো তৃষ্ণার চোখ
এবং স্পর্শের আগেভাগে বেরিয়ে পড়তো ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা

অথচ নির্লোভের মতো সমস্ত সংযম
এখন বলে ওঠে না গেলেও তো পারি
দানবীরের মতো সমস্ত ঔদার্য
এখন বলে ওঠে না গেলেও তো পারি
গ্রন্থরাজির মতো সমস্ত অভিজ্ঞান
এখন বলে ওঠে না গেলেও তো পারি
জ্ঞান চর্চার মতো সমস্ত চৈতন্য
এখন বলে ওঠে না গেলেও তো পারি
কৃচ্ছ্রতার মতো সমস্ত সাধনা এখন বলে ওঠে
না গেলেও তো পারি
না গেলেও তো পারি
না গেলেও তো পারি।



www.nagorikpathagar.org

# শীতের লিমেরিক

এক.
সাদা মেঘগুলো কোমল কুয়াশা হয়ে
নামলো যখন ধোঁয়াটে চাদর লয়ে
তখন আসলো শীত
হি-হি করা সংগীত
সূঁচ ফুটানোর কনকনে হাওয়া বয়ে।

দুই.
হলুদ পাতারা ঝরে যায় ঝরে যায়
রুগ্ন শাখারা মরে যায় মরে যায়
কোনো কোনো নীড় একা
মগডালে দেয় দেখা
বেদনায় মন ভরে যায় ভরে যায়।

তিন.
শীত এলো- সাথে আগুন পোহানো এলো
শীতল সকাল শিশিরে ধোয়ানো এলো
এলো যে সাথে তখন
গীতল গীতল মন
সাথে এলো পিঠা রসেও চোয়ানো এলো।

চার.
কিন্তু এলো কী গরিবের কাছে হায়!
এমন কিছুই- শৈত্য ঠেকানো যায়?
জীবন বাঁচানো যায়
পরান মাতানো যায়
পেলো কী সহায়? শীতার্ত অসহায়।



www.nagorikpathagar.org

# মানবতাবাদী

[শাহ আবদুল হান্নান পরম শ্রদ্ধেয়]

তাঁকে শুধু মনে হয় পথের মতোন
অথবা পথের মূল, পথের আসল
ক্রমাগত নদী বয়ে যায় এক পাশে
কোমল বীথিকা ডাকে আর পাশে তাঁর

তাঁকে শুধু মনে হয় বইয়ের মতো
দুটি চোখ বস্তুত অজস্র চোখ
একটি হৃদয় যেনো অনেক হৃদয়
জ্ঞানের নীলিমা তাঁরে করেছে মহান

তাঁকে শুধু মনে হয় মানবতাবাদী
অমোঘ বুদ্ধিজীবী আলোর ডাহুক
অথবা দ্বীনের দা'য়ী প্রথম ও শেষ
অধুনা ফেকার মতো অধুনা মনন

তাঁকে শুধু মনে হয় অর্থনীতির
কাবার কণ্ঠ এক— কালের নায়ক।



www.nagorikpathagar.org

# শপথের শ্বেত পতাকা

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

'শপথের শ্বেত পতাকা' কবি মতিউর রহমান মল্লিকের একটি অগ্রন্থিত গানের পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ গানে দ্বীন বিজয়ের জন্য তাঁর প্রিয় সাথীদেরকে জিন্দাদিল বীর মুজাহিদ হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। প্রত্যাশা করেছেন দ্বীনের বিজয়। পরিবেশ যাই থাকুক দ্বীনের কাজের গতিধারায় ছন্দ চেয়েছেন। মতিউর রহমান মল্লিক তাঁর সকল কাজে খুলুসিয়াতের, শুদ্ধির প্রত্যাশা করেছেন মহান মনিবের কাছে। সকল অপারগতা ও অক্ষমতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন মহান আল্লাহর সমীপে। আল কুরআনকে ভালোবেসে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাদের কাতারে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

এই পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ গানই আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে লেখা, সুর করা ও গাওয়া। শেষের দিকের কয়েকটি গান একুশ শতকের প্রথম দশকের শুরুর দিকে রচিত। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন আফসার নিজাম।

www.nagorikpathagar.org

## সূচিপত্র

আল্লাহ নামের ডাক শুনেছি/ ৬৫
সত্য ঢাকা যাবে না/ ৬৬
তৌহিদী চট্টলা/ ৬৭
শাহজালালের সেই/ ৬৮
আমাদের রুখতে চাবে/ ৬৯
বিপ্লবী রেনেসাঁর কাফেলার জয়/ ৭০
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু/ ৭১
সত্যের নামে সংগ্রামী ছিলো/ ৭২
শপথের শ্বেত পতাকা/ ৭৩
এই জাগরণ ইসলামী জাগরণ/ ৭৪
পরিবেশ যাই থাক ভালো কিবা মন্দ/ ৭৫
রমজানেরই পবিত্রতা করি সংরক্ষণ/ ৭৬
রবিউল আউয়াল এলে তোমারি গান গাই/ ৭৭
আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দাও/ ৭৮
ইসলামী বিপ্লবের বড় প্রয়োজন/ ৭৯
শুধু সময় হয় না তার দ্বীনের কাজে/ ৮০
মিছিল আর কবিতার বন্ধন চাই/ ৮১
আল কুরআনকে ভালোবেসে/ ৮২
রক্তই মূলত শক্তি/ ৮৩
এই কাফেলা রুখতে পারে সাধ্য কার/ ৮৪
আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন/ ৮৫
দিন এলো আবার/ ৮৬
আমরা একটা নতুন সমাজ/ ৮৭
তাফহীমুল কোরান/ ৮৮

www.nagorikpathagar.org

শিল্পকোণের শিল্পী আমার/ ৮৯
শহীদ মুজাহিদ/ ৯০
আসছে শতাব্দী তো আমাদের/ ৯১
দেশের মাটি রক্ষা করার/ ৯২
জীবন ফুরিয়ে যদি একদিন মরণ আসে/ ৯৩
আমাদের উৎসব আমাদের আয়োজন/ ৯৪
যে গানে শেখার কিছু নেই/ ৯৫
যে সকল যুবক দ্বীনের কাজে লেগে থাকে সারাদিন/ ৯৬
সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে/ ৯৭
মজলুম শোনো ওই কাঁদে/ ৯৮
ভয় নেই ভয় নেই নেই ভয়/ ৯৯
কখন কে যে হারিয়ে যাবে/ ১০০

www.nagorikpathagar.org

## আল্লাহ নামের ডাক শুনেছি

আল্লাহ নামের ডাক শুনেছি
আমরা এলাম ছুটে
দিগবিদিকে ঝিকিমিকিয়ে
ফুলের মতো ফুটে।।

ঘুম ভেঙ্গে তাই জেগেছে এ মন
পেরিয়ে এলাম বন-উপবন
সামনে এখন আলোর মিছিল
সকল আঁধার টুটে।।

আকাশ বাতাস উতল হয়ে
আযান এলো ভেসে
বুকের ভেতর খুশির পাখি
তাই দাঁড়ালো এসে।

সামনে কাবার মিনার ওই
ঘুমিয়ে এখন কী করে রই
পরম প্রিয়ের হাতছানিতে
সিজদাতে যাই লুটে।।



www.nagorikpathagar.org

## সত্য ঢাকা যাবে না

সত্য ঢাকা যাবে না
যতই চলুক বাহানা
খোদাদ্রোহী শক্তিগুলো
পড়ছে বেকায়দায়
জিহাদ তোদের ডাকছে মাঠে
আয় রে ছুটে আয়।।

চোখ ধাঁধানো বাতিগুলো
পড়ছে আজি খসে
বাতিল রাজের প্রাসাদগুলো
পড়ছে আজি ধসে
নয়তো কোন আজব কিছু
ঘটছে যা হেথায়।।

তৌহিদেরই বিপ্লবী সুর
আজকে কানে বাজে
খোদাভীতির আভাস মিলে
আজকে সবার কাজে
এমন মধুর নিয়মনীতি
মিলবে আর কোথায়।।



www.nagorikpathagar.org

## তৌহিদী চট্টলা

তৌহিদী চট্টলা
সংগ্রামী চট্টলা
বিপ্লবী চট্টলা
বিদ্রোহী চট্টলা
কারো কাছে কোন দিন
মাথা নত করে না।।

পাহাড়ের পরিবেশে মানুষের মন
শিখরের মতো উঁচু তোলে আলোড়ন
ঝঞ্ঝার সংঘাতে দুর্বার হয়ে ওঠে
জীবনের ঝুঁকি নেয় ভেঙে পড়ে না।।

এইখানে আলাওল তুলেছিল সুর
আমানত দেখেছিল স্বপ্ন মধুর
মনিরুজ্জামানের সংগ্রামী চেতনা
স্বর্ণালী ইতিহাস কে গো স্মরে না।।



www.nagorikpathagar.org

# শাহজালালের সেই

শাহজালালের সেই
তলোয়ার দেখে আমি বুঝতে পেরেছি
জেহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা
খানজাহানের সাথী
শহীদের ঈদগাহে দেখতে পেয়েছি
রক্তের আখরে তা রয়েছে লেখা।।

যে ঈমান খাঁটি কোন খাদ নেই
সে ঈমান কথা ওগো বলবেই
হাজী নিসার আলী
তিতুমীরের পথ ধরে জানতে পেরেছি
মুমিনের কাজ হলো লড়তে থাকা।।

আছে যার ঈমানের সম্ভার
আঁধারের নেই কোন ভয় তার
সূর্যের ওঠা দেখে
সন্দেহাতীতভাবে জানতে পেরেছি
সত্যের গতিবেগ যায় না রোখা।।

যে মরণ জীবনের জন্যে
সে মরণ তোলপাড় করবেই
বালাকোটের সেই ইতিহাস
পড়ে আমি জানতে পেরেছি
শহীদের রক্ত যে যায় না বৃথা।।



www.nagorikpathagar.org

# আমাদের রুখতে চাবে

আমাদের রুখতে চাবে
ঝঞ্ঝা বাধার পাহাড় এসে
বাধার ঐ পাহাড় দলে
চলতে হবে দুঃসাহসে
জীবনের স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে সাজাতে হবে
হোক না বন্ধুর পথ তবুও তো চলতে হবে।।

আমাদের গতি পথে আসবে বিরূপ স্রোতের ধারা
মাড়িয়ে সেই যে স্রোত জাগাতে হবে ঘুমের পাড়া
তবে তো আসবে প্রভাত কুয়াশারই আঁচল ছিঁড়ে।।

জিহাদের শপথ গড়ে দ্বীনের পথে লড়তে হবে
তাগুতি প্রাসাদ ভেঙে খোদারই রাজ গড়তে হবে
সুখেরই গড়বো সমাজ মানবতার মুক্তি তবে।।



www.nagorikpathagar.org

# বিপ্লবী রেনেসাঁর কাফেলার জয়

বিপ্লবী রেনেসাঁর কাফেলার জয়
সত্যের সংগ্রামী জনতার জয়।।

মানবো না মানবো না অন্যায় নিপীড়ন
মানবো না মানবো না মিথ্যা ও প্রহসন
শোষকের উদ্ধত গর্ব
আমরাই করে যাব খর্ব
জয় বিপ্লবী চেতনার জয় জয়।।

রাখব না রাখব না কুফুরীর চিহ্ন
রাখবো না রাখবো না কলুষতা দৈন্য
শান্তি ও সাম্যের ঐক্যে
আমরা এগিয়ে যাই লক্ষ্যে
জয় তৌহিদী একতার জয় জয়।।



www.nagorikpathagar.org

## আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু
আরশ পাকে ফেরেশতারা পড়ছে সবাই আল্লাহু।।

দিন রজনী গাইছে তারা লা ইলাহা ইল্লাহু
অলিরা সব গুনগুনিয়ে গান যে গাহে আল্লাহু
ফুল বাগিচায় বুলবুলি গায় লা ইলাহা ইল্লাহু
তুই কি রে মন থাকবি বেহুঁশ জপ রে দিলে আল্লাহু।।

রবী শশী গ্রহ তারা পড়ছে সবাই আল্লাহু
সাগর নদী পাহাড় জপে লা ইলাহা ইল্লাহু
আকাশে ওই পাখিরা গায় আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু
বাতাসে ওই সুর শোনা যায় লা ইলাহা ইল্লাহু
কোকিল ডাকে কুহু কুহু আল্লাহু ইয়া আল্লাহু।।

নেই কোন ভয় আল্লাহ সহায় প্রাণ ভরে গা আল্লাহু
দে কালেমার বিপ্লবী ডাক লা ইলাহা ইল্লাহু
বাতিলেরই উৎখাতে যে অস্ত্র সেরা আল্লাহু
তাগুতের উচ্ছেদের শমসের লা ইলাহা ইল্লাহু
গড়তে আল কুরআনের সমাজ
করতে কায়েম খোদারই রাজ
অস্ত্র সেরা আল্লাহু।।



www.nagorikpathagar.org

# সত্যের নামে সংগ্রামী ছিলো

সত্যের নামে সংগ্রামী ছিলো
অন্যায় রোধে বিপ্লবী ছিলো
কোথা সে মুসলমান হায় কই সে মুসলমান
জিহাদের মাঠে দুর্জয় ছিলো
আল্লাহর রাহে নির্ভয় ছিলো
কোথা সে মুসলমান হায় কই সে মুসলমান।।

মৃত বিয়াবানে প্রাণের ফোয়ারা এনে
যারা রচেছিল ছায়া সুনিবিড় নীড়
মরু দুর্দিনে বজ্রের ঝড় ঠেলে
যারা খুঁজেছিল নোনা দরিয়ার তীর
আঁধারের বুকে হেনেছিল বান
যারা গেয়েছিল সাম্যের গান
কোথা সে মুসলমান হায় কই সে মুসলমান।।

আধেক জাহানে সোনালি সুদিন এঁকে
যারা লিখেছিল শান্তির স্বরলিপি
উপমাবিহীন আযাদীর কথা কয়ে
যারা ঘুরেছিল সারাটি জাহান ব্যাপী
সাহারার প্রাণে সুধা অফুরান
ঢেলে দিয়ে যারা হলো মহিয়ান
কোথা সে মুসলমান হায় কই সে মুসলমান।।



www.nagorikpathagar.org

## শপথের শ্বেত পতাকা

এই সংগ্রাম এই শ্লোগান
আজ মুক্তির জন্যে সংগ্রাম
জনতার দাবি নিয়ে সত্যের পথ ধরে
মুক্তির জন্যে সংগ্রাম।।

ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ছি
জনে জনে সংগ্রামে লড়ছি
হাতে হাতে শপথের শ্বেত পতাকা
হও হও সামনে আগুয়ান।।

মিছিলে মিছিলে আজ
শ্লোগান তুলছে জনতা
আবাল বৃদ্ধ যুবা বাড়ছে অবিরত
মুখে মুখে মুক্তির বারতা।

জালিমের উৎখাতে সংগ্রাম
শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
শোষিতের ঘরে ঘরে আনতে হাসি
লক্ষ প্রাণের এ সংগ্রাম।।



www.nagorikpathagar.org

# এই জাগরণ ইসলামী জাগরণ

এই জাগরণ ইসলামী জাগরণ
মানবে না শুনবে না কোন যে বারণ জুলুম নিপীড়ন
দুর্বার এই আন্দোলন তৌহিদী জাগরণ
মানবতার শত্রু যত করবে সব দমন।।

গাইরুল্লাহর উচ্ছেদে হিজবুল্লাহর আগমন
বাতিলের উৎখাতে প্রচণ্ড আক্রমণ
হুঁশিয়ার সাবধান খোদাদ্রোহী বেঈমান
হুঁশিয়ার সাবধান সত্যের দুশমন।।

আন্দোলন কখনো থেমে যাবে না
উত্তাল তরঙ্গ বাধা মানে না
শহীদি রক্ত বৃথা যাবে না
তাই তো খোদার পথে
এগিয়ে যাব এক সাথে
করবো কায়েম খোদার বিধান
যায় যাক জীবন।।



www.nagorikpathagar.org

# পরিবেশ যাই থাক ভালো কিবা মন্দ

পরিবেশ যাই থাক
ভালো কিবা মন্দ
তোমার কাজের গতির ধারায়
আসুক আরো ছন্দ।।

নদী বয়ে যায় আপন বেগে
নিজের কাজেই সে নিয়ত জেগে
অথচ তারই দ্বার
দুই তীরে ভরে দেয়
নানান ফুলের গন্ধ।।

পথ হারাবার ভয় নেই বলাকার
আকাশের নীল জুড়ে পথরেখা তার।

চলার পথে থামে না সাহসী
শত বাধা পার হয় বাজিয়ে বাঁশি
সামনেই চোখ তার
বাধাহীন চলে সে
ভুলে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।।



www.nagorikpathagar.org

## রমজানেরই পবিত্রতা করি সংরক্ষণ

রমজানেরই পবিত্রতা করি সংরক্ষণ
খোদার হুকুম পালন করা বড়ই প্রয়োজন।।

পাপের রাস্তা মাড়াবেন না
দ্রব্যমূল্য বাড়াবেন না
রোজাদারদের কেন দেবেন
কষ্ট অকারণ।।

নগ্ন অশ্লীল ছায়াছবি
নগ্ন ভিসিআর ও টিভি
বন্ধ করুন রুচি বিহীন
সকল আয়োজন।।

দিনের বেলা খাওয়া-দাওয়া
হোটেল খোলা বেপরোয়া
ঈমানদার তো করে না ভাই
এমন আচরণ।।



www.nagorikpathagar.org

## রবিউল আউয়াল এলে তোমারি গান গাই

রবিউল আউয়াল এলে তোমারি গান গাই
রবিউল আউয়াল গেলে তোমায় ভুলে যাই।।

তোমার নামে দরূদ পড়ি
তোমার প্রেমে গড়াগড়ি
মুখে বলি ভালোবাসি
অন্তরেতে নাই।।

তোমার সে নাম ঘরে টানাই
তোমার নামে ব্যানার বানাই
মনের ভেতর তোমারই নাম
করি না খোদাই।।

তোমার নামে জলসা ই-আম
সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম
কিন্তু তোমার সমাজ গড়ার
উদ্যোগই যে নাই।।

বিবৃতি দেই তোমার নামে
বিজ্ঞপ্তি দেই চড়া দামে
গদীর লোভে তোমারই নাম
ভেঙে চুরে খাই।।

রাসূল প্রেমে কান্নাকাটি
নির্ভেজাল হোক, হোক না খাঁটি
তাঁর দেখানো রাস্তা ধরে
মুক্তি খুঁজে পাই।।



www.nagorikpathagar.org

## আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দাও

আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দাও
তোমার খালিস বান্দা বানাও
মনে প্রাণে কাজে কর্মে
বানাও খাঁটি মুজাহিদ
দূর করে দাও অলস নিঁদ।।

লোভ লালসার উর্ধ্বে উঠে
বিদ্বেষ হিংসার দেয়াল টুটে
আল কুরআনের সৈনিক হবার
দাও কামনা দাও উমিদ।।

তোমার সন্তোষ অর্জন ছাড়া
না যেন রয় অন্য তাড়া
দরকার হলে নাও বানিয়ে
দ্বীনের পথে খাস শহীদ।।



www.nagorikpathagar.org

# ইসলামী বিপ্লবের বড় প্রয়োজন

ইসলামী বিপ্লবের বড় প্রয়োজন
নইলে মুক্তি আসবে না
নইলে শান্তি আসবে না
বাঁচার মতো বাঁচবে না
এই জনগণ।।

সত্যিকারের স্বাধীনতা পায়নি আজও মানুষ
পায়নি আজও সব অধিকার আকাশ নিরংকুশ
তাই তো সত্যি আসছে না
সুখের সূর্য হাসছে না
বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে না ভাই
জন সাধারণ।।

মজলুমানের কান্নারোলে ভরে গেছে ধরা
বাঁচাও বাঁচাও হাহাকারে ধ্বনি ব্যথা ভরা
খবর তো কেউ নিচ্ছে না
কষ্টের ক্ষতও সারছে না
খোদার মদদ চাচ্ছে সবাই
হায় অনুক্ষণ।।

মানবতার মুক্তির দিশা ইসলাম কবে আসবে
মালেক ভাইয়ের রক্তধোয়া প্রভাত কবে হাসবে
কেউ তো কিছু কইছে না
একটু তরও সইছে না
বুকের ভেতর সারাবেলা
কী যে আলোড়ন।।

পথের পাশের জীর্ণ মানুষ আর কতকাল ধুঁকবে
মরার মত বেঁচে থেকে কত অসুখ রুখবে
খবর তো কেউ নিচ্ছে না
কষ্টের ক্ষতও সারছে না
তাই তো এসো সফল করি
দ্বীনি জাগরণ।।


www.nagorikpathagar.org

# শুধু সময় হয় না তার দ্বীনের কাজে

শুধু সময় হয় না তার দ্বীনের কাজে
কত যে ঝামেলা তার
সমস্যা এন্তার
প্রাণপণ ছোটাছুটি সকাল সাঁঝে।।

দিবসের দিক জুড়ে চাকরির দায়
রাত্রির আধা–আধি যায় ব্যবসায়
ইয়া বড় সংসার ঝক্কির নেই পার
ঘুম সে পালিয়ে বাঁচে শরমে লাজে।।

দ্বীন কায়েমের কাজে মনে তার
সাড়া জাগে না
ক্ষতি ও ঝুঁকির পথ একদম
ভালো লাগে না।

কতকাল কেটে গেল কত আয়োজনে
দুনিয়ার ধন-মান পদ আহরণে
তবুও হলো না তার এতটুকু ক্ষণ আর
আল্লাহর তরে শত তাড়ার মাঝে।।



www.nagorikpathagar.org

# মিছিল আর কবিতার বন্ধন চাই

মিছিল আর কবিতার বন্ধন চাই
নইলে যে যৌবন জীবনের আজ
মুক্তি নাই মুক্তি নাই মুক্তি নাই।।

কলমকে আজ করো হাতিয়ার
হাতিয়ার করে নাও কলম সবার
কবি ও কর্মী মিলে দুঃসাহসের
আগুন ঝরাই আগুন ঝরাই।।

কবিতার খাতা হোক পোস্টার
পোস্টারে লেখা থাক কবিতা
সমস্ত আঙ্গিক অস্ত্যমিলে
মিশে যাক সংগ্রাম স্বাধীনতা।

সাহসীরা আজ এসো কবিতা লিখি
কবিরাও এক হয়ে শ্লোগান শিখি
কালো সে কালিতে এসো দুঃসাহসের
রক্ত মিশাই রক্ত মিশাই।।



www.nagorikpathagar.org

# আল কুরআনকে ভালোবেসে

আল কুরআনকে ভালোবেসে
প্রাণ দিয়েছিল যারা
আজকে দেখো সামনে এসে
রক্তমাখা শহীদ বেশে
ফের দাঁড়িয়েছে তারা।।

আজকে তাদের প্রশ্ন শুধু যেন
আল কুরআনের দ্বীন আসে না কেন
কেন আজও হয় না জয়ী মজলুম সবহারা।।

আজকে তাদের সব দায়িত্ব যদি
মাথায় তুলে চলি নিরবধি
তবেই হবে সফল আজি
তাদের স্মরণ করা।।

সবাই এসো তাদের কাছে শিখি
জীবন দেবার জন্যে লাগে যে কী
খোদার পথে কেমন করে
কিভাবে যায় মরা।।

খোদার পথে মরতে শেখে যারা
সকল যুগে সর্বজয়ী তারা
তাদের পেয়ে হয় গো ধন্য
মানুষ এবং ধরা।।



www.nagorikpathagar.org

# রক্তই মূলত শক্তি

রক্তই মূলত শক্তি
রক্তে রক্তে দেশ ছেয়ে গেলে তারপর
এসে যায় জনতার মুক্তি।।

আমাদের মন আজ ইস্পাত–সম খরশান
আমাদের চোখ আজ আগুনের মত লেলিহান
যত থাক বাধা ভয় থাক দুশমন
মৃত্যুর সাথে নেই চুক্তি।।

রক্তই মূলত জীবনের উত্তাল অগ্নিশিখা
অবিনাশী সত্তার উদ্ধত শপথের রক্তলেখা।

আমাদের শহীদেরা সবচেয়ে বড় সম্পদ
গড়ে গেছে সাহসের দ্বিধাহীন সোজা রাজপথ
জান প্রাণ যত কিছু দিয়ে শেষে করে গেছে
শাশ্বত বিজয়ের উক্তি।।



www.nagorikpathagar.org

# এই কাফেলা রুখতে পারে সাধ্য কার

এই কাফেলা রুখতে পারে সাধ্য কার
এই কাফেলা আল্লাহ ছাড়া বাধ্য কার।।

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছে যে বাহিনী
বাঁধ ভাঙা যে তার ঘটনা তার কাহিনী
শাহাদাতের লাল পেয়ালা কাম্য যার।।

আন্দোলনে রাজপথে যার মূল ঠিকানা
শহীদি ওই ঈদগাহে যার ফুল বিছানা
আল্লাহ তায়ালা অন্ত এবং আদ্য যার।।

যে কাফেলার অগ্রপথিক মালেক ভাই
সঙ্গে অযুত শহীদানের মিছিল তাই
কোরবানি ত্যাগ শুধু প্রতিপাদ্য যার।।



www.nagorikpathagar.org

# আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন

আল্লাহর পথে যারা দিয়েছে জীবন
তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না
বলো না মৃত।।

ওরা আছে চেতনায় আমাদের
ওরা আছে প্রেরণায় আমাদের
ওরা আছে সংগ্রাম সাধনায়
দুর্বার দুর্জয় অপরাজিত।।

ওরা আছে অলখে আমাদের
ওরা আছে পলকে আমাদের
ওরা আছে মিছিলে মিছিলে
চিরদিন চির- চেনা পরিচিত।।

ওরা আছে সাহসে আমাদের
ওরা আছে সমুখে আমাদের
ওরা হলো সেনানী জীবনের
সংগ্রামী পতাকা উচ্চকিত।।



www.nagorikpathagar.org

# দিন এলো আবার

দিন এলো আবার
রক্ত ঝরাবার
জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে
বিজয় নিশান উড়াবার।।

বেদনার শত পথ মাড়িয়ে
পীচঢালা কালো পথ রাঙিয়ে
জীবনের দামে দামে
নিঃশেষ করে আজ কুফুরি
কুফুরির শেষ কারাগার।।

খুন ঝরলেই উর্বর হয় জমিন
মনের জমিন
মানুষের ক্ষোভ উত্থিত হয়
লাভা–স্রোতে চিরদিন।

হতাশার ইতিহাস তাড়িয়ে
আগামীর দিকে হাত বাড়িয়ে
আলোকের ধাপে ধাপে শুধু তাই
উঠে যাই দু'পায়ে
দু'পায়ে পিশে আঁধিয়ার।।



www.nagorikpathagar.org

# আমরা একটা নতুন সমাজ

আমরা একটা নতুন সমাজ
নতুন সমাজ চাই
সেই আবেগে সম্মিলিত
হয়েছি সবাই।।

যে সমাজের মুক্তি সনদ
মুক্তি সনদ আল কোরআন
যে সমাজে ধনী গরিব
ধনী গরিব এক সমান
সেই সমাজের পথ দেখিয়ে
গেছেন মালেক ভাই।।

মজলুমানের আসবে সুদিন
আসবে সুদিন সুখ শান্তি
থাকবে না আর কোন দ্বন্দ্ব
কোন দ্বন্দ্ব ভুল ভ্রান্তি
সেই সুদিনের স্বপ্ন দেখে
বিপ্লবী গান গাই।।

হে খোদা হে কবুল করো
কবুল করো এই স্বপ্ন
দাও এগিয়ে আরো কাছে
আরো কাছে সেই লগ্ন
সেই লগ্নের জন্যে অধীর
লক্ষ সাথী ভাই।।



www.nagorikpathagar.org

## তাফহীমুল কোরান

এই জামানার শ্রেষ্ঠ তাফসীর
তাফহীমুল কোরান
রাত পোহানোর আলোর মত
ভালো আরো ভালোর মত
প্রভাব অফুরান।।

জীবন-জগৎ জটিল যখন
যখন ভয়াবহ
নানান মতবাদের ফাঁদে
মানুষ অহরহ
বক্ষে তুলে অমানিশা
হারায় সত্য-পথের দিশা
ঠিক তখনই তাফহীম উড়ায়
দ্বীনেরই নিশান।।

কত কাফের-নাস্তিক-বেদ্বীন
ঈমানদার হলো
এই তাফসীরের বদৌলতে
প্রশান্তি পেলো
পেল তৃপ্তি আশার আশ্বাস
শাশ্বত সেই মুক্তির আকাশ
ভরলো অমোঘ জীবন-সুধায়
মরুবিয়াবান।।

দ্বীন কায়েমের কথা বলে
তার মত আর কে
সব বাতিলের শিকড় উপড়ায়
প্রবল সাহসে
আল কোরানের কর্মী বানায়
মুক্তির ঠিক তথ্য জানায়
মজলুম মুসলমানকে শেখায়
বিপ্লবেরই গান।।


www.nagorikpathagar.org

# শিল্পকোণের শিল্পী আমার

শিল্পকোণের শিল্পী আমার
কোথায় হারিয়ে গেলো
কোথায় হারালো প্রিয় কবি মোর
বুক করে এলোমেলো।।

স্বজন হারানো বেদনায় বারে বারে,
চারিদিকে চোখ খুঁজে ফেরে আজ তারে
পায় না তবুও চোখ বুঝি তাই
অশ্রুতে ছলোছলো।।

বন্ধু আমার, ভ্রাতৃ আমার
কত ব্যথা বুকে বেঁধে
ফিরেছে একাকী
পথে পথে কেঁদে কেঁদে।।

কেন যে সে কথা বলে নাই সাথী মোরে
সেই জিজ্ঞাসা কাঁটা হয়ে অন্তরে
রক্ত ঝরায় অবুঝ কান্না
কি করে থামাই বলো।।

হে প্রভু অসীম দয়ার আধার সকল খবর রাখো
তাই অনুরোধ অপার আদরে তারে তুমি কাছে ডাকো।

মুছে দাও তুমি অথৈ যাতনা তারি
কবর-গাঁ তার বানাও বাগান বাড়ি
ফুলে-ফুলে আর পাখির কুজনে
বেহেস্ত-ঝলোমলো।।



www.nagorikpathagar.org

# শহীদ মুজাহিদ

সত্যের পথে চলাতে যদি
মিথ্যা দু'পায়ে দলাতে যদি
দোষের কিছুই থেকে থাকে হায়
মুজাহিদ সেই দোষ করা ছাড়া
আর কোন দোষ করেনি তো
ঐ দোষ করে মুজাহিদ তাই
শহীদ হয়েছে মরেনি তো।।

মেধাবী তরুণ এঁকেছিলো তবু
আল কোরানের স্বচ্ছ-সুনীল
স্বপ্ন দু'চোখে তার
গহীন গভীর স্বপনের সেই
পথে ডেকেছিলো চির বিজয়ের
লগ্ন যে ওকে আর।

কোন পরাভব মানোনি তো তাই
পেছনে হাঁটতে জানেনি তো তাই
অকাতরে প্রাণ দিয়ে গেলো হায়
পাওয়া না পাওয়ার হিসেব কষে সে
আপসের পথ ধরেনি তো।।



www.nagorikpathagar.org

# আসছে শতাব্দী তো আমাদের

আসছে শতাব্দী তো আমাদের
নিপীড়িত মানুষের লাঞ্ছিত সকলের
চূড়ান্ত বিজয়ের।।

কুফরির পরাজয় নিশ্চিত জেনেছে সবাই
সত্যের পথে তাই সুদৃপ্ত পদভার এঁকে যাই
রুখতে তো পারবে না দুর্বার দুর্গম
দুর্জয় গতি জীবনের।।

আসছে শতাব্দী তো মজলুমানের
আসছে শতাব্দী তো জুলুমের জিন্দানে
জাগরিত মুসলমানের।

সমস্ত মতবাদ ধ্বংসের শেষ সীমানায়
মরণ ঘন্টা তার কান পেতে শোন ওই শোনা যায়
কোরআনের কর্মীরা তাই চল ছুটে যাই
হাতছানি পেয়ে সম্মুখে।।



www.nagorikpathagar.org

# দেশের মাটি রক্ষা করার

দেশের মাটি রক্ষা করার
তুমি ছাড়া হে দয়াময়
আর তো কেহ নাই
দেশ বাঁচানোর শক্তি প্রভু তোমার কাছে চাই।।

রৌমারী আর বড়াই বাড়ি
দান করলে যে সাহস
তোমার দয়ায় পাদুয়াতে
দেখেছি যে জোশ
আমরা তেমনি যেন সব লড়াইয়ে
তোমার রহম পাই।।

বদর উহুদ যুগে যুগে আনলো ঈমানদার
বাংলাদেশে তাই দেখালো বন্ধু বি ডি আর
ওই হানাদারদের শিক্ষা দিতে তোমার মদদ চাই।।

কোটি কোটি মানুষ আমরা চাই না তো গোলামী
স্বাধীনতা মোদের কাছে প্রাণের চেয়েও দামী
তবু দুঃশাসনের কুটিলতায় দাস না হয়ে যাই।।



www.nagorikpathagar.org

# জীবন ফুরিয়ে যদি একদিন মরণ আসে

জীবন ফুরিয়ে যদি একদিন মরণ আসে
তবু দেখে যেন যেতে পারি কোরআনের রাজ
দয়াময় ওগো তুমি দয়াময়
রেখো এ মিনতি জিন্দা করো পুন: ইসলামী সমাজ।।

দাও সেই দিল সেই বাহু সেই সালতানাত
তাওফিক দাও খোদা হতে পারি যেন
আখেরী নবীর খাস উম্মাত
কেয়ামাতে শাফায়াত নসীব করো
পেতে যেন নাহি হয় লাজ।।

সেই আদালতে আখেরাতে যেদিন নবী
সুধাবেন উম্মত তোমার মুখের মাঝে
দাঁতগুলো অক্ষত দেখছি সবি
তোমার জীবনে বদর আসেনি কি
ওহুদ সামনে ফের করে কী কাজ।।



www.nagorikpathagar.org

# আমাদের উৎসব আমাদের আয়োজন

আমাদের উৎসব আমাদের আয়োজন
আমাদের উদ্যোগ আমাদের প্রয়োজন
আঁধারের দিক থেকে সবাইকে ডেকে ডেকে
তাঁরই দিকে আনবার জন্য।।

আমরা তো শিল্পী এই নয়
আমাদের সব পরিচয়
আমরা তো ঈমানের পথে চলা সৈনিক
নেই নেই নেই তাতে কোন সংশয়
আমাদের পদ্ধতি আমাদের সংহতি
সত্যকে জানবার জন্য।।

আমরা তো জড়ো হই জনতার
জাগরণের প্রেরণা প্রেরণা হয়ে
সমবেত হই মোরা তাগুতের উৎখাতে
বিপ্লবী বাণী যতো কণ্ঠে লয়ে
আমাদের সংগ্রাম অবিরত অবিরাম
কালো হাত ভাঙবার জন্য।।

আমাদের গানে গানে সুরে
কবিতায় সেই জয়গান
যাতে আসে আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের
পথ ধরে চলবার চির আহ্বান
এই কাজে কারো বাধা কোনদিন মানবো না
আর নেই কোন কথা অন্য।।



www.nagorikpathagar.org

# যে গানে শেখার কিছু নেই

যে গানে শেখার কিছু নেই
যা শুনে লেখার কিছু নেই
সে গান আমি শিখবো না
সে গান আমি লিখবো না
সে গান আমি গাইবো না (ভাই)
কোন কিছুতেই।।

ভ্রান্ত পথিক পথ খুঁজে পায়
যে গান গেলে
সান্ত্বনা পায় অশান্ত কেউ
যে সুর পেলে
সে গানেরই গায়ক হব
সে সুরেরই সাধক হব
সবার অলখেই।।

অলসতার অন্ধকারে যে গান মনে
কাজের কথা স্মরণ করায় ক্ষণে ক্ষণে
সে গান আমি করবো তো
সে সুর আমি ধরবো তো
নিজের গরজেই।।

আল কুরআনের আলোর দিকে
যে গান ডাকে
চিরকালই সফলতার ছবি আঁকে
সে গান আমি ছাড়বো না
কে বলে তা পারবো না
একটু চেষ্টাতেই।।



www.nagorikpathagar.org

## যে সকল যুবক দ্বীনের কাজে লেগে থাকে সারাদিন

যে সকল যুবক দ্বীনের কাজে লেগে থাকে সারাদিন
রাত্রি কাটায় লেখায়–পড়ায়, জ্ঞান সাধনায় নিদ্রাহীন।।

যেসব যুবক আল কুরআনের সমাজ গড়ার বেলায়
জীবন দেবার স্বপ্ন দেখে শাহাদাতের মেলায়
সকল কিছু দেয় বিলিয়ে দ্বীনের পথে হয় বিলীন
তাদের কাছে আমি ছিলাম ঋণী, নতুন করে করছি ঋণ।।

যেসব যুবক লোভের কাছে হয় না পরাজিত
বিনয় এবং ভালোবাসায় বরং আলোকিত
যাদের নেতা বিশ্বনবী সাইয়্যেদু আল কাওনাইন
তাদের জন্যে আমি বুক পেতে দেই, বাজাই বুকের অগ্নিবীণ।।



www.nagorikpathagar.org

# সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে

সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে
পাহাড়ি ঝর্ণাধারাতে
কত যে স্বপন সুষমা
মোহন মহিমা গোপন গরিমা
রেখেছো হৃদয় ভোলাতে।

পাখিদের কূজন কাকলি
সবুজের সোহাগ শ্যামলী
গাহে যে তোমারই গান
ছড়িয়ে সুরেরই তান
হৃদয়ের পাপড়ি খোলাতে।।

নীলিমার নিখুঁত নিলয়ে
পৃথিবীর বিপুল বিষয়ে
দিয়েছো শোভা অফুরান
হে মহান হে মহীয়ান
আপনি আপন মেলাতে।।

বিহানের বিমল বাতাসে
অসীমের আকুল আভাসে
দেখি যে তোমারই শান
হে খোদা হে রহমান
জীবনের হিসাব মেলাতে।।



www.nagorikpathagar.org

# মজলুম শোনো ওই কাঁদে

পৃথিবী জুড়ে আজ কতো অসহায়
মজলুম শোনো ওই কাঁদে
শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনা যে
মানুষের মতবাদে।।

সুখের আশায় যেথা ছুটে যায়
ফিরে আসে হতাশাতে
বাঁচার আশা লাঞ্ছিত হয়
মিথ্যার কষাঘাতে
শৃঙ্খল বাঁধনে হাহাকার করে আহত আর্তনাদে।।

আশ্রয় ভেবে যার কাছে যায়
পায় না তো খুঁজে তারে
ভিটে-মাটিহীন কাটে দুর্ভোগে
যাতনাই শুধু বাড়ে
মনের গভীরে তোলপাড় করে মুক্তির আস্বাদে।।



www.nagorikpathagar.org

## ভয় নেই ভয় নেই নেই ভয়

ভয় নেই ভয় নেই নেই ভয়;
কোরানের রঙে রেঙে
বাধার দেয়াল ভেঙে
আনো আনো তাগুতের লয়।।

আল্লা'কে প্রভু জেনে
রসূলকে নেতা মেনে
হে পথিক চলো নির্ভয়।।

ঈমান এনেছে যারা ভাই
কখনো তাদের
ক্ষয় নাই, ক্ষয় নাই।

জীবনের গান গেয়ে
জেহাদের পথ বেয়ে
আনো দিন আনো সে বিজয়।।



www.nagorikpathagar.org

## কখন কে যে হারিয়ে যাবে

কখন কে যে হারিয়ে যাবে
কেউ তো জানলে না রে পাগল
এই আছো এই নেই তবুও
কিছুই মানলে না।।

পয়সা মারো মারো টাকা
পরের তবিল করে ফাঁকা
সুদ খাও ঘুষ খাও জন্মের খাওয়া
যার কাছে যা যায় রে পাওয়া
ইচ্ছে করে লম্বা লোভে
লাগাম টানলে না।।

যা করো তার জবাব দেয়ার
ভাবনা ভাবলে না পাগল
পাপের অনুতাপে হায় রে
একটু কাঁদলে না পাগল।

লাজ শরমের খেয়ে মাথা
দাও যে ধোঁকা যথা তথা
ছলবল গলবল কলা কৌশল
সবটুকু মাখন নাও রে তুলে
জেনে শুনে ধ্বংসের বুকে
আঘাত হানলে না।।



www.nagorikpathagar.org

# হৃদয়ে হৃদয় রাখি

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

'হৃদয়ে হৃদয় রাখি' গানের পাণ্ডুলিপিতে সর্বমোট ৩৬টি গান আছে। এই গানগুলো বিভিন্ন সময়ে লেখা। এই পাণ্ডুলিপিতে যেমন 'প্রতীতি' অ্যালবামের গান আছে, তেমনি আছে তাঁর জীবনের শেষ দশকে রচিত গানও। বিভিন্ন সময়ের গানগুলো সংগ্রহ করে এই পাণ্ডুলিপিতে সাজানো হয়েছিলো। পাণ্ডুলিপির গানগুলোর বিষয়বস্তুও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এখানে হামদ-নাত ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি বিয়েশাদি বিষয়ক গানও স্থান পেয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন মোমিন উদ্দীন খালেদ।

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র

যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছো আসমান/ ১০৭
তলায়াল বাদরু আলাইনা/ ১০৮
আল কোরআনের পথ/ ১০৯
একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না/ ১১১
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়/ ১১২
কেউ না করুক/ ১১৩
এখানে কি কেউ নেই/ ১১৪
হে খোদা মোর হৃদয় হতে/ ১১৫
কার কতটা ঈমান আছে/ ১১৬
শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে/ ১১৭
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ/ ১১৮
জেহাদ করতে চাই/ ১১৯
টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা/ ১২০
গান আমার কাঁদেরে/ ১২১
ঈদ এলো মানুষের জন্য/ ১২২
আয় না সবাই এক হয়ে যাই/ ১২৩
ওদের ঘরে সুখ দিও গো দিও সান্ত্বনা/ ১২৪
বর সাজিয়ে দিলাম তোমায়/ ১২৫
আবার এলো রমজান/ ১২৬
এক হও মুসলিম এক হও আজ/ ১২৭
বিজয়ের দিন হোক শপথের দিন/ ১২৮
বল, না'রায়ে তাকবীর/ ১২৯
ইসলামী রেনেসাঁর কর্মী আমি/ ১৩০
মানবতার মুক্তি সনদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ/ ১৩১
চোখ রাংগাবার ধারি নাকো ধার/ ১৩৩
আমরা কারো ভয় করি না/ ১৩৪
পাহাড় পর্বত উপড়ে ফেলার শক্তি রাখে যারা/ ১৩৫
জনতার মনে চেতনার শিখা জ্বলছে/ ১৩৬

www.nagorikpathagar.org

কোন সাহসে চাও নেভাতে/ ১৩৭
এখনও অনেক ধৈর্য ধরতে হবে/ ১৩৮
কাল এখানে ছিল যে/ ১৩৯
আমাদের বুকে লেখা/ ১৪০
আমরা সবাই গান গাইব শুধু/ ১৪১
দ্বীন কায়েমের পথে চলার/ ১৪২
আজকে দেশের সব শত্রুকে/ ১৪৩
মানুষকে ভালোবেসে লাভই বেশি/ ১৪৪

www.nagorikpathagar.org

# যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছো আসমান

যেমন তুমি দিলে জমিন দিয়েছো আসমান
সুখের সমাজ গড়তে দিলে তেমনি কোরআন
তোমার দয়া অফুরান, দয়া অফুরান।।

তৃষ্ণা নিবারণে দিলে স্বচ্ছ সাধু পানি
জঠর জ্বালা জুড়াতে আর ফুল ও ফসল জানি
পথের দিশায় তেমনি দিলে রাসূলে আকরাম
রাসূলে আকরাম, রাসূলে আকরাম।।

তুমি দিলে চোখের আরাম শান্ত নদীর বাঁক
গাছ-গাছালির শাখায় শাখায় পাখ পাখালির ডাক
দিলে পাখ পাখালির ডাক।

বৃষ্টি ঢেলে জীবন দিলে শুকনো মাটির বুকে
আদর সোহাগ দান করেছো নানা রঙের দুখে
দান করেছো তেমনি তুমি জ্ঞান আরও বিজ্ঞান।।



www.nagorikpathagar.org

# ত্বলায়াল বাদরু আলাইনা

ত্বলায়াল বাদরু আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা
মাদাআ লিল্লাহি দা।।

রাতের আঁধার কেটে কেটে
আকাশে চাঁদ উঠলো ঐ
সারা জাহানের দিকবিদিকে
আলোর ধারা ছুটলো ঐ।।

পাহাড় ঝরণা নদী সাগর
সেই আলোতে হাসছে ঐ
সেই আলোতে নিখিল ভুবন
আকুল হয়ে ভাসছে ঐ।।

মানবতার বন্ধু তিনি
রাহমাতুল্লিল আলামীন
তাইতো শোকর আদায় করে
কুল মাখলুকাত নিশিদিন।।



www.nagorikpathagar.org

# আল কোরআনের পথ

আল কোরআনের পথ
এই পথই আসল পথ
অন্য পথে অন্য মতে
নেই যে রহমত।।

আল কোরআনের আলোয়
যার জীবন আলোকিত
সে চির বিপ্লবী
নয় কখনো ভীত
তার বুকেতেই শুধু
খোদার অথৈ মুহব্বত।।

আল কোরআনের প্রেমে
যে বারেক পড়ে যায়
দ্বীন কায়েমের তরে
সে শহীদ হতে চায়
সে-ই জেহাদের রাহে
গড়ে নিজের ভবিষ্যৎ।।

এই পথ ধরে যে চলে
সে নীতির কথা বলে
জোগায় না সে কিছু
ছলে বলে কলে
জমায় না সে কভু
কোন অবৈধ সম্পদ।।

ভাগ্য যাদের ভালো
শুধু তারা এ পথ পায়
ভাগ্যাহত যারা
তারা আঁধারে হারায়।।



www.nagorikpathagar.org

আল কোরআনের কর্মী
ছিলেন আবুল কাসেম ভাই
সত্য ন্যায়ের পথে
অমর তিনি তাই
তাঁরেই ভালোবেসে
মোরা পাই যে রে হিম্মত।।



www.nagorikpathagar.org

# একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না

একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না
যতই আসুক বাধা
যতই আসুক বিপদ
ভেঙে পড়ে না।।

অর্থ-বিত্ত নাইবা থাকলো তার
নাইবা থাকলো সাজানো সংসার
তবুও সে হয় না হতাশ
মুষড়ে পড়ে না।।

একজন মুজাহিদ জীবনের ধ্রুব সত্য জানে
তাই অবিরাম ছুটে চলে সঠিক লক্ষ্য পানে।

সামনে থাকলো বাধার পাহাড় তার
দুশমন হলো না হয় বেশুমার
তবুও সে চলতে থাকে
থমকে দাঁড়ায় না।।



www.nagorikpathagar.org

# পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরণ একদিন মুছে দেবে
সকল রঙিন পরিচয়।।

মিছে এই মানুষের বন্ধন
মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন
মিছে এই জীবনের রংধনু সাত রঙ
মিছে এই দু'দিনের অভিনয়।।

একদিন হিসেবের খাতা খুলে বন্ধু
তোমাকেই দাঁড়াতে হবে
সেইদিন প্রশ্নের কী দেবে জবাব হায়
বলো না কী কথা কবে।

মিছে এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
মিছে গান কবিতার ছন্দ
মিছে এই অভিনয় নাটকের মঞ্চে
মিছে এই জয় আর পরাজয়।।



www.nagorikpathagar.org

## কেউ না করুক

কেউ না করুক; আমি করব কাজ
আল কোরআনের আহ্বানে
দ্বীন কায়েমের প্রয়োজনে
নতুন করে আবার আমি
শপথ নিলাম আজ।।

আমি হতাশ হব না ভেঙে পড়ব না
নিরাশ হব না ভয়ও করব না
দ্বীনের কাজে ব্যস্ত রব
বরং সকাল সাঁঝ।।

দিনের পরে রাত্রি যেমন আসে
তেমনি আবার রাতের পরে
দিনের আলো হাসে।

আমি তাই তো থামবো না
বাধা মানবো না
মিছেই কাঁদবো না
ব্যথা সাধবো না
আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যাবো
নিত্য সবার মাঝ।।



www.nagorikpathagar.org

## এখানে কি কেউ নেই

এখানে কি কেউ নেই খোদার রঙে জীবনকে রাঙাবার
এখানে কি কেউ নেই খোদার রাহে জীবনকে বিলাবার।।

এখানে কি নেই খালিদের মত কেউ
এখানে কি নেই সালাদ্দীন সম কেউ
এখানে কি নেই তারিকের মত কেউ
এই দুর্দিনে অভিযান চালাবার।।

ঐ তো কাফেলা মদিনার পথে চলেছে দুর্নিবার
ঐ তো নকীব হেঁকে যায় শোনো আল্লাহু আকবার।।

এখানে কি নেই খাব্বাবের মত কেউ
এখানে কি নেই হামজার মত কেউ
এখানে কি নেই মালেকের মত কেউ
এই দুর্দিনে অভিযান চালাবার।।



www.nagorikpathagar.org

## হে খোদা মোর হৃদয় হতে

হে খোদা মোর হৃদয় হতে
দূর করে দাও সকল বেদনা
সকল ভাবনা
দূর করে দাও সব যন্ত্রণা
সকল যাতনা।।

তুমি ছাড়া কেউ যেন আর
জায়গা না পায় লুকিয়ে থাকার
এই অন্তরে এই পরানে
তুমি কামনা।।

আলেয়া সব আলো তো নয়
মিথ্যা অমানিশা
খাঁটি প্রেমের তুমিই আধার
আর সকলই বৃথা।।

তোমার প্রেমে হয়ে পাগল
দুই নয়নে নামিয়ে বাদল
যাই ভাসিয়ে যেন আমি
দহন বেদনা।।



www.nagorikpathagar.org

# কার কতটা ঈমান আছে

কার কতটা ঈমান আছে
সময় এলো পরীক্ষার
রণাঙ্গনের ডাক আসে ঐ
লগ্ন তুলি প্রতীক্ষার।।

কে সাহসী
কে ভীরু আর
এই তো সময় পরখ করার
আজ প্রয়োজন
শক্তি সাহস
ধৈর্য ত্যাগ ও তিতিক্ষার।।

লম্বা কথার দিন গেছে ভাই
ভাঁওতাবাজির দিন গেছে
যার হৃদয়ে আছে ঈমান
আজকে কেবল সেই বাঁচে।

আল্লাহ তায়ালার বান্দা কে সে
কে সে বেড়ায় ছদ্মবেশে
হিসেব মেলার লগ্ন এলো
লগ্ন এলো নিরীক্ষার।।



www.nagorikpathagar.org

# শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে

শহীদ মালেক আজো আমায় ডাকে
সকল বাধা পেরিয়ে যেতে
সেই দিশারী আড়াল থেকে হাঁকে।।

আমি যখন পিছিয়ে পড়ি
দ্বীনের কাজের হেলা করি
খানিক ভুলের রাস্তা ধরি রে
শহীদ মালেক তখন আমায়
নতুন করে ডাক দিয়ে যায়
তার সে ত্যাগের রক্তমাখা বাঁকে।।

আমি যখন আমার শপথ
যাই ভুলে যাই– হারাই হিম্মত
ভুলি দ্বীনের আসল হিম্মতরে
শহীদ মালেক তখন এসে
তপ্ততাজা রক্তে ভেসে
আশার আকাশ আমার বুকে আঁকে।।

দৈন্যদশা- অনটনে
দুঃখ যখন জাগায় মনে
কষ্ট আনে ক্ষণে–ক্ষণে রে
এক পাজামা পাঞ্জাবী আর
ক্ষুধায় কাতর তার চেহারার
রোশনী আমায় মুগ্ধ করে রাখে।।



www.nagorikpathagar.org

# জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ

জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বীর মুজাহিদ জিন্দাবাদ
হযরত আলীর বিপ্লবী খুন
তোর দীলে আজ হোক আবাদ।।

দুর্গম মোরা যোদ্ধা বীর
মহা ভীতি ভয় ধরিত্রীর
ঝঞ্ঝার বেগে নির্মূল কর
জালিম দলের স্বপ্ন সাধ
বৃষ্টির পরে ভেঙে পড়ে যেন
অত্যাচারীর রাজ প্রাসাদ।।

আলো ঝড় আনুক প্রাণ মাতাল
নাচুক ধরনী টালমাটাল
ঘুমাইয়া যারা জাগিয়া দেখ
উড়ছে আকাশে রক্তলাল
স্বাধীন তুমি যে মুসলিম তুমি যে
সেই বীর সেই দিল আজাদ।।



www.nagorikpathagar.org

# জেহাদ করতে চাই

জেহাদ করতে চাই আমি
জেহাদ করতে চাই
জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো
পথে মুক্তি নাই।।

খাঁটি মুমিন না হলে কেউ
হয় না মুজাহিদ
আল্লাহর পথের পথিকদেরও
হয় নাকো সুহৃদ
গাজী হতে চাই আমি
গাজী হতে চাই
আব্বাস আলী খানের মতো
গাজী হতে চাই।।

দুর্বল ভীরু কাপুরুষরা
জেহাদ করে না
জীবন দেবার ঝুঁকিপূর্ণ
রাস্তা ধরে না
মালেক ভাইয়ের মত আমি
শহীদ হতে চাই।।



www.nagorikpathagar.org

# টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা

টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে
কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে।।

ঝকঝক ফকফক করে যদ্দিন ঘড়ির চেহারা
তদ্দিন তারে কিনতে চায় যে খরিদ্দারেরা
সময় মতো সময় দিলে সবখানে বিরাজে।।

চকচক তকতক জীবন ঘড়ি করে যতোদিন
দাম থাকে তার সবার কাছে বন্ধু ততোদিন
মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজায় নানান সাজে।।

হায় হায় হায় হায় আসল ঘড়ির অর্থ বুঝলাম না
সময় থাকতে সময়ের মূল অর্থ খুঁজলাম না
খাইলাম দাইলাম ঘুরলাম শুধু এই দুনিয়ার মাঝে।।

যায় যায় যায় যায় দিন চলে যায় কুরআন পড়লাম না
কত নোভেল নাটক পড়লাম হাদীস ধরলাম না
সত্যিকারের খাঁটি মুমিন মুসলিম হলাম না যে।।



www.nagorikpathagar.org

# গান আমার কাঁদেরে

গান আমার কাঁদেরে
প্রাণ আমার কাঁদেরে আজ কাঁদে
মানুষের মুক্তি চেয়ে জীবনের স্বস্তি চেয়ে।।

কেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ
কেন উঁচু নিচুর এত বিদ্বেষ জেদ
হৃদয়ের ব্যথা ভার
সমাজের হাহাকার আজ শুধু
ফেলিছে আকাশ ছেয়ে ফেলিছে বাতাস ছেয়ে।।

কেন হানাহানি চলে বিশ্বময়
কেন সত্যের আজো ঘটে পরাজয়
রাত কাটে মজলুমের
দুঃস্বপ্ন নির্ঘুমের হায় হায়রে
হতাশার চাবুক খেয়ে নিরাশায় আঘাত পেয়ে।।

কেন সুখের সুদিন আজো আসে না
কেন ফুলের মত মানুষ হাসে না
বেদনার অশ্রু বয়
যাতনার অশ্রু বয় বয় কেন
গরিবের দুচোখ বেয়ে দুখিদের দুচোখ বেয়ে।।



www.nagorikpathagar.org

# ঈদ এলো মানুষের জন্য

ঈদ এলো মানুষের জন্য
ঈদ এলো জীবনের জন্য
ঈদের আনন্দ যে ভাগ করে নেয়
সেই জন আসলেই ধন্য।।

একা একা হয় না তো ঈদ
হয় না তো ঈদের খুশি
একা একা ঈদ করে সেই
যেই জন মূলত দোষী
বুকের ভেতর রাখে ভেদ-বিদ্বেষ
হিংসার আগুন জঘন্য।।

ঈদ আসে মানুষের সব জ্বালা যাতনার
ক্ষতগুলো একেবারে মুছে দিতে
শত্রুতা মিত্রতা একাকার করে দিয়ে
ভালোবেসে কাছে টেনে বুকে নিতে।

এসো তাই হাতে রাখি হাত
হৃদয়ে হৃদয় রাখি
মনের সকল নীলিমায়
ঈদের সে চাঁদকে আঁকি
তারপর কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন সুখের
সুসমাজ গড়ি অনন্য।।



www.nagorikpathagar.org

## আয় না সবাই এক হয়ে যাই

আয় না সবাই এক হয়ে যাই
বৈশাখের এই দিনে
হৃদয় দিয়ে সকল হৃদয়
একে একে করিগো জয়
মন দিয়ে মন
নেই গো সবাই কিনে
বৈশাখের এই দিনে।।

দ্বন্দ্ব দ্বিধায় নেই জীবনের মুক্তি
হিংসা ঘৃণা নয়তো কোন যুক্তি
ভালোবাসার আয়না দিয়ে
সবাইকে নেই কিনে।।

বিভাজনের পন্থা ছেড়ে এসো সখ্য করি
এই জাতি এই দেশের তরে অটুট ঐক্য গড়ি।

শপথ করি স্বাধীনতার জন্য
কেউ হবো না অন্ধকারে গণ্য
বরং সবাই রিক্ত হবো
সত্য ন্যায়ের ঋণে।।



www.nagorikpathagar.org

# ওদের ঘরে সুখ দিও গো দিও সান্ত্বনা

ওদের ঘরে সুখ দিও গো দিও সান্ত্বনা
বিবাহের এই শুভক্ষণে
আর কিছু চাই না খোদা।।

আনন্দের হোক ওদের জীবন
সুখ ছুঁয়ে যাক সব ক'টা মন
ওদের জন্য হাত পেতে চাই
রহম করুণা।।

ওদের ঘরে তারিক দিও
দিও দিও খালিদ দিও
বেরলভী আর তীতু দিও
দিও গো বান্না।।



www.nagorikpathagar.org

## বর সাজিয়ে দিলাম তোমায়

বর সাজিয়ে দিলাম তোমায়
ঘর সাজাবে বলে
মাতলো বাড়ি মাতলো পাড়া
আজকে সবাই আত্মহারা
খুশির কোলাহলে।।

শাহানশাহের মতো তোমায়
লাগছে যে গো আজ
তোমার জন্যে চতুর্দিকে
নানান কারুকাজ
নানান রঙের রঙিন খেলা
মন মাতানো মজার মেলা
চলছে কৌতূহলে।।

শোনো রাজা জেনে গেছি
গোপন সূত্রে সব
তোমায় নিয়ে কনের বাড়ি
আজ হবে উৎসব
তাইতো আমরা সবাই যাবো
রাজা তোমায় পাহারা দেবো
টহল সদলবলে।।



www.nagorikpathagar.org

# আবার এলো রমজান

আবার এলো রমজান
মুক্তির নিয়ে বারতা
শান্তির নিয়ে বারতা
মোবারক মাস
রহমের মাস মহীয়ান।।

জীবনের যত পাপ কালিমা
মুছে দিয়ে এনে দিতে লালিমা
সকলের তরে সেই সিয়ামের দান
সিয়ামের দান অফুরান।।

মানুষের সীমাহীন বেদনা
অসহ জীবনের যাতনা
বুঝিবার তরে সেই সিয়ামের দান
সিয়ামের দান অফুরান।।



www.nagorikpathagar.org

## এক হও মুসলিম এক হও আজ

এক হও মুসলিম এক হও আজ
এক হওয়া ঈমানের মূল কারুকাজ।।

আল্লাহর রজ্জুকে ধরো এক হয়ে
দুর্জয় কাফেলাও গড়ো এক হয়ে
নারায়ে তাকবীর তোল রে আওয়াজ।।

শয়তান চায় না তো ঐক্য গড়ি
হাতে হাত কাঁধে কাঁধ জিহাদ করি
সহজে কায়েম করি কোরআনের রাজ।।

কোরআনের ডাকে এক কাতারে দাঁড়াও
ফতোয়ার রেষারেষি যাও ভুলে যাও
উপহার দিতে হলে দ্বীনের সমাজ।।

মতভেদ করে করে আজকে মুমিন
পৃথিবীর কাছে হলো কত যে কমিন
শির থেকে চলে গেলো বাদশাহী তাজ।।

ঐক্যকে ভয় পায় সারা দুনিয়া
ভয় পায় সন্ত্রাসী যত খুনীরা
হোক না সে যত বড় মহা রণবাজ।।

ঐক্যই বিজয়ের বড় হাতিয়ার
মর্যাদা শক্তি সে মহা জনতার
ক্ষুদ্রকে সে বানায় রাজা মহারাজ।।



www.nagorikpathagar.org

# বিজয়ের দিন হোক শপথের দিন

বিজয়ের দিন হোক শপথের দিন
স্বাধীনতা রক্ষায় হবো ভয়হীন।।

দুশমন যেই হোক আমার দেশের
বিষদাঁত ভাঙবোই সর্বনেশের
আগলে রাখবো আমি আমার জমিন।।

স্বাধীনতা রক্ষায় দিয়ে দেবো সব
মানবো না কিছুতেই কোনো পরাভব
পরোয়া কারোর কভু করে না মোমিন।।

বিজয়ের দিন হোক ঐক্য গড়ার
মুক্তির ভাবনায় বক্ষ ভরার
এগিয়ে চলার গাঢ় স্বপ্ন রঙিন।।



www.nagorikpathagar.org

# বল, না'রায়ে তাকবীর

বল, আল্লাহু আকবার
ওরে মুজাহিদ ডাক
দেরে দিকে দিকে হাঁক
জেহাদের মাঠে ভীড়
জমুক আবার
বল, আল্লাহু আকবার।।

খোদাহীন এ সমাজ ভাঙতে হবে
ক্ষমাহীন নির্মম আঘাতে
জেহাদের দাবানল জ্বালতে হবে
ঘুমন্ত শার্দুল জাগাতে
ওরে আল্লার শের
ওরে জাত খালিদের
তাগুতের সব ঘাঁটি কর রে সাবাড়।।

আল্লাহ যে সাথে আছে ভয় কি তোমার
কোরান যে বাঁধা আছে বক্ষে তোমার।

মনগড়া খোদাহীন সব মতবাদ
ঈমানের দৃঢ় শপথে
উপড়াতে আজ হবেই হবে
তৌহিদের দৃঢ় আঘাতে।

ওরে আল্লার শের
ওরে জাত খালিদের
তাগুতের বুনিয়াদ ভাঙ্ রে আবার
খেলাফতে রাশেদা গড় আবার।।



www.nagorikpathagar.org

# ইসলামী রেনেসাঁর কর্মী আমি

ইসলামী রেনেসাঁর কর্মী আমি
কোরানের বিপ্লবী পতাকী সেনা
কুফুরীর উৎখাতে অগ্রগামী।।

আমার খুশির সীমা নাই
ইসলামী রেনেসাঁর বিপ্লবী কাফেলায়
জড়িয়ে রয়েছি তাই
নেইকো দ্বিধা
নেই দ্বন্দ্ব
জীবনের চেয়ে ঐ কাফেলা দামী।।

লক্ষ শহীদ উজ্জ্বল সূর্য যেই আকাশের
গর্বিত আর আলোকিত প্রাণ আমি সেই আকাশের।

আমার চলার শেষ নাই
যতদিন না আল-কোরানকে
জীবনবিধান রূপে পাই
নেইকো বিরাম
নেই বিশ্রাম
কাজ করে যেতে হবে দিন রজনী।।



www.nagorikpathagar.org

# মানবতার মুক্তি সনদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

মানবতার মুক্তি সনদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
বিশ্ব-শান্তির ফল্গু ধারা উৎস ধারা ইল্লাল্লাহ।।

যুগে যুগে এলো যত আলোকের দূত আম্বিয়া
গেয়ে গেল সবাই তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

এই কলেমার চির দুশমন যত নমরুদ ফেরাউন
আবু জেহেল আবু লাহাব অভিশপ্ত আর যারা।।

এই কলেমার জন্যে মুসা হলো মজলুম মিশরে
অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল যে ইব্রাহিম খলিলুল্লা।।

এই কলেমার জন্যে রসূল মার খেয়েছে তায়েফে
ঘর ছেড়েছেন দেশ ছেড়েছেন মোহাম্মদ মাহবুবুল্লাহ।।

এই কলেমার জন্যে বেলাল পাথর চাপা মরুতে
প্রাণ চলে যার তবু মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

এই কলেমার সৃষ্টি ছিদ্দিক উমর খালিদ বীর আলী
সেই কলেমা আজকে কেন হায়রে হায় ভিক্ষার বুলি।।

এই কলেমা বিজয় দিল বদর ওহুদ খন্দকে
সেই কলেমা থাকতে কেন মরে মুসলিম আজ ধুকে।।

এই কলেমা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আল- জেহাদের ময়দানে
সেই কলেমা শুধু খানকায় বন্দী করে কোন জ্ঞানে।

এই কলেমার রাজনীতি ভাই দীপ্ত যে আল-কোরানে
এই কলেমার অর্থনীতি শান্তি আনে সব খানে।।

এই কলেমার নির্যাস দিয়ে গড়লো যে রাসূলুল্লাহ
সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সে দেশ সুনীড় সুখের মদিনা।


www.nagorikpathagar.org

সেই কলেমার স্বদেশ চাইলে গা জ্বলে যায় আজ যাদের
তাদের তরেও এই কলেমা, কলেমা যে তাদের তরেও।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সকল শক্তির উৎসমূল
ভীরুকেও যে সিংহ বানায়-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

মোনাফেকী ছাড়রে বেহুঁশ ছেড়ে দে টাল বাহানা
কলেমার পথ জেহাদের পথ ধর কষে ধর এ রাহা।

এই কলেমার শাসন চাইলে ভাঙতে হবে সব শাসন
এই কলেমার চাইলে সমাজ ভাঙতে হবে সব সমাজ।।

এই কলেমার রাজনীতি ভাই সইতে নারে শয়তানে
গা জ্বলে যায় পিত্ত জ্বলে ছটফটায় সে সব খানে।

কে আছিস আয় বীর মুজাহিদ বক্ষ বাঁধি শপথে
মরতে যদি হয়তো মরবো আল-কলেমার এই পথে।।



www.nagorikpathagar.org

# চোখ রাংগাবার ধারি নাকো ধার

চোখ রাংগাবার ধারি নাকো ধার
মোরা দুর্বার সেনানী খোদার
জয়গান গাই মদিনা কাবার
মোরা সৈনিক রসূলে খোদার।।

কোরানের কথা মোরা বল্‌ছি
কোরানের কথা আরো বলবো
রাসূলের পথে মোরা চলছি
রসূলের পথে মোরা চলবো
শয়তানী জাল ছিন্ন করে
পথ করে নেব আজ
তৌহিদী রেনেসাঁর কাফেলার।।

খোদার শত্রু যারা তারা চায় আমাদের মিটিয়ে দিতে
কোরানের কথা বলা তাই বড় অপরাধ
ওদের হীন ও বাঁকা দৃষ্টিতে।

কোরানের কথা তবু বল্‌ছি
কোরানের কথা আরো বল্‌বো
জেহাদের ঘাঁটি তবু গড়ছি
জেহাদের ঘাঁটি আরো গড়বো
কুফুরির বুনিয়াদ দু'পায়ে দলে
ক্ষমাহীন আক্রোশে
উপড়ে ফেলবো মূল পাশবিকতার।।



www.nagorikpathagar.org

## আমরা কারো ভয় করি না

আমরা কারো ভয় করি না
না–না–না ভয় করি না
আমরা কারো ধার ধারি না
না না না ধার ধারি না।।

আমরা আল- কোরানের বিপ্লবী যে
আমরা আল–ইসলামের সংগ্রামী যে
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো
না না না মানি না।।

আমরা খালিদ আলীর জংগী বংশধর
আমরা মহা সত্যের বজ্র কণ্ঠস্বর।

জানি আমাদের পথ তৌহিদের পথ
জানি আমাদের পথ জেহাদের পথ
রসূল ছাড়া অন্য নেতা
না না না মানি না।।



www.nagorikpathagar.org

# পাহাড় পর্বত উপড়ে ফেলার শক্তি রাখে যারা

পাহাড় পর্বত উপড়ে ফেলার শক্তি রাখে যারা
খোদার বিধান কায়েম করতে পারে কেবল তারা।।

খড় কুটোর ন্যায় ভেসে চলা জি-হুজুরের দল
খোদার ডাকে দেয় না সাড়া কেননা দুর্বল
আওদা কুতুব আল-বান্নারাই
যায় জাগিয়ে সাড়া।।

নফসের গোলাম রসূলের দাস, খোদাহীন শক্তির
অন্ধ-সেবক ধার ধারে না বলিষ্ঠ যুক্তির
ওরাই কেবল আল-কোরানের
দুশমন সবার সেরা।।

ইসলাম কোনো ধর্মের নাম নয় খোদার সেরা দান
সর্ব যুগের মুক্তি-সনদ বিপ্লবী বিধান
তাইতো মুসলিম চির দুর্বার
দুর্জয় গতিধারা।।

ভেড়ার মতন কাউকে চাই না সিংহ শার্দুল চাই
অবুঝ ব্যথা বক্ষে চেপে তাই এ গজল গাই
ভীরু দিয়ে আল-কোরানের
যায় না সমাজ গড়া।।



www.nagorikpathagar.org

# জনতার মনে চেতনার শিখা জ্বলছে

জনতার মনে চেতনার শিখা জ্বলছে
নিশিথের তীরে সূর্য যে কথা বলছে।।

ক্রন্দন ভরা দিন
লাল খুন মাখা ঋণ
আগামী দিনের বিজয়ের কথা বলছে।।

সবহারা মানুষের
অম্লান সাহসের
ত্যাগ তিতীক্ষা উদয়ের পথে চলছে।।

শান্তির অম্লান
শ্যামায়িত আরমান–
হেজাজের ঝড়ে বীভৎস বাধা দলছে।।



www.nagorikpathagar.org

# কোন সাহসে চাও নেভাতে

কোন সাহসে চাও নেভাতে
অগ্নিগিরি বলো
চোখ রাঙিয়ে যায় কি রোখা
জোয়ার টলোমলো।।

বৈশাখী ঝড় পাগলপারা
বাঁধনহারা
ভ্রুক্ষেপহীন আগল ভাঙা
রুদ্র রাঙা
চলার ধাঁধাঁয়
বাধায় বাধায়
তারপরে সে ঝঞ্ঝা হলো।।

মৃত্যুকে যে কঠিন হৃদয়
করলো বিজয়
অমর হবার হাতছানি পায়
হাতছানি দেয়
তারে আবার
ভয় দেখাবার
সুযোগ কোথায় তুমি বলো।।



www.nagorikpathagar.org

## এখনও অনেক ধৈর্য ধরতে হবে

এখনও অনেক ধৈর্য ধরতে হবে
এখনও অনেক কষ্ট করতে হবে
বিরাম বিরতিহীন অবিরত
আসহাবে রাসূলের ত্যাগের মতো
জীবন সম্পদ সব দিয়ে আমরণ
লড়তে হবে।।

এখনও অনেক কথা হয়নি বলা
কুরআনের সুরে সুরে এখনও
এখনও অনেক কাজ হয়নি করা
মঞ্জিল বহু দূরে এখনও
কঠোর শ্রমের দামে দিনে দিনে
মহান সংগ্রামীরা নিয়েছে কিনে যে জীবন
সে জীবন ক্রমাগত নিশ্চয়
গড়তে হবে।।

এখনও অনেক দুখ সইতে হবে
এখনও অনেক ব্যথা বইতে হবে
বিরহ  বিধুর দিন অনাহুত
জিহাদের রাহে তবু অনাগত
এখনও লহুর বোঝা বইতে হবে।

এখনও অনেক পথ হয়নি চলা
বাধার পাহাড় নদী ছাড়িয়ে
এখনও অনেক ঝড় আসতে বাকি
বিপদের দুই হাত বাড়িয়ে
দিগন্ত আজও ধরা দেয়নি তো
চূড়ান্ত জয় আজও হয়নি তো
মুক্তির লড়াইয়ের ইতিহাস বারবার
পড়তে হবে।।



www.nagorikpathagar.org

# কাল এখানে ছিল যে

কাল এখানে ছিল যে
আজ সে কোথাও নাই
সবারই তো কিসমত এই
হারিয়ে ফুরাবে ভাই।।

ফুল ফুটে সে চিরদিন
সুবাসেতে হয় রঙিন
আবার বন্ধু ঝরে যায়
হায় রে মানে না বারণ
এই তো জীবন আহারে
সান্ত্বনা খুঁজে না পাই।।

হায়রে কতো হাসি গান
চোখের জলে হয় মলিন
এত সাধের স্বপ্ননীড়
কালের ঝড়ে হয় বিলীন
এই তো ভবের খেলা রে
আলো ছায়ার আলেয়া।।

আজ যে ভালোবাসা প্রেম
কালকে যে তা বিরহ
সুখের ঘরে শোকের বাস
বড় বেশি অসহ
এই তো নিয়ম নিয়তি
হবে না তো অন্যথা।।

ভাগ্য যখন এমনি
তখন ভাগ্যনিয়ন্তার
নির্দেশিত পথ ধরে
গড়ি জীবন যে যাহার
তবেই দুখের বদলে
সুখ পাবো যে যেমন চাই।।


www.nagorikpathagar.org

## আমাদের বুকে লেখা

আমাদের বুকে লেখা মালেকের নাম
হৃদয়ের বাঁকে বাঁকে মালেকের নাম
পৃথিবীর কোথাও যে মালেক আজ নেই
তবু যেন নদী হয়ে বহে অবিরাম।।

সত্যের পথে বীর যারা লড়ে যায়
ইতিহাস লিখে রাখে কালের খাতায়
সেই বীর সংগ্রামী শহীদ মালেক
যার কাছে প্রিয় ছিল খোদায়ি কালাম।।

প্রিয় সেই মালেক আজ জান্নাতি ফুল
আল্লাহর প্রেমে হয়ে আছে মশগুল
যাঁর তরে ঢেলে দিলো রক্তের ধারা
তাঁর প্রেমে ঘুচে গেল দুঃখ তামাম।।

ঘরে ঘরে জেগে ওঠে কিশোরের দল
মালেকের নামে আঁখি করে ছলোছল
চোখে মুখে উচ্ছ্বাসী গভীর শপথ
মালেকের সেই কাজ দেবে আঞ্জাম।।



www.nagorikpathagar.org

# আমরা সবাই গান গাইব শুধু

আমরা সবাই গান গাইব শুধু
আল্লাহর সন্তোষ চেয়ে চেয়ে
প্রথম শপথগুলো করব স্মরণ
জীবনের নাওখানি বেয়ে বেয়ে।।

আমাদের সুর জানি কুরআনের সুর
সুরের ভুবনে সে যে আরও মধুর
ঈমানের দাবি তাই করব পূরণ
জিহাদের গানগুলো গেয়ে গেয়ে।।

আমরা সবাই প্রাণ বাঁধব গো
প্রাণের সাথে সব প্রাণগুলোকে
সমাজের সবখানে আনব জোয়ার
সুন্দর আর সত্যের আলোকে।।

আমাদের পথ জানি কুরআনের পথ
এই পথে মরু আছে আছে পর্বত
তবুও সবাই মোরা সম্মুখে যাই
মুক্তির গানগুলো গেয়ে গেয়ে।।



www.nagorikpathagar.org

# দ্বীন কায়েমের পথে চলার

দ্বীন কায়েমের পথে চলার
দাও খোদা তাওফিক
রক্ত চোখের চাওনি যতই
থাক না চতুর্দিক।।

পথে আমি সই যেন গো
সকল অবহেলা
নদীর গতি নিয়ে আমার
যাক কেটে যাক বেলা
রবির মতো নিই যেন সিদ্ধান্ত সঠিক।।

যেসব কাজে আহত হয়
খোদার খাঁটি বান্দা
সরল পথের পথিকদেরও
চোখে লাগায় ধাঁধা
সেই সকলি বর্জনে হই
যেন আন্তরিক।।



www.nagorikpathagar.org

## আজকে দেশের সব শত্রুকে

আজকে দেশের সব শত্রুকে
রুখে দাঁড়াবার দিন
দেশের সকল বিভীষণদের
জনতার চির দুশমনদের
শুধু তাড়াবার দিন
আজকে প্রাণের বদলে হলেও
শুধতেই হবে মাতৃভূমির ঋণ ।।

স্বদেশবিরোধী ঘৃণ্য ভূমিকা
পষ্ট করছে যারা
আজকে দেশের ধনসম্পদ
নষ্ট করছে যারা
জীবনের সব, সব ঝুঁকি নিয়ে
তাদের শক্তি শেষ করে দিয়ে
মানুষের যত জ্বালা জুড়াবার
বাজাও বাজাও বীণ ।।

দেশের সর্বনাশীরা আসলে
ঈমানেরও সর্বনাশী
এরাই শক্তি অপশক্তির–
শয়তানী– খন্নাসী ।

দেশের সকল নিয়ম-নীতির
শিকড় কাটছে যখন
স্বদেশপ্রেমের অগ্নিদহনে
প্রতিবাদী হও তখন
দেশজনতার হাতে হাত দিয়ে
কাঁধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিলিয়ে
আগ্রাসীদের সকল দালাল
করো গো ঠিকানাহীন ।।



www.nagorikpathagar.org

# মানুষকে ভালোবেসে লাভই বেশি

মানুষকে ভালোবেসে লাভই বেশি
আসলে বিপথে পড়ে মানুষকে ঘৃণা করে
মানুষের বেশে যারা ছদ্মবেশী।।

সৃষ্টির সেরা এই মানুষ ছাড়া
রুদ্ধ এ জগতে গতির ধারা
গতির কথা ভেবে
আরো কাছে টেনে নেবে
মানুষেরে হোক না সে যে কোন দেশি।।

আল্লাহকে পেতে হলে মানুষের সেবা করা চাই
মানুষের দিশারী সে রাসূলের পথ ধরা চাই।

চারিদিকে আছে যত সর্বহারা
তোমার আমার মত মানুষ তারা
তাদের দুঃখ শোকে চিরদিন পাশে থেকে
ভিত ভাঙি বাতিলের সর্বনাশী।।



www.nagorikpathagar.org

# চিরকালের গান

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# চিরকালের গান

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

'চিরকালের গান' নামে কবির একটি গীতিকাব্য গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা ছিলো। এই গ্রন্থের জন্য কবি বেশ কিছু গানও চিহ্নিত করেছিলেন, যদিও জীবদ্দশায় তিনি তার পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে যেতে পারেননি। কবি আফসার নিজামের কাছে রক্ষিত এই পাণ্ডুলিপির সঙ্গে নতুন করে খুঁজে পাওয়া কিছু গান এই অগ্রন্থিত পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত করা হলো।

পাণ্ডুলিপিটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের কলেবর দেয়ার জন্যই নতুন গানগুলো যুক্ত করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম আলী।

www.nagorikpathagar.org

## সূচিপত্র


প্রশংসা সবই কেবল তোমারই/ ১৫১
ও আল্লাহ আল্লাহ গো....../ ১৫২
আল্লা'র পথে ডাকছো যে-তুমি/ ১৫৪
তিনি এক/ ১৫৫
ইয়া সায়্যিদী ইসফালানা / ১৫৬
যার এতায়াত করলে জীবন/ ১৫৮
সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলছে কেনো/ ১৫৯
প্রতিদিন যতো পারো/ ১৬১
তুমি যারে চাও পেছনে ফেলতে/ ১৬২
মিথ্যা বলা ছাড়লো না যে/ ১৬৩
আল্লাহকে সত্যি ভালোবাসে যে/ ১৬৪
মহাবোঝা/ ১৬৫
সবার ভাগ্যে জোটে না/ ১৬৬
সুন্দর চোখ মুখের মানুষ/ ১৬৭
মিথ্যে কথা বলবো না/ ১৬৮
তোমার কথাই/ ১৬৯
বল ওরে বল বিজয় ওরে/ ১৭০
যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা/ ১৭১
মূর্তি নিয়ে থাকবে/ ১৭২
আল্লা'র রাহে জেহাদ না করে/ ১৭৩
চারিদিকে সন্ত্রাস/ ১৭৪
ঈদের গান/ ১৭৫
এবার আমার ঈদটা যেন/ ১৭৬
চারিদিকে আজ স্বার্থের হানাহানি/ ১৭৮
মোরতাদ অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়/ ১৭৯
গদীর লোভীরা দেখ সারাদেশ জুড়ে/ ১৮০
যখন দেশের সিংহাসনে/ ১৮১


www.nagorikpathagar.org

চেচনিয়া চেচনিয়া/ ১৮৩
কাশ্মীরে যত ফেলে থাবা হায়নারা/ ১৮৫
কাল দিয়েছো বেরুবাড়ি/ ১৮৭
আফগান/ ১৮৮
বাংলাদেশের মদিনায় ঐ দেখো/ ১৮৯
পুলসিরাতের সাথী তিনি/ ১৯০
দু'টি নয়ন মুদিলে/ ১৯১
ভুলে ভুল করা/ ১৯২
কঠিন হৃদয়/ ১৯৩
এই মহা পৃথিবীর পাত্র থেকে/ ১৯৪

www.nagorikpathagar.org

## প্রশংসা সবই কেবল তোমারই

প্রশংসা সবই কেবল তোমারই
রাব্বুল আলামীন
দয়ালু মেহেরবান করুণা অফুরান
আর কেউ নয় তুমি মালিক
শেষ বিচারের দিন।।

কেবল তোমারি করি ইবাদত
কেবল তোমারি চাহি নেয়ামত
দাও দিশা দাও সরল পথের
সিরাত মুস্তাকীম।।

যাদের ওপরে করেছো রহমত
পেয়েছে তোমার অথৈ মোহাব্বত
তাদের সে পথ দাও আমাদের
দাওগো তোমার দ্বীন।।

যাদের ওপরে কেবলই গজব
নাজিল করেছো দিয়েছো আজাব
তাদেরই ভাগ্য দিও না মোদের
হে অসীম সীমাহীন।।



www.nagorikpathagar.org

# ও আল্লাহ আল্লাহ গো......

ও আল্লা' আল্লা' গো......
মোদের ওপর তুমি
করো রহমত;
দুঃসহ বোঝা যতো
করে শুধু ব্যথাহত
সরাও সে-সব তুমি
দাও বরকত:
কায়মনে চাই যে আজ, মাগ্‌ফেরাত।।

ভুল যদি করে থাকি
বুঝে-না-বুঝে
ধ'রো না মোদের তুমি
সে-সব খুঁজে
গঞ্জনা খরতর
লাঞ্ছনা দূর করো
বাঁচাও গজব থেকে দাও ইজ্জত।।

ভক্তি-শ্রদ্ধা দাও
সর্বস্তরে
বিনয়-মমতা দাও
প্রতি-ঘরে-ঘরে
একতার বোধ দাও
ক্ষমতা প্রবোধ দাও
ধৈর্যের দাওয়া দাও, দাও হিকমত।।

বড়দের সম্মান
ছোটরা করুক
ছোটদের স্নেহভরে
বড়রা ধরুক
উদারতা আকাশের
মতো হোক সকলের
জয়ের উঠুক ফুটে সব আলামত।।


www.nagorikpathagar.org

কর্মপ্রেরণা দাও
সকলের মনে
সেবার দুহাত দাও
সর্বজনে
দরদী সে-দিল দাও
প্রেমের নিখিল দাও
জাতির বদলে যাক হাল-হাকিকত।।

দ্বীনের অরিরা যতো
হানছে ছোবল
রুখবার ততো তুমি
দাও সম্বল
মা'বুদ করুণা করো
অন্তর দৃঢ় করো
তাড়াতে তাকত দাও যতো জুল্‌মত।।

সবহারা অসহায়
এই জাতিরে
নিপীড়িত মজলুমঃ
সেই খাতিরে-
উদ্ধার করো খোদা
বাঁচবার দাও সুধা
মোকাবেলা করবার দাও হিম্মত।।



www.nagorikpathagar.org

# আল্লা'র পথে ডাকছো যে-তুমি

আল্লা'র পথে ডাকছো যে-তুমি
সেরা সেই আহ্বান;
সেই আহ্বানে জীবন কাটানো
পরম যত্নে সময় খাটানো
হেলাফেলা নয়, ছেলেখেলা নয়
তুমি যে-ভাগ্যবান।।

জাহেলিয়াতের পথে যারা ডাকে হায়
জাহান্নামের পরিণাম তারা পায়
পড়ুক নামাজ, রাখুক সে-রোজা
বৃথাই যে-তার আখেরাত খোঁজা;
করুক সে-দাবিঃ
নিজে-সে-নিজেই
সাচ্চা মুসলমান।।

আল্লা'র পথে ডাকার অর্থ
মুক্তির পথে ডাকা
শান্তির পথে, সাম্যের পথে
চির অবিচল থাকা
বুকের ভেতরে সকলে মিলেই
স্বাধীন পতাকা রাখা
সুস্থ-সবল নিরাময় এক
পৃথিবীর ছবি আঁকা।

তোমার কষ্টে কত লোক পথ পায়
পাপের ছোবল থেকে তারা বেঁচে যায়;
বেঁচে যায় জাতি, বেঁচে যায় দেশ
ছড়ায় নিকষ আলো অনিশেষ
সবার কণ্ঠে বেজে ওঠে সুর
বিজয়ের জয়গান।।



www.nagorikpathagar.org

# তিনি এক

তিনি এক, চির একা
তাকাতে হয় না তাই
কারো কাছে তাঁর নাই
নাই কোনো ঠেকা নাই।।

তিনি কারো পিতা নন
নন কারো সন্তান
কুলমাখলুক সদা
গায় তাঁর গুণগান
তাঁর কাছ থেকে সবে
সমান বিচার পাই।।

যিনি একক- যিনি আহাদ
সর্বেসর্বা যিনি;
তিনিই প্রথম, তিনিই অন্ত
খালিক-মালিক তিনি।

সমকক্ষতো তাঁর
নাই নাই কেউ নাই
শক্তি ও ক্ষমতায়
নাই তাঁর তুলনাই;
তাঁর আশ্রয় ছাড়া
নাই আর কোনো ঠাঁই।।



www.nagorikpathagar.org

# ইয়া সায়্যিদী ইসফালানা

[মূল : শেখ সাদী রহ.]

ইয়া সায়্যিদী ইসফালানা
ইয়া সায়্যিদী ইসফালানা
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আকবার।।

বালাগাল উলা বি কামালিহী
কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহী
হাসুনাত জামিউ খিছালিহী
সাল্লু আলাইহি ওয়ালিহী।।

ইন্নাল তিয়া রিহাস সবাহ্,
ইয়াওমান ইলা আরদিল হারাম
বাল্লিগ সালামী রওদাতাম,
ফি হান নাবিয়্যুল মুহতারাম।।

আমিও কি তব উম্মত নহে
হিয়া পেরেশান তোমার বিরহে
অনেক সাগর তোমাতে হারায়
অনেক আকাশ দু'হাত বাড়ায়।।

দিয়েছো কেবল চাওনি কিছুই
ভেবেছো সমান উঁচু কি নিচুই
ওগো প্রিয়তম প্রেম দাও কিছু
না হয় তোমার ছাড়বো না পিছু।।

চাইনাতো পীর চাই না মুর্শিদ
তুমিই এরাদা তুমিই উমীদ
সব মানুষেরে মর্যাদা দিলে
সবহারাদের বুকে তুলে নিলে।।



www.nagorikpathagar.org

তুমি চিরদিন অনুসরণীয়
সব সৃষ্টির তুমিই প্রিয়।।

তুমি নেতা মোর সমস্ত কাজে
তুমি আছো মোর হৃদয়ের মাঝে
সংগ্রামী তুমি বিপ্লবী তুমি
তোমার পথেরই মুজাহিদ আমি।

তুমি দূর করে দিলে সব ভ্রান্তি
চাওনি তো তুমি কোনোই অশান্তি
কোরানী সমাজ গড়তে বলেছো
আজীবন তাই লড়াই করেছো।।



www.nagorikpathagar.org

## যার এতায়াত করলে জীবন

যার এতায়াত করলে জীবন
হয় গো আলোক ধন্য
আমি যেন হই গো খোদা
তাঁর আদর্শের সৈন্য।।

আমার চেয়েও আমি যেন
তারে ভালোবাসি
তারই জন্যে বিলাই যেনো
সকল কান্না হাসি
খাঁটি উম্মত হিসেবে তাঁর
হই গো যেন গণ্য।।

অনুসরণ করলেই যাঁর
আল্লাহ খুশি হন
হযরত ঈসাও করবেন জানি
তাঁর অনুকরণ।।

তাঁরই নির্দেশিত পথে
যেনো জিহাদ করি
আল কোরআনের সমাজ গড়তে
জীবন দিয়ে লড়ি
থাক না আমার যতোই গুনাহ
হই যতো নগণ্য।।


www.nagorikpathagar.org

## সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলছে কেনো

সারা দুনিয়ায় আগুন জ্বলছে কেনো?
বর্বরতম জুলুম চলছে কেনো?
ঘরে ঘরে এতো কান্নার রোল কেনো?
দিকে দিকে এতো মিথ্যার গোল কেনো?
দেশে দেশে শুধু দস্যুর দল কেনো?
হায়নার হাতে সমস্ত বল কেনো?
আকাশে বাতাসে ধ্বংসের তোড় কেনো?
পানিতে-মাটিতে মৃত্যুর ঘোর কেনো?

সব প্রশ্নের উত্তর একটাই
মানুষের মাঝে
মানুষের কাজে
পরকাল ভীতি
কুরানের নীতি
নাই নাই নাই নাই।

মানুষে মানুষে এতো হিংস্রতা কেনো?
সারমেয়জাত এতো ভিন্নতা কেনো?
অসহায় নারী ধর্ষিতা হয় কেনো?
পশুর এসিড বর্ষিতা হয় কেনো?
যেনার দাপট বেড়েই যাচ্ছে কেনো?
অশ্লীলতার কোরাস গাচ্ছে কেনো?
পথে-ঘাটে খুনী কলিজা খাচ্ছে কেনো?
মানবতা এতো শাস্তি পাচ্ছে কেনো?

সব প্রশ্নের উত্তর একটাই
মানুষের মাঝে
মানুষের কাজে
পরকাল ভীতি
কুরআনের নীতি
নাই নাই নাই নাই।



www.nagorikpathagar.org

পাশবিকতার দিকে দিকে বান কেনো?
মানবিকতার মোটে নেই দাম কেনো?

বিশ্বপ্রেমের দিন শেষ হয় কেনো?
গণতন্ত্রের এতো পরাজয় কেনো?
মূল্যবোধের সূর্যটা ডোবে কেনো?
সুদ-ঘুষ-মদ পদস্থ হবে কেনো?
দুর্নীতিবাজ দম্ভ দেখাবে কেনো?
চোর-বাটপার রস্ত দেখাবে কেনো?

সব প্রশ্নের উত্তর একটাই
মানুষের মাঝে
মানুষের কাজে
পরকাল ভীতি
কুরআনের নীতি
নাই নাই নাই নাই।।

সারাটা দুনিয়া দোজখ হচ্ছে কেনো?
লেলিহান শিখা ঝাঁপিয়ে পড়ছে কেনো?
সাপ-বিচ্ছুর প্রকোপ বাড়ছে কেনো?
শ্বেত কবুতর আঙিনা ছাড়ছে কেনো?
সাগরের জলে বারুদ ঢালছে কেনো?
পিশাচের চাল মানুষে চালছে কেনো?
ভূতের রাজ্য ক্রমাগত বাড়ে কেনো?
পৃথিবী এখন ভাঙনের পাড়ে কেনো?

সব প্রশ্নের উত্তর একটাই
মানুষের মাঝে
মানুষের কাজে
পরকাল ভীতি
কুরআনের নীতি
নাই নাই নাই নাই।।



www.nagorikpathagar.org

# প্রতিদিন যতো পারো

প্রতিদিন যতো পারো
অগণিত ভালো কাজ করো মন ভরে
যতো পারো জগতের
একাধারে সকলের
অবারিত কল্যাণ করো পণ করে।।

যেমন জোছনা ঝরে পৃথিবীর সবখানে
কাছে-দূরে নির্বিশেষে
যেমন জোয়ার বহে যোগ-গুণ-ভাগ ফেলে
বাহু মেলে নিরুদ্দেশে
তুমিও তেমনি করে
শুভেচ্ছা বুকে ধরে
ছুটে যাও নিপীড়িত গাঁও-বন্দরে।।

প্রতিদিন যতো পারো
বিপদে-আপদে হও প্রিয় আশ্রয়
অভাবে ও অনটনে
ভুখা-নাঙ্গা জনে-জনে
বিলাও দুহাত ভরে সব সঞ্চয়।।

সৃষ্টির তরে যদি বিগলিত অন্তরে
দয়া করো দয়ার মতো
স্রষ্টার আরো মায়া পাবে তবে নিশ্চয়
আরো আরো করুণা যতো
দুখীদের আশেপাশে
দাঁড়ায় যে অনায়াসে-
মানবতা বাসা বাঁধে তার অন্তরে।।

[একটি মেথডিস্ট গান অবলম্বনে]



www.nagorikpathagar.org

# তুমি যারে চাও পেছনে ফেলতে

তুমি যারে চাও পেছনে ফেলতে
দলতে পায়ের তলায়
আল্লা'তা'লার অপার কৃপায়
আড়ালে আড়ালে হয়তো সে হায়
নিষ্ঠার সাথে শ্রেষ্ঠ ফসল ফলায়।।

তুমি যারে ভাবো অতি-নিচু-জন
ঘৃণায় দু'চোখ করো কুঞ্চন
ভেতরে ভেতরে অনেক বড় সে
মর্যাদাবান অধিকতর সে
অবুঝ কেবল নোংরা ছলায়-কলায়।।

ঈর্ষায় যারে সইতে পারো না
হিংসায় যার ধারও ধারো না
দূরে ছুঁড়ে মারো জঞ্জাল ভেবে
মাটি দিতে চাও কংকাল ভেবে
হয়তো সে সেরা প্রেমের এবং
প্রাণের শিল্পকলায়।।

কারোর জন্যে গর্ত খোঁড়ে যে
শেষ করবার শর্ত জোড়ে যে
মনে রেখো তার সেই গর্তেই
পড়তেই হয় বিনা শর্তেই-
কালের ছোবল বড় নির্মম
বড় দাম্ভিক দলায়।।



www.nagorikpathagar.org

# মিথ্যা বলা ছাড়লো না যে

মিথ্যা বলা ছাড়লো না যে
সত্য বলতে পারলো না যে
কি লাভ বলো রোজা রেখে তার
রোজাদারের মতো ভানটা করার।।

মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেলো- গীবত করে
যা-খুশি-তা করলো নিজেই দ্বি-মত করে
ভ্রান্তপথে পকালো যে
ইচ্ছা মতো ঠকালো যে
রোজাদারের দাবি করার তার
ভাই ওরে ভাই কি আছে দরকার।।

শুধু উপোস করার জন্য
নয়রে রোজার মাস
সকল গুণের চর্চা করার
জন্যে এ-মাস খাস্।

সকল গুণের চর্চা করতে চাইগো যদি-
কোরান-চর্চা করতে হবে নিরবধি;
রোজার সাথে সব-এবাদাত
করতে হবে আর এতায়াত
খুলবে তবেই পুণ্য-পথের দ্বার
পূর্ণ হবে রোজার দাবি নিত্য বারংবার।।



www.nagorikpathagar.org

# আল্লাহকে সত্যি ভালোবাসে যে

আল্লাহকে সত্যি ভালোবাসে যে
আল্লাহর দ্বীনকেও
সে আলোর ক্ষীণকেও
মনের গভীর থেকে ভালোবাসে সে।।

ভালোবাসে রাসূলের পবিত্র সুন্নাহ
সুন্নাহ মেনে নেয় তাঁর খাঁটি উম্মাহ
হোক না তা বিয়ে শাদি
অনুরোধ সাধাসাধি
মেনে নেয় তার সবই অনায়াসে।।

আল্লাহকে সত্যি ভালোবাসে যে
ভালোবাসে কোরআন
হাদীসের আহ্বান
জীবনের ঘানি টানে তটিনীর দেশে।

ভালোবাসে রাসূলের সংস্কৃতি
হোক না তা যুদ্ধ শান্তির নীতি
হোক না তা দেশ সেবা
লেনদেন নেওয়া দেওয়া
ত্যাগ কোরবানী করে হেসেই হেসে।।



www.nagorikpathagar.org

# মহাবোঝা

কাল-কেয়ামতে মহাবোঝা হবে
অবৈধ সম্পদ
ঘাড়ে ওঠানোর সে-হুকুম তুমি
কি করে করবে রদ।।

একটি পাহাড়, গিরি, পর্বত
লুট করে যদি থাকো
কি করে বইবে সে-পাহাড় তুমি
কতোটা শক্তি রাখো?
গিরি-পর্বত মাথায় তোলার
আছে নাকি হিম্মত।।

সুদ-ঘুষ-চুরি-ডাকাতি-তরাজ
কভু নয় ভালো কাজ
জেনে শুনে তবু করেই চলেছে
জ্ঞান-পাপী ধোঁকাবাজ;
এরা যে নিজেরা গড়েছে এদের
কলুষিত কিসমত।

হাতিয়ে নিয়েছো অন্যায়ভাবে
দুনিয়ায় যতো কিছু
এক কণা তার কখনো তোমার
ছাড়বে না হায় পিছু;
সময় থাকতে সাবধান হও
রসূলের উম্মত।।



www.nagorikpathagar.org

# সবার ভাগ্যে জোটে না

[কবি আফসার নিজামের জন্য]

দ্বীনের পথে চলা হায়রে সবার ভাগ্যে জোটে না
সব আকাশে হেসে হেসে
দীর্ঘ তিমির রাত্রি শেষে
সূর্য জানি ওঠে না।।

খোদার পথের পথিক যে জন সেইতো সবচে ভাগ্যবান
তারই প্রতি আল্লাতালা সবচে বেশি মেহেরবান
সব বাগানে গোলাপ কলি
পাগল করে ভ্রমর অলি
মুগ্ধ হয়ে ফোটে না।।

খোদার প্রেমে হয় না সবাই পাগল
সবাই ভাঙতে পারে না ভাই মিথ্যাবাদের আগল।

দ্বীনের পথের বীর মুজাহিদ হওয়া অতো সহজ নয়
খোদার পথে সব বিলানো মোমিন বলো ক'জন হয়
সব নদীতো স্রোতের টানে
পাগল হয়ে সাগর পানে
সারা জীবন ছোটে না।।



www.nagorikpathagar.org

# সুন্দর চোখ মুখের মানুষ

সুন্দর চোখ মুখের মানুষ
সুন্দর হাসি–খুশির মানুষ
অনেক–অনেক–অনেক তো পাওয়া যায়
কিন্তু কেন যে পাওয়া দুষ্কর
এবং সহজে আজ মেলা ভার
সুন্দর লেন–দেনের মানুষ হায়।।

কর্জ নেয়ার আগে যাকে খুব
মনে হয় সাধুজন
কর্জ দেয়ার পরে তাকে লোকে
বলে মহাশয়তান
টাকা পরিশোধ করার কথায়
আগুনের মত সে যে রেগে যায়
তার হাত থেকে দাতা–বেচারার
বাঁচা হলো দেখি দায়।।

সুন্দর কত কথার মানুষ
ছড়ানো চতুর্দিকে
অথচ কর্মে সততার লোক
কম মেলে পৃথিবীতে।

যার কাছে জমা রেখে আমানত
দ্বিধাহীন হয় মন
সেই অবশেষে করে খেয়ানত
বিশ্বাস ভঞ্জন
দাপটের সাথে চলাফেরা তার
ওয়াদার কোনো করে না কেয়ার
চোখের পর্দা ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে
তাকায় না ডানে বাঁয়।।



www.nagorikpathagar.org

# মিথ্যে কথা বলবো না

আর যাই হোক– মিথ্যে কথা বলবো না
অসৎ লোকের সঙ্গে মিশে
বোকার মত হারিয়ে দিশে
খারাপ পথে চলবো না।।

না বলে ভাই কারোর কিছু ধরবো না
বলা কওয়া ছাড়া কারোর কিছু পরবো না
এটা চেয়ে ওটা চেয়ে
ধমক খেয়ে গালি খেয়ে
দীন ভিখিরির মত আমি
না কিছুতেই মরব না।।

আর যাই হোক–হবো না ভাই অভদ্র
নিজের ঈমান বাঁচিয়ে রাখতে
থাকবো সদা সতর্ক
থাকবো সদা অতন্দ্র।

না আমি ভাই খারাপ কিছু পড়বো না
ভ্রান্ত লোকের মত আমি আমার জীবন গড়বো না
লোভে পড়ে মোহে পড়ে
সত্য হতে দূরে সরে
আবর্জনার মত আমি
অবহেলায় ঝরবো না।।



www.nagorikpathagar.org

# তোমার কথাই

তোমার কথাই ঠিক ইকবাল
তোমার কথাই ঠিক
কোরান ছেড়ে দেয়ার ফলেই
ধ্বংস চতুর্দিক।।

আহা! মানুষ এবং মানবতার শত্রু
আহা! মানুষ এবং মানবতার শত্রু চতুর্দিক।।

কোরান আঁকড়ে ধরেছিলো যারা
যারা ছিলো তারই অনুসারী
বিশ্বজগৎ জুড়ে ছিলো তারাই
নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব অধিকারী।

আল কোরআনের সমাজ ছাড়া সত্যিকারের সুখ
আসবে না ভাই কোনো কালে, যাবেও না দুখ
পাল্টাবে না জনগণের অবস্থা সার্বিক।।



www.nagorikpathagar.org

# বল ওরে বল বিজয় ওরে

বল ওরে বল বিজয় ওরে
কি দিয়েছিস তুই?
স্বাধীন রাখতে পারছি না তো
স্বাধীন দেশের ভূঁই।।

সুযোগ পেলেই দুর্গ গড়ে
দূর সীমানার চরে-চরে
এবং নদী রুদ্ধ করে
দেশ বানাতে ধূ-ধুই।।

বাণিজ্যে ধস নামায় নীতি
শিল্প নাশের করছে প্রীতি
আগ্রাসনে সু সংস্কৃতি
মার খায় যে শুধুই।।

সীমান্তে আজ জোয়ান মরে
কান্নার আওয়াজ ঘরে-ঘরে
আকাশ-বাতাস মাতম করে
দেখিস না নিতুই।।

বিজয় ওরে বিজয়ের তুই
মুক্তকণ্ঠ হ'
সেই সিরাজের বাংলা স্বাধীন
করার কথা ক'।

যুক্ত নয়রে মুক্ত করার
সত্যিকারের হ' রাহাবার
ঐক্যবদ্ধ এই জাতি সেই
স্বপ্নটারে ছুঁই।।



www.nagorikpathagar.org

# যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
ফাসাদকারীরা যত বলে যথাতথা।।

ছাগলে তো সবি খায়
যেখানে যখনি যায়
ধারে কাছে যেটা পায়
আগে সে আগাটা চায়
পরে সে তলাতে ধায়
ভ্যাঁভ্যাঁ করে তবু প্রায়
কেননা ছাগলে নেই
কোনো মায়া মমতা ও কোনো মানবতা।।

পাগলে তো বলে সব
তৎসব তৎভব
বোঝে না সে গর্দভ
কোনটা যে পরাভব
কোনটা যে উৎসব
করে শুধু কলরব
কেননা পাগলে নেই
কোনো মেধা মগজ আর বোধ বৈধতা।।

বানরেরও যে গলায়
মুক্তোর হার হায়
কভু নাহি না মানায়
কভু নাহি শোভা পায়
বরং তা ফেলে দেয়
লতাপাতা ভাবনায়
কেননা বানরে নেই
ইতরামি ছাড়া আর কোনো সরলতা।।



www.nagorikpathagar.org

# মূর্তি নিয়ে থাকবে

মূর্তি নিয়ে থাকবে বলে
ছবি নিয়ে আছে
এখন ছবি নিয়ে আছে
ওদের স্বরূপ আর ঢাকা নেই
বাংলাদেশের কাছে
ও ভাই জনগণের কাছে।।

ওদের হাতে মঙ্গল দীপ
বক্ষে ভারত মাতা;
বিসমিল্লাহ শুনলে ওদের
ঠিক থাকে না মাথা
ওদের নায়ের রশি বাঁধা
দিল্লীরই বটগাছে।।

ওদের শরীর থাক যেখানে
মগজ 'র'-এর হাতে;
তালে ওরা ঠিকই আছে
যদিও মাতাল জাতে
মিষ্টি রোলে ভোলায় ওরা
প্রাণে মারে পাছে।।

বাইরে ওরা ঐকমত্যে
ভেতরে একনায়ক;
কাজের বেলায় সব কিছু দল
কথায় তৃপ্তিদায়ক
নানান মুখোশ পরে ওরা
গদিই কেবল যাচে।।



www.nagorikpathagar.org

# আল্লা'র রাহে জেহাদ না করে

আল্লা'র রাহে জেহাদ না করে
আল্লা'র রাহে ধৈর্য না ধরে
জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয়;
জেহাদে এবং সবরে মূলত
বান্দার পরিচয়।।

ঈমানদারেরা জেহাদের পথে
খুঁজে খুঁজে ফেরে সার্বিক কল্যাণ;
খুঁজে খুঁজে ফেরে মাগফিরাতের
যথার্থ এক মোহনা মূল্যবান
দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় তারা
ভুলেও কখনো তাই তো করে না
এতটুকু অভিনয়।।

জেহাদের পথ ধরেই আসে যে অমর জীবন শহীদি জিন্দেগী;
জেহাদের পথ ধরেই আসলে নির্মল হয় সকল বন্দেগী।

জেহাদের পথ ছেড়ে দেয় যারা
ছেড়ে দেয় যারা সত্যের সংগ্রাম;
তাদের ধ্বংস নিশ্চিত–তারা
স্বেচ্ছায় পরে গোলামীর জিন্দান।
থাকে না তাদের স্বাধীনতা আর
রক্তের দামে কেনা স্বাধীকার
নেমে আসে পরাজয়।।

জেহাদী জাতির উন্নতি ওই দেখোনা দেখোনা দেখোনা দুচোখ খুলে;
অসীম সাহসে দিকে দিকে তারা দাঁড়ায় দীপ্ত উন্নত শির তুলে।

সবচেয়ে বড় মুক্তিযুদ্ধ
আল্লাহর পথে জানবাজি রেখে জেহাদ;
সব অন্যায় উৎখাতে সদা
আল্লা'র দ্বীন কায়েমের চেষ্টা বেহদ।
মুক্তিযুদ্ধ মানে মানুষের
গোলাম হবে না মানুষ যে ফের–
এ লড়াই নিশ্চয়।।


www.nagorikpathagar.org

# চারিদিকে সন্ত্রাস

চারিদিকে সন্ত্রাস, চারিদিকে খুনোখুনি
নিষ্ঠুর-নির্মম হত্যা!
আজ আর মানুষের
আজ আর জীবনের
নেই নেই কোনো নিরাপত্তা।।

ক্ষমতা যতোটা যার জালেম ততোটা সে-ই
এই হলো আজকের নিয়মই;
শহর-নগর-গাঁয় আগুন জ্বলছে তাই
শংকিত প্রত্যেক জীবনই।
শান্তির দিকে ওই
অশান্তি- থৈ-থৈ
বারুদের নদী সে প্রমত্তা।।

চারিদিকে রাহাজানি-হানাহানি-লুণ্ঠন
সীমাহীন পাশবতা-ধ্বংস
অকথ্য মিথ্যার, হিংসার উৎসব-
মানবতা হয় নির্বংশ!

সমাজের বুকে আজ পাথরের মতো হায়
চেপে বসে ভয়াবহ ব্যভিচার;
পুষ্পের মতো হায় পবিত্র শিশুরাও
পায় না তো কোনোভাবে নিস্তার।
এইভাবে বেশি দিন
প্রাণহীন জ্ঞানহীন-
টেকে না তো কোনো জাতিসত্তা।।



www.nagorikpathagar.org

## ঈদের গান

ঈদ এলো ভাই স্বার্থ ত্যাগের
অর্থ ত্যাগের ঈদ এলো;
নতুন দিনের নতুন আলোর
নয়ালী উমীদ এলো
ঈদ এলো দ্বীন বোঝার তরে
রোজার পরে ঈদ এলো।।

আমীর–ফকির এক জামাতে
সম্মিলিত হয়গো যাতে
নতুন করে সেই দাওয়াতে
জয্‌বা সকল হৃদ পেলো;
ঈদ এলো এক সঙ্গে চলার
খবর বলার ঈদ এলো।।

ঈদ এলো ভাই ভালোবাসার
নতুন আশার দিন
আজ হাতে হাত আজ কাঁধে কাঁধ
সকল মুসলিমীন।

সব দরবেশ সব মুজাহেদ
নেই ব্যবধান নেই ভেদাভেদ
ভুলতে সকল দ্বন্দ্ব ও খেদ
জড়তা ও নিদ গেলো
ঈদ এলো ভাই নও জামানার
নতুন ভাষার ঈদ এলো।।



www.nagorikpathagar.org

# এবার আমার ঈদটা যেন

এবার আমার ঈদটা যেন
আমার গাঁয়েই হয়
যে গাঁয়েতে বিশাল আকাশ
ছড়িয়ে জগৎময়
এবার আমার ঈদটা যেন
সেই গাঁয়েতেই হয়।।

যে-গাঁয়েতে মেঘ উড়ে যায়
পাখির ঝাঁকের মতো
পাখির ঝাঁকে মেঘরা হারায়
নিত্য অবিরত;
মিষ্টি হাওয়া গাছের সাথে
মনের কথা কয়।।

বাঁকের পরে বাঁক পেরিয়ে
যে-গাঁয়ের এক নদী-
দুইটি তীরের দু' হাত ধরে
বইছে নিরবধি
জোয়ার ভাটার দোদুল দোলায়
করছে দিগ্বিজয়।।

মাটির খাতার পাতায় পাতায়
ভরা সবুজ বই
পড়ছে যেথায় পাখ-পাখালি
বাঁধিয়ে হৈ চৈ;
মৌমাছিদের গান শুনে মন
যেথায় পড়ে রয়।।

নক্সী কাঁথার রূপ ধরে গো
জ্যোস্না ঝরে পড়ে
বাঁশ-সুপারীর বনে বনে
নীল জোনাকী ওড়ে;
ঝিঁঝির ডাকে নির্জনতা
রাত করে সঞ্চয়।।


www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়দের ভালোবাসা
নিবিড় মমতা;
মনের সাথে মনের বাঁধন
আছেরে যেথা–
যেথায় আছে কান্না হাসির
নিগূঢ় সমন্বয়।।

ছোট্ট বেলার বন্ধু-স্বজন–
দোস্ত–খেলার সাথী
দিন–রজনী প্রহর গোণে
প্রেমের আসন পাতি;
অশ্রু–চোখে চাইছে যারা
নিত্য আমার জয়।
এবার আমার ঈদটা যেন
তাদের সাথেই হয়।।

আমায় পেলে সব পেয়ে যায়
চায় না কিছুই আর
যাদের বুকের মধ্যে কেবল
স্নেহের পারাবার;
এই আমারই জন্যে যাদের
বিরহ নিশ্চয়।।

আমার স্বজন হোক না গরিব
আত্মীয়রা দুখী
তবু তারাই আমার আপন
আমার সুখে সুখী;
আমার ব্যথায় হয় ব্যথিত
জানি সুনিশ্চয়।।

এই শহরে যাদের মতন
কাউকে পেলাম না
যাদের মতন মানিক–রতন
কাউকে পেলাম না;
যাদের মতন আপন মানুষ
সত্যিতো কেউ নয়–
এবার আমার ঈদটা যেন
তাদের সাথেই হয়
হে করুণাময়।।


www.nagorikpathagar.org

# চারিদিকে আজ স্বার্থের হানাহানি

চারিদিকে আজ স্বার্থের হানাহানি
তবুও বন্ধু যেতে হবে বহু পথ;
দ্বিধাদ্বন্দ্বের সকল অন্ধকারে
ওড়াতে যে হবে আলোকের পারাবত।।

সত্যদীপ্ত চেতনার পাশাপাশি
হাতে হাত বেঁধে দাঁড়াও সকলে আসি
সব অন্যায় প্রতিহত করে
গড়ে তোল প্রিয় সোনালী ভবিষ্যত।।

নীতিবান ত্যাগী নেতা চেয়ে কাঁদে
মহাজনতার প্রাণ
যতোদিন যায় ততো শুধু বাড়ে
সৎ মানুষের দাম।

বিপর্যস্ত সময়ের কথা ভেবে
কে আছো সূর্য দুই হাতে তুলে নেবে
সব শঠতার মূল কেটে কেটে
রচনা করবে পবিত্র সৈকত।।



www.nagorikpathagar.org

## মোরতাদ অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়

পৃথিবীর শান্তি
জীবনের স্বস্তি
চিরদিন করে শুধু বরবাদ
মোরতাদ মোরতাদ মোরতাদ।।

আল্লাহর শত্রুরা তারে লুফে নেয়
তারে দিয়ে কুফরীর জীবাণু ছড়ায়
তারে দিয়ে ডেকে আনে
ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে
বিপদ–বিপদ।।

মোরতাদ অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়
ইবলিস মূলতই তার পরিচয়
জেনে শুনে বয়ে ফেরে
মহামারী মড়ক ও
ধ্বংস–বিষাদ।।



www.nagorikpathagar.org

# গদীর লোভীরা দেখ সারাদেশ জুড়ে

গদীর লোভীরা দেখ, সারাদেশ জুড়ে আজ
রক্তের ক্রূর খেলা খেলছে
মীর জাফরের মতো, ষড়যন্ত্রের শত
বিষমাখা ঘেরাটোপ ফেলছে।।

ওরা চায় বিভেদে-বিভেদে আর
দ্বন্দ্বে সারা দেশ ছেয়ে যাক
বেঘোরে নিহত হোক তারপরঃ সাদা সাদা
পায়রারা ডানা যতো মেলছে।।

গদীর সাধুরা আজ কত তাড়াতাড়ি দেখো
ভুলে গেলো অতীতের কাহিনী
কতো তাড়াতাড়ি হলো রক্ষক ভক্ষক
গণতন্ত্রের খুনী-বাহিনী!

ওরা চায় ঘরে ঘরে প্রতি ঘরে
যুদ্ধ লাগুক, গৃহযুদ্ধ লাগুক
লাশে লাশে ভরে যাক
চারিদিক ভরে যাক
নামুক শকুন, ফাঁকে ফাঁকে শকুন নামুক
বন্ধুর বেশে ওরা জনতার দুশমন
আগুনের শিখা নিয়ে খেলছে।।



www.nagorikpathagar.org

# যখন দেশের সিংহাসনে

যখন দেশের সিংহাসনে
সবচে' বড় মিথ্যা দু'পা দোলায়
যখন অল্পবিদ্যা জ্ঞানের
তকমা নিয়ে নিত্য দু'গাল ফোলায়।।

যখন পুতুল নাচতে থাকে
মীরজাফরের নিত্য নতুন বোধে
যখন 'ম্যাড়া খুঁটির বলে'
অষ্ট প্রহর ফাল মারে আর কোদে।।

তখন বিজয় কাঁদে
সকল কালের সকল যুগের
অন্ধকারের অন্ধ অবসাদে।।

যখন গদি রাস্তাঘাটে
অপর পক্ষ নির্বিচারে পিটায়
যখন ঘুঘু চরায় প্রভু
বিধি-বৈধ বিরোধীদের ভিটায়।

যখন অধিকারের নামে
নেয় কেড়ে সব বাঁচার অধিকারও
যখন গণতন্ত্র থেকে
জন্মে জালেম–খুনী–স্বৈরাচারও–

তখন বিজয় কাঁদে
রক্তচোখের দুঃশাসনের
হাজার অন্যায়, অপরাধে।।

যখন হত্যা-ধর্ষণে দেশ
শিশুর মতন নিত্য ভয়ে কাঁপে
যখন অশেষ সন্ত্রাসে দেশ
হারায় সাহস নিত্য ধাপে ধাপে


www.nagorikpathagar.org

যখন মানুষ পায় না বিচার
শীর্ষদেশের অবৈধ উৎপাতে
যখন অশ্লীলতার জোয়ার
উৎসব হয়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাতে

তখন বিজয় কাঁদে
দুঃখিনী এই জন্মভূমি–
বাংলাদেশের সকল জনপদে।।



www.nagorikpathagar.org

## চেচনিয়া চেচনিয়া

আল্লা'র রাহে জেহাদের নাম
চেচনিয়া চেচনিয়া;
সত্যের রাহে সাহসের দাম
শহীদের ধাম, গতি অবিরাম
চেচনিয়া চেচনিয়া।।

চেচনিয়া উজ্জ্বল বরাভয়
ঈমানের দুর্লভ সঞ্চয়
চেচনিয়া বিশ্বের বিস্ময়
দুরন্ত–দুর্দম নিশ্চয়
চেচনিয়া উদ্ধত যৌবন
স্বাধীনতা–সংগ্রাম প্রাণপণ
চেচনিয়া ধৈর্যের মৌবন
কোরবানী–ত্যাগে মহা আলোড়ন–
তাই
চেচনিয়া যেন বদরের মাঠে ঘোরতর সেই
লড়াইয়ে লিপ্ত শহীদের লাল বেশ্ নিয়া।।

চেচনিয়া শহীদের সাম্পান
আলোকিত জীবনের সম্মান
চেচনিয়া উদাত্ত আহবান;
'কোরানের পথে হও আগোয়ান'।
চেচনিয়া তাগুতের উদ্বেগ–
অনাগত ঝঞ্ঝার কালো মেঘ।
চেচনিয়া খালিদের খরতেগ
ইসলামী উম্মা'র গতিবেগ–
তাই
চেচনিয়া যেন গ্রোজনিতে আজ মেতেছে যুদ্ধ–
যুদ্ধ খেলাতে রাশিয়ার ভেড়া–মেষ নিয়া।।

চেচনিয়া উৎসাহ অনিশেষ
অবিরাম উদ্যম সবিশেষ


www.nagorikpathagar.org

চেচনিয়া মুক্তির নির্দেশ
সমস্ত যোদ্ধার নিজদেশ
চেচনিয়া প্রেরণার মনজিল
অবিরত জাগ্রত মনদিল
চেচনিয়া সাফল্য স্বপ্নীল
বিজয়ের রঙে রঙে ঝিলমিল্–
তাই
চেচনিয়া যেনো দাঁড়িয়ে রয়েছে সারা বিশ্বের
বিপ্লবী পরিবেশ নিয়া।।



www.nagorikpathagar.org

# কাশ্মীরে যত ফেলে থাবা হায়নারা

কাশ্মীরে যতো ফেলে থাবা হায়নারা
যতো বাড়ে জুলুমের বিস্তার
ঠিক ততো কাছে আসে মুক্তির দিন
কাছে আসে কাঙ্ক্ষিত নিস্তার।।

কাশ্মীর কাশ্মরী জনতার
নেই তাতে কারো কোনো অধিকার
ভারতীয় দস্যুরা তবু কাশ্মীরে
চালায় শাসন খুন-গণহত্যার।।

জুলুম- শোষণ যত বাড়ে কাশ্মীরে
বাড়ে যত অন্যায়-অবিচার
স্বাধীনতাকামীদের তত নামে ঢল
ঢল নামে নির্ভীক জনতার।।
কাশ্মীরে আজ সব মুজাহিদ-
দু'চোখে তাদের দেখো নেই নিদ
জানবাজি রেখে তারা যাচ্ছে লড়েই
চরম লক্ষ্য শুধু শত্রু সাবাড়।।

কাশ্মীরে মা-বোনের ইজ্জত লুট
করে শুধু ভারতীয় তস্কর
বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-শিশু পায় না রেহাই-
এমন পশুর মত লস্কর।

কাশ্মীরে শহীদের ঈদগায়
কবরের সমাবেশ বেড়ে যায়
হাহাকার সব বুকে সব চোখে পানি
ঝিলাম অথৈ নদী অশ্রুধারার।।


www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর স্বর্গটা দিনে দিনে যারা
প্রকৃতি–মানুষ–মাটি সনদসহ
গোপনে গোপনে করে কূটকৌশলে
নরক–অনলসম ভয়াবহ!

খুব বেশি দিন তাই নেইতো তাদের
নোংরা দু'হাত আধিপত্যের
আস্ত তো রাখবে না বীর জঙ্গীরা–
টুকরো–টুকরো করে মহাকারাগার।।



www.nagorikpathagar.org

# কাল দিয়েছো বেরুবাড়ি

কাল দিয়েছো বেরুবাড়ি
আজ যদি দাও গোটা দেশ
অবাক হবার নেইতো কিছু—
দালালীর কি আছে শেষ।।

ট্রানজিটও দাও বিদ্যুৎও দাও
সব দিয়ে দাও সাধু
দেবার যখন ইচ্ছে তখন
ইজ্জতও দাও দাদু
গাধার পেটে জন্মটা নিক
খচ্চরই শেষ মেষ।।

তিলক মেখে জাত দিয়েছো
তাই যদি দাও জাতি
আশ্চর্যের আর কি আছে তায়
খাস ঘষেটির জ্ঞাতি।

দাও দিয়ে দাও ব্যবসাপাতি
মিত্রদেশের হাতে
কারখানা-কল-বাজার ঘাটও
কৃতজ্ঞতার সাথে।

পূর্বে দিছো নদ-নদী আর
এখন দিলে পাহাড়
দেবে না ক্যান? সবই দেবে
সব তো তোমার বাবার
স্বাধীনতা না-দিয়ে কি
খুলবে ছদ্মবেশ।।



www.nagorikpathagar.org

# আফগান

আফগান কোরবান হয় দেখো
আল্লাহর দ্বীনের পথে-
কোরানের আলোকিত হিসেব মতে।।

পশ্চিম বহুদিন ফাটল ধরাতে তার ঐক্যে
হানা দিলো বারবার সর্বনাশের হীন লক্ষ্যে
তারপর ঘোরতর বিভেদের বীজ বুনে
ভেবেছিলো একেবারে কেল্লা ফতে!

শেষ হয় ইদানিং অযাচিত মতপার্থক্য
দিন যত যায় তত ফিরে আসে নিজেদের সখ্য
সাবধান আফগান ঢালে আজ উপশম
অনুভূতি নিয়ে সব পুরনো ক্ষতে।

বিশ্বের বিপ্লব তার কাছ থেকে নেয় শিক্ষা
তার কাছ থেকে নেয় ইসলামী জেহাদের দীক্ষা
সাহসের উপমায় আফগান অনুপম-
তুলনাবিহীন তারা রক্ত দিতে।।



www.nagorikpathagar.org

# বাংলাদেশের মদিনায় ঐ দেখো

বাংলাদেশের মদিনায় ঐ দেখো
সাগরপাড়ের চট্টলায় ঐ দেখো
হাতে হাত রেখে জনতা এগিয়ে যায়–
নবজীবনের বিপ্লবী ইশারায়।।

স্বৈরাচারের মসনদ আজ কেঁপে ওঠে থরথর
পিছু হটে তাই রক্তখাদক হায়না ভয়ংকর!
ষড়যন্ত্রের কালো হাত ভেঙে
মজলুমানেরা ওঠে ওই জেগে
ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনায়।।

বাংলাদেশের মদীনায় ঐ অতন্দ্র সান্ত্রীরা
দেয় যে পাহারা স্বদেশের মাটি
ঈমানের তেজে ওরা।

সাহসের ঢেউ সাগরের পাড়ে গর্জে উঠেছে আজ
বার আউলিয়া উড়ায়েছে নীলে দুরন্ত শাহবাজ
রজব আলীরা দলে দলে চলে
সামনের সব বাধা দলে দলে–
চরম লক্ষ্য, চূড়ান্ত জিগীসায়।।



www.nagorikpathagar.org

# পুলসিরাতের সাথী তিনি

পুলসিরাতের সাথী তিনি
নাম মুহাম্মদ সাল্লে আলা
আমার প্রিয় হযরত মুহাম্মদ
শাহে মদীনা কামলিওয়ালা
সাইয়্যেদে আলম মুহাম্মদ
নূরে নূরে নূরে আলা।।

মদিনার ঐ গুল বাগিচায়
ডাকলো যে কোন বুলবুলি
আর তন্দ্রা থেকে উঠলো জেগে
সারা জাহান চোখ মেলি
উঠলো গেয়ে সুর মিলিয়ে
লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহ।।

তার সে পথের সোনার রেখায়
ফেরদাউসেরই স্বপ্ন আঁকা
আর তার সে সবুজ চারণভূমি
জিন্দেগানীর ফুল বীথিকা
আমার নেতা তোমার নেতা
বিশ্বনবী মুস্তফা।।



www.nagorikpathagar.org

## দু'টি নয়ন মুদিলে

দু-টি নয়ন মুদিলে হায় দেখবি সবই ভুল
দু-টি চক্ষু বুজিলে হায় শুধুই শর্ষে ফুল
টয়োটা গাড়ি
সাধের বনানীর বাড়ি
এইসব নিয়ে যতোই তুমি থাকো না মশগুল।।

বুঝলি না তুই বাঁধলি কোথায় ঘর
চোখ-ধাঁধানো এ যে হায়রে শুধুই বালুচর
এই বালুচরে ফুটবে না হায়
প্রেমের গোলাপ ফুল।
টাংগাইল শাড়ী
প্রেমের সুন্দরী নারী
এইসব নিয়ে যতই
মত্ত থাকো না বিলকুল।।

বাসলি ভালো সর্বনাশা ঝড়
যে-ঝড়ে তোর ভাঙবে হায়রে সাধের, খেলাঘর
শূন্যের ওপর মিলবে নারে
জীবন নদীর কূল।

টাকার কাড়ি—লন্ডন-আমেরিকা-পাড়ি
ভুল বেসাতি করলি বারেবার
খুঁজলি না তুই কাবার সেই বাজার
সেই বাজারে যাবার জন্যে
চড়লি না দুলদুল।।



www.nagorikpathagar.org

# ভুলে ভুল করা

ভুলে ভুল করা, বুঝে ভুল করা
এক নয় কোনোদিন
জেনে শুনে যারা করে অপরাধ
নিঃসন্দেহে তারা সমাজের চির
শত্রু তুলনাহীন।।

ভালো লোক সে হে যতো ভালো হোক
যতো দাম তারে দিক শত লোক
ভেতরে ভেতরে সেই লোক যদি
সহায়তা দেয় অন্যায় কাজে
তার তো থাকে না দ্বীন।।

আগ্রহ নিয়ে পাপ কাজ করে পরকালে উদাসীন
তাওবার কথা করে না স্মরণ এতোই চেতনাহীন!

খারাপ লোকেরা খারাপের মাঝে
খুঁজে ফেরে যতো আনন্দ বাজে
ইচ্ছে করেই ঐ পরিবেশে
মানিয়ে নেয় যে পুরোই নিজেকে
তার আশা বড় ক্ষীণ।।



www.nagorikpathagar.org

# কঠিন হৃদয়

কঠিন হৃদয় সবকিছু করে
কঠিন থেকেও কঠিন
বাড়াতে পারে সে জটিলতা শুধু-
অযথা প্রতিটি দিন।।

তার জেদ তারে করে তোলে দাম্ভিক
চায় সে কেবলি সকলেই দাম দিক
সকলেই তার গোলামী করুক
নিত্য শর্তহীন।।

বোঝে না বিনয় কোনো ভদ্রতা
সভ্যতা ভব্যতা
বোঝে সে শুধুই ক্ষমতা এবং
ক্ষমতার বন্যতা।

কঠিন হৃদয় দেখে না নিজের ভুল
অন্যের ভুলে লাগায় হুলুস্থুল
ক্ষমার বদলে কুঠার চালায়-
আইনের সংগীন।।



www.nagorikpathagar.org

# এই মহা পৃথিবীর পাত্র থেকে

এই মহা পৃথিবীর পাত্র থেকে
নিয়েছি অনেক কিছু এতো দিন
পেয়েছি অনেক পাওয়া সীমাহীন
এইবার দিতে হবে আরো বেশী কিছু
সোনাঝরা স্বপ্ন মেখে।।

হাত পাতা স্বভাবের মানুষ যতো
কিছুই পারে না দিতে নিশ্চয়ই
ভিখারীর জোটে শুধু ঘৃণা অবহেলা
লাঞ্ছনা পদাঘাত নিত্যই
মর্যাদাবোধহীন সত্তার
বাসনা জাগে না উঠে দাঁড়াবার
বিবেক পাচার করে শত্রুর সীমানায়
পাথরের চাদর ঢেকে।।

জ্ঞানে গুণে এইবার দিতেই হবে
নয়ালী যুগের ঠিকানা
নতুন পথের নিশানা
এবার চলতে হবে সকল চলায়
অগ্রপথিক হয়ে সবে।

যার যার আয়তনে হই না এসো
সবচেয়ে গতিশীল শক্তি
সবচেয়ে উদ্যমী কর্মঠ জন
সৃষ্টিতে যার অনুরক্তি
যার যার রক্তিম মোহনায়
মুক্তির অসহ সে বেদনায়
গড়বার সংগ্রাম করি আরো সংহত
ভাঙবার দর্শন সচল রেখে।।



www.nagorikpathagar.org

# আসলো একুশ আসবে একুশ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের তৃতীয় শিশুতোষ ছড়ার বই 'আসলো একুশ আসবে একুশ'। প্রচ্ছদ ও ইলাস্ট্রেশন করেছেন শিল্পী ফরিদী নুমান। বইটি প্রকাশ পেয়েছে ২০২২ সালের একুশে বইমেলায়। বইটি প্রকাশ করে 'দেশজ প্রকাশন'। স্বত্ব সাবিনা মল্লিক। ক্রাউন সাইজের চার রঙা প্রিন্টিং-এ ৩৪ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য রাখা হয়েছে দুইশত টাকা। এই বইটিতে কবির মোট ২০টি ছড়া স্থান পেয়েছে।

বইটিতে প্রকাশকের কথায় দেশজ প্রকাশনের প্রকাশক মনোয়ারুল ইসলাম যে অভিব্যক্তি পেশ করেছেন তার কিংয়দাংশ তুলে ধরা হলো- 'কবির মৃত্যুর এক যুগ পরে বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত। মুখে মুখে ছড়া কেটে শিশুদের সাথে বন্ধুতা তৈরি কবির স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিলো। এই গ্রন্থে সেই সব হারানো মণি-মাণিক্যের কিছুটা সন্নিবেশিত করা সম্ভব হয়েছে। শিশু-কিশোরদের সুমিষ্ট বুলি এবং বচনের দিকেও ছিল কবির সজাগ দৃষ্টি। ছড়াগুলো কোমল শব্দের গাঁথুনিতে শরৎ মেঘের পেলবতা পেয়েছে।'

www.nagorikpathagar.org

# সূচিপত্র

টমটম চড়ে ঝমঝম করে/ ২০১
শরতের আকাশে/ ২০২
একুশ মানে/ ২০৪
মন দিয়ে লেখাপড়া মন দিয়ে খেলা/ ২০৫
ঝড় এলো যেই উড়লো ধূলোবালি/ ২০৬
বই-কে তুমি বন্ধু করো/ ২০৭
পড় এবং পড়/ ২০৮
রুটিন/ ২০৯
সালাম ও শুভেচ্ছা/ ২১০
পাপা–বাবা ভাল্লাগে না/ ২১১
সেই মেয়েটি/ ২১২
মুন্না/ ২১৪
রূপা/ ২১৫
ঈদের দিনে/ ২১৬
উপজেলা/ ২১৮
ঝড়/ ২১৯
আমার শপথ/ ২২০
বড় হতে চাও যদি গো/ ২২২
বাংলা ভাষার নাম/ ২২৩
তুমুল সূর্য/ ২২৪

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

## টমটম চড়ে ঝমঝম করে

টমটম চড়ে ঝমঝম করে
বৃষ্টি আসে গো বৃষ্টি আসে গো
কোন অজানায় কোন অচেনায়
দৃষ্টি ভাসে গো ॥

মন ভরে যায় প্রাণ ভরে যায়
জুড়ায় রে অন্তর
গীতল হাওয়ার শীতল ছোঁয়ায়
জড়ায় রে ঘরদোর
উজ্জ্বলতায় উচ্ছলতায়
সৃষ্টি হাসে গো ॥

আজ বুঝি নেই পাখির কণ্ঠ–
হাজার হাজার তবু
গানের কণ্ঠ দান করেছেন
রাব্বুল আলম প্রভু
শ্রাবণ নামের গল্প গানের
মিষ্টি মাসে গো ॥

ঝর–ঝর–ঝরে পথ–ঘাট ভরে
আনন্দেরই ধারা
দূরের আকাশ কাছের বাতাস
সবখানে সেই সাড়া
স্বপ্নিল হেন সুন্দর যেন
কৃষ্টি পাশে গো ॥



www.nagorikpathagar.org

## শরতের আকাশে

সাদা-সাদা মেঘ ভাসে
শরতের আকাশে
সাদা-সাদা রাজহাঁস
ওড়ে যেন বাতাসে
নদী কূলে কাশফুল
কী নরম তুল-তুল
মাঠ-ঘাট জুড়ে ঢালে
জোছনার রাকা সে।

কাক্ চোখ-পানি-ভরা
নির্মল খালবিল
সাদা-সাদা বক তার
বুকে ওড়ে পিলপিল
মাছরাঙা মারে ছোঁ
ভোদোড়েরা দেয় ভোঁ
সাদা রোদ হেসে ওঠে
আনন্দে খিলখিল।

সাদা সাদা তারকার
সাদা সাদা আলো-রে
ধরা পড়ে সাদা সাদা
আকাশের ঝালরে
সারারাত জাল বোনে
শেফালীরা কাল গোনে
ভরে যায় অন্তরঃ
কি যে লাগে ভালো–রে।



www.nagorikpathagar.org

স্বপ্নরা খেলা করে
মনোহরা খামারে
চলার নেশায় ধরে
তোরে নাকি আমারে
চারিদিকে সুমধুর–
অবিরাম বাজে সুর
কার মায়া-মমতায়
মাথাটারে ঘামারে।



www.nagorikpathagar.org

# একুশ মানে

আসলো একুশ, আসবে একুশ
হায়! তবু কি আসবে না হুঁশ!

একুশ মানে তীক্ষ্ণ আগুন
রক্তপুষ্প ফোটার ফাগুন।

পুষ্প পাতা ঝরার আগে
শেকড়শুদ্ধ মরার আগে

জাগুন জাগুন সবাই জাগুন
একুশ মানে তীব্র আগুন!



www.nagorikpathagar.org

# মন দিয়ে লেখাপড়া মন দিয়ে খেলা

মন দিয়ে লেখাপড়া মন দিয়ে খেলা
সব কাজে মন দিতে করো নাকো হেলা।।

তার মানে চোখ দিয়ে ভালোভাবে দেখা
তার মানে সব কাজে কান খাড়া রাখা
মোটকথা কাজ মাঝে ডুবে থাকা চাই
তা না হলে কাজ হয়
অকাজের মেলা।।

যখন যে কাজ করো বেঁধো মনটাকে
লাগাম লাগিয়ে রেখো চঞ্চলতাকে
অহেতুক তাড়াতাড়ি কাজে হয় ক্ষতি
তার চেয়ে বড় হয়
অহেতুক খেলা।।



www.nagorikpathagar.org

# ঝড় এলো যেই উড়লো ধূলোবালি

ঝড় এলো যেই উড়লো ধূলোবালি
পাতায় পাতায় লাগলো যে হাততালি।।

বজ্র তখন গর্জে ওঠে
গড়গড়িয়ে ব্যাঘ্র ছোটে
মড়াৎ মড়াৎ ভাঙলো হঠাৎ
নানান গাছ-গাছালি।।

ঝড় এলো যেই আজান দিলেন দাদু
আজান যেন জান্নাতি এক যাদু

ঝড় এলো যেই পড়লো হুড়োহুড়ি
পণ্ড খেলার আসর ঘুরোঘুরি।

বৃষ্টি এলো ঝাপ্‌টা মেরে
ষাড়ের মত বেজায় তেড়ে
ভয়ের চোটে বাগান ছেড়ে
পালিয়ে গেলো মালি।।



www.nagorikpathagar.org

# বইকে তুমি বন্ধু করো

বইকে তুমি বন্ধু করো
জ্ঞানকে করো সাথী
সবার আগে বাঁচবে তুমি
বাঁচবে তোমার জাতি।

ঠকাবে না বই তোমাকে
উঠলে জেগে জ্ঞানের ডাকে
সকল দুয়ার খুলবে তোমার
ঘুচবে আঁধার-রাতি।।

বইয়ের মাঝে লুকিয়ে আছে
বেহেশত যাবার পথ
জ্ঞান আর আমল এক করে সে ই-
যার আছে হিম্মত।

আল্লা' সবচে' বড় জ্ঞানী
কোরো না তার নাফরমানী
কোরান সেরা পূত কেতাব
নাও গো বক্ষ পাতি।।



www.nagorikpathagar.org

## পড় এবং পড়

ক–খ–গ–ঘ–ঙ
পড় এবং পড়
ভালোর জন্য পড়
যে পড়ে সে বড়।।

কোরআন শোনায় পড়
হাদীস জানায় পড়
পড় এবং পড়।।

লেখার জন্য পড়
শেখার জন্য পড়
পড়েই জীবন গড়ো।।



www.nagorikpathagar.org

## রুটিন

সকালবেলায় কম্পিউটার
সন্ধ্যাবেলায় টিভি
পরীক্ষাতে নিশ্চয় তুই
এবার ডাব্বা দিবি।।

ডাব্বা দিলে আব্বা পাবেন ব্যথা
তবু কেনো ঘামাসনা তুই মাথা
সারাদিন্-রাত থাকিস নিয়ে
শুধুই হিবিজিবি।।

পড়ার সময় পড়বিরে তুই
খেলবি খেলার সময়
এই রকমই কথা ছিলো
অন্য রকম তো নয়।

অনেক বড় হতেই হবে বাপ্রে
লেখাপড়ায় তাই পাবিনা মাপ্রে
কোন সময়ে কি করবি তার
রুটিন করে নিবি।।



www.nagorikpathagar.org

## সালাম ও শুভেচ্ছা

তোমরা যারা ছোট্ট তনু
খোদার রাহে কাজ করো
জীবন-খাতার পাতায় পাতায়
ন্যায়ের কারুকাজ করো
তারা আমার নাও আদর
নাও মমতা সাত সাগর।

সময় মত ইশকুলে যাও
মন লাগিয়ে পাঠ শোনো
জানার কিছু থাকলে তখন
ঠিকই করো আর্‌জ কোনো
তারা আমার লও সালাম
খাস্‌ দোয়াও লও তামাম।

বিপদ-বাধা ভয় করো না
বীরের মত পথ চলো
সত্য কথা যা বলিবার
যারা তা আল্‌বৎ বলো
তারা আমার শুভেচ্ছা নাও
পান্না পাখার শুভেচ্ছা নাও।

কোরান পড়ো হাদীস পড়ো
ইসলামী সব বই পড়ো
পাল্লা দিয়ে সাদাকা দাও
দীন দুখীদের হাত ধরো
তারা আমার নাও আশীষ
অঝোর ধারার নাও আশীষ।



www.nagorikpathagar.org

লেখার-পড়ায় ব্যস্ত থাকো
নিয়মিত ব্যাম করো
আব্বা-মায়ের সেবা করো
আর মুরব্বী জ্ঞান করো
তারা আমার লও সালাম
লও শুভেচ্ছা কুল্-কালাম।

তোমরা যারা ছোট্ট তনু
সত্যি ভালো সবচেয়ে
এই সমাজে ছড়াও বেশী
সত্যের আলো সবচেয়ে
তারা আমার নাও আদর
নাও গো স্নেহ সাত সাগর।



www.nagorikpathagar.org

# পাপা–বাবা ভাল্লাগে না

পাপা–বাবা ভাল্লাগে না
আব্বু ভালোই লাগে,
মাম্ না বলে আম্মু বললে
মনের আবেগ জাগে।।

দাদার চেয়ে ভাইয়া ভালো
দিদির চেয়ে আপু;
আঙ্কেল নয় চাচাই দারুণ,
আন্টি থেকে ফুফু;
লক্ষ্মী বলে করলে আদর
গা জ্বলে যায় রাগে।।

মাংস ও জল সে–ই বলুক
যা বলে তার সংস্কৃতি,
আমি কেন করবো আমার
সংস্কৃতিরও–বিকৃতি।

যে–সব শব্দ দেয় ঢেকে দেয়
আমার পরিচিতি
মূল্যবোধের মূল কেটে দেয়
হটায় নিয়ম–নীতি
সে–সব শব্দ খারিজ করি
আমিই সবার আগে।।



www.nagorikpathagar.org

# সেই মেয়েটি

সেই মেয়েটির নাম
জুম্মি নাহাদিয়া
সবাইকে সে ভুলিয়ে রাখে
মিষ্টি হাসি দিয়া।



www.nagorikpathagar.org

# মুন্না

ঘুম পড়ে, ঘুম পড়ে
মুন্না ঘুম পড়ে-
ঘুম পড়ার আগে মুন্না
একটু নড়ে চড়ে



www.nagorikpathagar.org

## রূপা

আমাদের রূপা
দিনে বাঁধে খোঁপা
রাতে খোলে চুল
করে শুধু ভুল



www.nagorikpathagar.org

# ঈদের দিনে

ক.
ঈদের দিনে ভোর বেলাতে
নিঁদ না হে,
একটু সকাল-সকালে চল
ঈদ্‌গাহে।

আজকে তুমি আদৌ কারো
বৈরী নও,
পাল্লা দিয়ে সবার আগে
তৈরি হও-

সবাই মিলে ঈদগাহে যাও
এক সাথে,
আর তুলে নাও ভালোবাসার
হাত হাতে।

খ.
ঈদের দিনে যাও ভুলে যাও
কে শরীফ-
কে যে ফকির এই দিনে নয়-
নয় জরীপ।

বরং কোথায় এতিম আছে
সেই খবর
নাও; বিধবার তত্ত্ব-তালাশ
অতঃপর।

কে মুসাফির-নিঃস্ব-পথিক
কে মিসকীন-
পূরণ করে তার দাবীও
হও মোমিন।



www.nagorikpathagar.org

গ.

ঈদের দিনে গরিব-দুখীর
খোঁজ নিও
ঈদের পরও তাদের খবর
রোজ নিও।

এমনি করে একটা ঈদের
কাছ থেকে
শিক্ষা নিলে তুমিই না হয়
আজ থেকে।

তবেই হবে উজ্জ্বল অতি
দিনগুলো
ঈদের মতো তোমার প্রতি
দিনগুলো।



www.nagorikpathagar.org

## উপজেলা

একটু শহর আর
চারপাশে গ্রাম
উপজেলা নাম তার
উপজেলা নাম।



www.nagorikpathagar.org

## ঝড়

ঝড়ের ভয়ে পালিয়ে মরে খড়কুটো;
ঘরমুখো হয় বেজায় ত্যাদোড় ঘরছুটও।
ঝড়ের কাছে কাচুমাচু গাছপালা,
সন্ধ্যা নামার আগেই নামে হাঁপ্পালা।

ঝড়ের ঠেলায় উথাল–পাথাল নাও-নদী,
পারবে নাকো কোথাও যেতে চাও যদি।
বজ্রপাতের সম্ভাবনা এক-শ’-ভাগ,
কারোর খাতির করবে না, তার এমন রাগ।

ঝড় তবু খুব পেয়ার করে আচ্ছা ঢের
টক্-মিঠা সব আম পেড়ে দেয় বাচ্চাদের।



www.nagorikpathagar.org

## আমার শপথ

আমি হবো ভদ্র ছেলে
সত্যিকারের বিনয়ী
ক্ষোভের সময় শান্ত সুবোধ
প্রচণ্ড রাগ-বিজয়ী।

আমার কাছে যে কেউ আসুক
করবো তাকে যত্ন ভাই
ভাববো তাকে মহান মানুষ
অমূল্য এক রত্ন ভাই।

সবার আগে সালাম দেবো
হোক না সে লোক ভিখারী
ন্যায়ের পথের পথিক হবো
রসূল যে- মোর দিশারী।

আত্মীয় সে হোক না গরিব
হোক্ না গায়ের সাধারণ
অনেক কাছে টানবো তাকে
সে ই তো আমার আপনজন।

অলসতার সঙ্গে হবে
আমার চির শত্রুতা
গড়বো ভালো কাজের সাথে
চিরকালের মিত্রতা।

কাজটা আমার করবো আমি
হোক তা ধোয়া কাপড়টা
তুলতে কমল ফুটুক কাঁটা
লাগুক গায়ে আঁচড়টা।



www.nagorikpathagar.org

যা কিছু মোর সবকিছু তার
রাখবো আমি সাজিয়ে
নোংরা মোটেই করবো না ঘর
জঞ্জাল ও যা-তা দিয়ে।

খোদার ভয়ে কাঁপবো আমি
করবো না ভয় অন্যকে
সব চে' ভালো বাসবো আমি
দ্বীনের পথের সৈচোগল্‌খুরী নিন্দা-গীবত
মনের ভুলেও করবো না
কথায়-কথায় সবার ত্রুটি
বিচ্যুতি-ভুল ধরবো না ।

কেউ যখনি ডাকবে আমায়
বিশেষ করে আব্বা-মা
সঙ্গে-সঙ্গে শুনবো সে-ডাক
ঠায়-দাঁড়িয়ে থাকবো না।

ভয় ভীতিতে শঙ্কিত নও
তোমরা হবে বিজয়ী
কেবল যদি বিশ্বাসী হও
সত্যিকারের প্রত্যয়ী।

দুঃখ জয়ের শিখবো নিয়ম
জীবনযুদ্ধে হারবো না
করবো করণীয় সবই
একটিও তার ছাড়বো না।

ঝগড়া বিবাদ করবো না ভাই
ঘা দেবো না আর কাঁচে
কিছু মানুষ এমন আছে
নিত্য মরে আর বাঁচে।



www.nagorikpathagar.org

# বড় হতে চাও যদি গো

বড় হতে চাও যদি গো
নিজকে নিজে গড়
নিজকে নিজে গড়ার জন্যে
অশেষ কষ্ট করো ॥

দাঁড়ায় না যে নিজের পায়ে
সে পড়ে যায় একটু ঘায়ে
বাঁচার জন্যে না হয় তুমি
একটু নড়োচড়ো ॥

মাথা উঁচু করে তুমি
বাঁচতে যদি চাও
নিজের বোঝা নিজেই তবে
মাথায় তুলে নাও।

নিজের গায়ে না থাকলে বল
সকলে কয় তারে অচল
জ্ঞানের আলো-বঞ্চিতজন
অচল অধিকতর ॥



www.nagorikpathagar.org

## বাংলা ভাষার নাম

সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে
বাংলা ভাষার নাম
পেয়েছে বিরাট মান-সম্মান
পেয়েছে বিরাট দাম।

পেরিয়ে অনেক আঁধার রাত্রি
ভাষা দিবস যে বিশ্বমাতৃ-
ভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেলো
গাই তার জয়গান।

দিকে দিকে আরো আলোকিত হলো
বরকত-জব্বার
হলো মহিয়ান বাংলা ভাষার
মুখরিত দরবার।

পেলো মর্যাদা সালাম-রফিক
মর্যাদা পেলো ভাষা- সৈনিক
প্রতিষ্ঠা পেলো দিগ-দিগন্তে
শহীদের অবদান।



www.nagorikpathagar.org

# তুমুল সূর্য

ভাষার মিছিলে যারা এনেছিলো রক্তের মতো লাল
তুমুল সূর্য : যারা দিয়েছিলো গতিবেগ উত্তাল
প্রহরার মতো কাজে কি তাদের
তৈরি ছিলো না লোক?

ঈমানের সাথে জড়িত শব্দ এখনো তাহলে কেন
বিদেশী বানানে মোড়ানো রয়েছে বিদেশী পণ্য যেন
বাংলা ভাষার খুন চুষে খায়
সংস্কৃতের জোঁক!

ভাষা আন্দোলনের এখনো পূর্ণ-গ্রন্থ কই?
মান পাবে সব ভাষাসৈনিক আজো কেনো চেয়ে রই?
ভাষার স্বপ্ন? সাইনবোর্ড সব
ইংলিশে লেখা হোক!
ভাষার যুদ্ধ হয়নিকো শেষ বলে অন্তর্লোক।



www.nagorikpathagar.org

# নির্বাচিত প্রবন্ধ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# নির্বাচিত প্রবন্ধ

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

# ভূমিকা

কবি ও গীতিকার হিসেবে ব্যাপক পরিচিত এবং প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রবন্ধেও কবির যথেষ্ট পাণ্ডিত্য এবং পারদর্শিতা আমরা দেখতে পেয়েছি। তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকলেও বই প্রকাশের বেলায় অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই প্রকাশ পায় ১৯৯৬ সালে। আল আমীন ফাউন্ডেশন বইটি প্রকাশ করেন। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন জাহিদ হাসান বেনু। বইটির মূল্য ৮০ (আশি) টাকা। বইটিতে মোট ১৪টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। লেখক বইটি তাঁর বাবা-মাকে উৎসর্গ করেন। বইটির নাম 'নির্বাচিত প্রবন্ধ'। বইটিতে আমাদের ভাষা ও স্বাধীনতা, সাহিত্য সংস্কৃতির বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচিতে করণীয় দিকনির্দেশনা, সাহিত্য সংস্কৃতিতে আমাদের পূর্বপুরুষদের অবদান, সামনে এগিয়ে চলার নানান রসদ থাকায় পাঠক মহলে বেশ নন্দিত হয়েছে। বইটির ভূমিকায় জাতীয় অধ্যাপক দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লেখেন– কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হিসাব করলে অনেক দিনই হবে। বিভিন্ন সভা সেমিনারে তিনি আমাকে নিয়ে যেতেন। তাঁকে আমি কবি-কর্মী এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হিসাবে জানতাম। এরপর তিনি সাংবাদিক হিসেবে আমার কাছে হাজির হন। মাসিক কলম পত্রিকায় লেখা নেয়ার জন্য তিনি আসতে থাকেন।

এখন দেখা যায়, তাঁর আরও অনেক গুণ রয়েছে। তিনি গীতিকার, সুরকার- তাঁর কয়েকটি গানের ক্যাসেটও না-কি বের হয়েছে। গানের বই এবং কবিতার বইও আগে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি তাঁর লেখা অনেকগুলো প্রবন্ধ দেখে বুঝতে পারলাম, তাঁর প্রবন্ধের হাতও ভাল। অনেকগুলো গুণের সমাহার তাঁর মধ্যে রয়েছে।

তাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধের গ্রন্থে এক ডজনের উপর প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আমাদের শেকড় সন্ধানী সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিচয়ের জন্য প্রবন্ধগুলো উপকারী হবে। তাঁর প্রবন্ধগুলো দেখলে বোঝা যায়, তিনি ভাসা ভাসা কিছু করেন না, কোনো কিছু করলে তাঁর গভীরে প্রবেশ করেন। সাহিত্যের জন্য নবী করীমের পৃষ্ঠপোষকতা, ইসলামী সংস্কৃতি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ, বহু ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং মহাকবি ইকবালের উপর তাঁর লেখাগুলো মূল্যবান মনে হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নির্বাচিত প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থটি সংরক্ষণযোগ্য বলে আমি মনে করি। আমি তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করি।

বইটির প্রকাশক আল আমীন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ রুহুল আমীন 'আমাদের কথা' শিরোনামে প্রকাশকের কথায় লেখেন– কবি মতিউর রহমান মল্লিক সাহেবকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আদর্শ সাহিত্য আন্দোলন যাঁরা করেন, তাঁদের সবারই তাঁকে চেনার কথা। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী।

জীবনের বেশির ভাগ সময় তিনি আন্দোলনে ব্যয় করে আসছেন। তাঁর লেখা কবিতা, গানের ক্যাসেট ও বই ইতোপূর্বে বের হলেও প্রবন্ধের কোন বই এখনো বের হয়নি। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখাগুলো তিনি সংরক্ষণ করেন না- এটাও তাঁর জীবনের একটি দিক।

আল-আমীন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাঁর বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধ করার। আমাদের উদ্যোগকে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন স্বাগত জানায়। এ জন্য ফাউন্ডেশনের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লেখাগুলো একত্রিত করতে কবি শাহিদ মুবীনসহ অনেককেই হিমসিম খেতে হয়। তাঁর ক্যাসেট ও বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা সংরক্ষণ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে আমরা সফলও হই- আলহামদুলিল্লাহ।

যে-সব প্রবন্ধ আমরা পেয়েছি, প্রায় সবগুলোই আমরা গ্রন্থাবদ্ধ করেছি। তাঁর লেখা বেশির ভাগই গান-কবিতা। বক্তৃতা-বিবৃতি তো ইথারেই ভেসে যায়। কেউ যদি ক্যাসেটবদ্ধ করে থাকেন, তা হলে তা এক সময় কাজে আসবে।

বর্তমান নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলনে আমরা চৌদ্দটি ছোট-বড় প্রবন্ধ গ্রন্থাবদ্ধ করেছি। আমাদের জাতীয় মননশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্য প্রবন্ধগুলো দলীল হিসেবে কাজ করবে বলেই আমরা আশাবাদী

এ-গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বইয়ের 'ইসলামী সংস্কৃতি' নামের প্রবন্ধটি কবি তার অন্য একটি রচনার সঙ্গে যুক্ত করায় বর্তমান রচনাবলীর 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' থেকে তা বাদ দেয়া হয়েছে। এই প্রবন্ধটি পাঠক খুঁজে পাবেন কবির 'সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি' নামক পাণ্ডুলিপিতে।

www.nagorikpathagar.org

# প্রবন্ধকারের কথা

কবিতা এবং গানের প্রতি আমার আকর্ষণ আজো অসম্ভব রকমের। মূলত ভাষা এবং কথার চর্চার মধ্য দিয়ে আমি সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশাধিকার চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম কবিতা এবং তার ভাষা আমার যাবতীয় আবেগের বিষয় অগ্রাধিকার করুক আর গান এবং তার সুর অগ্রাধিকার করুক আমার বিপ্লবী চৈতন্য। কিন্তু প্রয়োজনের বিষয়াবলী পরিবেশন করতে গিয়ে একদা অনুভব করলাম; সঙ্ঘবদ্ধ বক্তব্যের জন্য আমার প্রবন্ধের ঐশ্বর্য হাতছাড়া করলে চলবে না। এভাবেই উদ্বোধিত প্রাবন্ধিক-প্রয়াস। এই প্রয়াসের সাফল্য সময়ের ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবু কণ্ঠস্বরের চেয়ে কথামালার আর্তস্বরই আমাকে অনেক অনেক বেশি সোৎকণ্ঠ করেছে।

**দুই.** 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আল-আমীন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কবি মুহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেবের নিরলস, নিরন্তর তাগিদে শর্তহীন ও স্বার্থহীন আনুকূল্য এবং বন্ধু ও সহযাত্রী মোহতারাম আবদুস সাত্তার সাহেবের অনুপ্রেরণা সার্বাধিক কৃতিত্বকে আগ্রাস করেছে। সত্যিই আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ লেখক-সম্পাদক শাহিদ মুবীনের প্রতিও। প্রবন্ধগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে তার পরিশ্রম ও পরিভ্রমণ ছিলো একান্ত সহোদরের মতো।

**তিন.** নির্বাচিত প্রবন্ধের অন্তত একটি প্রবন্ধ লিখিত নয়। একটি বক্তৃতামাত্র [রাসূল (সা.) এবং তার সাহিত্যদর্শন] বাণীবদ্ধ করেছিলেন তরুণ সাহিত্য-কর্মী আমিন আল আসাদ এবং আবদুল্লাহ জুবেরী। প্রকাশিত হয়েছিলো 'ছাত্র সংবাদ'-এ। অন্য দু-একটি প্রবন্ধ [অথবা নিবন্ধ] একেবারেই উদ্ধৃতি বহুল। এই জন্য যে, উদ্ধৃতি কেন্দ্রীয় তৎপরতাকে গতিশীল করে, বেগবান করে চলে মৌল-অভিযাত্রাকে। যেখানে আমার অযুত কথামালা গৃহীত হলো না; সেখানে একটি উদ্ধৃতি অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তার মতো উত্তোলিত হাত বৈ নয়।

সাহিত্য চর্চা ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক তো নয়ই বরং আবশ্যিক। সে কথাটাই আমি কোথাও কোথাও উচ্চকণ্ঠে বলতে চেয়েছি এবং বলতে চেয়েছি সংস্কৃতি চর্চার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের প্রকৃত উদ্ধার; স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার মৌলিক উপাদান। একটি প্রবন্ধে আমি ইসলামী সংস্কৃতি-চর্চার প্রাথমিক দিক-নির্দেশনাও দিয়েছি। হতে পারে তা অপূর্ণাঙ্গ কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নয় আদৌ।

www.nagorikpathagar.org

**চার.** আমার কাব্যগ্রন্থ [প্রকাশক ড. আবু হেনা আবিদ জাফর] 'আবর্তিত তৃণলতা'র জন্য চমৎকার এবং চিত্রিত উচ্চারণ করেছিলেন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি আল মাহমুদ। এবার আমার 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাৎক্ষণিক মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের প্রবীণ দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। এ আমার পরম সৌভাগ্য।

**পাঁচ.** জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন: 'প্রোডিউস, প্রোডিউস্, ইফ্ ইট্ বি ইন্‌ফিনটেসিম্‌ল পার্ট অফ্ এ প্রোডাক-প্রোডিউস্ ইট্ ইন্ গড্স নেম।

বস্তুত ঐ আলোকিত নির্দেশনার আলোকে আজ তাই যতো সামান্যই হোক না কেনো- প্রকাশ করার আগ্রহকে উন্মোচিত করা উচিত এবং এই প্রকাশ-তৎপরতায় এগিয়ে আসা প্রয়োজন লেখক, প্রকাশক সবাইকে। ব্যক্তিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং সাংগঠনিকভাবে। জাতীয় সাহিত্যের নিরাপত্তার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।

**ছয়.** ইবনে খালদুন বলেছেন: 'প্রতিটি দেশই তার বৃহৎ প্রতিবেশীকে অনুকরণ করে থাকে।' স্পেনের মুসলমানরা অনুকরণ করছে প্রতিবেশী বিজয়ী খ্রিষ্টানদের। পোশাক-অলঙ্কার এবং আচার-আচরণের বিভিন্ন দিক, এমন কি ঘরে ছবি রাখার ব্যাপারেও মুসলমানরা খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করছে। এ-এক স্পষ্ট হীনমন্যতা। যা সযত্ন পর্যবেক্ষণে ধরা পড়বেই। স্পেনের পরাজিত মুসলমানদের মতো আজ এ-দেশে একশ্রেণীর তথাকথিত মুসলমান বৃহৎ প্রতিবেশী ভারতের অনুকরণ করছে। এ-ও এক সুস্পষ্ট হীনমন্যতা। যা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বও একদিন বিপন্ন করতে পারে।

সেই কারণে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সংস্কৃতি চর্চায় অর্থাৎ ইসলামী সাহিত্য এবং সংস্কৃতি চর্চায় বিপ্লবী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে।

খোদা হাফেজ
ঢাকা
৩০/১১/১৯৯৬

মতিউর রহমান মল্লিক
বক্ষব্যাধি হাসপাতাল
৫/৬ নং ওয়ার্ড, ১৬ নং কেবিন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

## সূচিপত্র

কবি-কবিতাঃ রাসূলে খোদা (সা.) এর অনুরাগ ও উৎসাহ/ ২৩৫
রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহিত্য দর্শন/ ২৪৩
আমাদের সংস্কৃতিঃ প্রেক্ষিত কবি নজরুল ইসলাম/ ২৫৩
বাংলা নামের উৎপত্তি : কয়েকটি বিবেচনা/ ২৫৭
স্বাধীনতা : বিষয় ও ভাবনার অনুষঙ্গে/ ২৬৪
কবি ইকবাল : তাঁর যরবে কলিম ও অনূদিত যরবে কলিম/ ২৬৯
ইকবালের হাস্যরস/ ২৭৭
বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ/ ২৮৩
কবি ফররুখ আহমদঃ তাঁর সিরাজাম মুনীরা/ ২৮৭
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : তাঁর সাহিত্যচিন্তা/ ২৯৬
কথাশিল্পী জামেদ আলী এবং তাঁর সাহিত্যচিন্তা/ ৩০৭
ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য/ ৩১৫
সাহিত্য সংস্কৃতি আন্দোলনে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা/ ৩২০

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# কবি-কবিতাঃ রাসূলে খোদা (সা.) এর অনুরাগ ও উৎসাহ

প্রায় দু'হাজার বছরের সুপ্রাচীন সাহিত্য হচ্ছে আরবি সাহিত্য। বলা বাহুল্য, এখনও বহু পাঠককে প্রাচীন আরবি কবিতাগুলো প্রবলভাবে আলোড়িত করে। আরবদের জীবনাচারের প্রায় সকল অঞ্চলে অনস্বীকার্যভাবে অমানবিকতা থাকলেও কাব্যচর্চার ব্যাপারে তাদের খ্যাতি ছিলো কিংবদন্তীর মতো। তারা তাদের চিত্তবৃত্তির সমূহ প্রকাশের জন্য বস্তুত বেছে নিয়েছিলো ছন্দের দোলায়িত ব্যঞ্জনা আর ভাবের আনন্দময় গতিবহতা, অর্থাৎ কবিতার কলকল্লোলিত ফসলা প্রান্তরকে তারা বেছে নিয়েছিলো।

তাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আনুষ্ঠানিকভাবে 'উকাজে'র মেলায় কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নিতেন। বছরের শেষে সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোকে কাবা ঘরের দেয়ালেই ঝুলিয়ে রাখা হতো, অনিন্দ্য সুন্দর মিসরীয় বস্ত্রখণ্ডের ওপর বর্ণালী অক্ষরে লিপিকৃতির পরপর।

আরবদের চমৎকার এক প্রত্যয় ছিলো যে, কবিতা হচ্ছে বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার অভিজ্ঞান। জ্বীনেরা এবং শয়তানেরাও তাদের কবিদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তাদের কবিরাই ছিলো তাদের গোত্রের মুখপাত্র, পথ-প্রদর্শক, পরামর্শদাতা এবং শৌর্যবীর্যের মূর্ত প্রতীক।

জীবিকা উপার্জনে এবং বাঁচার আকুলতায় প্রাচীন আরবদের জন্য যুদ্ধ ছিলো অপরিহার্য। আর যুদ্ধের জন্য অপরিহার্য ছিলো সমরাস্ত্রের। কিন্তু তার চেয়ে প্রয়োজন ছিলো প্রবল প্রতাপ যোদ্ধার-তার দৃঢ় মনোবলের, তার অসম সাহসের, তার সৌকর্যমণ্ডিত শৌর্যবীর্যের, কিন্তু তাঁকে অর্থাৎ সে দুর্দান্ত যুদ্ধবাজকে এবং তার গুণাবলীকে বিপুল বন্যাবেগে প্রবাহিত করার ক্ষেত্রে কবিই ছিলো এক মাত্র, কবিই ছিলো সর্বময়। অতএব কবিদের শব্দাস্ত্রই ছিলো তাদের সৈনিকদের সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যাতীত সন্দীপন। রণসংগীত রচনার ভেতর দিয়েই কবিরা এই দুর্লভ কর্মকাণ্ড উদযাপন করতো বলে তাদের অপ্রতিহত প্রতিপত্তি ছিলো, সর্বস্পর্শী আধিপত্য ছিলো।



www.nagorikpathagar.org

মূলত কবিদের প্রধান কর্তব্য ছিলো এমন সব কবিতা রচনা করা যার মধ্যে থাকবে নিজস্ব গোত্রের পরাক্রম, বীর্যবত্তা, সাহসিকতা এবং যশঃকীর্তন তথা গৌরব গাঁথা। মর্সিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ শোকগাঁথার ভেতর দিয়ে মৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তির বীরত্ব, মর্যাদা ও খ্যাতির কথা স্মরণ করানো ছিলো কবির আরো একটি কাজ। এ কাজের উদ্দেশ্যই থাকতো মৃতজনের গোত্রের লোকদেরকে প্রতিশোধের জন্য প্ররোচিত করা, কবিতায় কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তির কুৎসা রচনার অথ বা বিদ্রুপাত্মক ভাষায় হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য গাঁথা সৃষ্টির অন্যতম দায়িত্বই ছিলো তখনকার কবিদের। ফলে, বিবাদ-বিসম্বাদ আর ক্লিন্নকলহ সংঘটিত করার ব্যাপারে কবিতার এক একটি চরণের ভূমিকা ছিলো এক একটি বিষাক্ত তীরের ফলার চেয়েও মারাত্মক। কবিদের কদরও ছিলো তাই অত্যধিক।

নতুন চারণভূমির প্রয়োজন- কবির পরামর্শ নাও, অন্য কোথাও তাঁবু খাটাতে হবে- কবির মতামত চাও। আসল কথা, কবিই ছিলো সে সমাজের বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা এবং সমূহ সর্বজান্তা। আর কবিতা ছিলো তাদের জীবন ও প্রকৃতির অমোঘ নিয়ন্তা। প্রাচীন আরবদের রক্ত-মাংসে, অস্থিমজ্জায়, আশা-নিরাশায় পাওয়া না পাওয়ায়, আনন্দ-বেদনায়, প্রেম ও বিরহে, জীবন ও মৃত্যুতে কবিতা অস্তিত্বের মতো অপরিহার্য হয়ে গিয়েছিলো এবং সেই জন্যে তাদের মধ্যে কোনো কবির আবির্ভাব ঘটলে তাঁকে বরণ করে নিতো আনন্দ-উৎসব করে, প্রীতিভোজের আয়োজন করে।

সেই প্রাচীন সমাজে 'হিজা' নামে এক ধরনের কবিতা ছিলো– শায়কের চেয়ে তীক্ষ্ণ, লু-হাওয়ার চেয়ে তীব্রতর। একটি হিজা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে তা এ-প্রান্ত হতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তো। এক মুহূর্তে উস্কিয়ে দিতো আরব জীবনের নিষ্ঠুরতা, মরু জীবনের নৃশংসতা। সে দুর্দান্ত আরব ভয় করে না কোনো কিছুকেই, যদি ঘটনাক্রমে তারই জন্যে রচিত হয়ে যায় কোনো হিজা, তাহলে সে মুহূর্তের মধ্যেই অনুভব করতে থাকে অসম্ভব এক মৃত্যুযন্ত্রণা। যার নিরাময় নেই, উপশম নেই প্রতি-উত্তরে আর একটি জুতসই হিজা না লেখা পর্যন্ত।

গোত্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা সংঘাত, সংঘর্ষ অথবা রক্তপাতকেই প্রশ্রয় দিয়ে যায়। কবি এবং কবিতা অস্থিরতার নেতৃত্ব দিয়ে চলে। এমনি এক ভূখণ্ডে সর্বপ্লাবী অস্তিত্ব ছাড়া যে কোনো সুকুমার বৃত্তি ও সৃজনশীলতার যথার্থ উদ্ধার ছিলো অসম্ভব। সমবেত দরকারেই একজন মহানায়কের আবির্ভাব অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছিলো তখনই।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূর করার এক মহান ও গুরুত্ববহ দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই


www.nagorikpathagar.org

তাঁকে এ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই যে দায়িত্ব, এ দায়িত্ব পালন সম্ভবই ছিলো না কোনো সাধারণ নায়কের এবং সম্ভব ছিলো না বলে একজন মহানায়কের জন্য যে সব গুণ থাকা দরকার, সেইসব গুণই তাঁকে দান করা হয়েছিল।

রাসূলে খোদা (সা.) যে মানব জাতির এক অবিসংবাদী মহানায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তার জন্মগ্রহণের আগেই তা জানতে পেরেছিলেন মা আমিনা।

মুহাম্মাদ (সা.) গর্ভে আসার পর মা আমিনার কাছে অপরিচিত এক আগন্তুক আসেন এবং তাঁকে বলেন, আপনি যাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, এ যুগের মানব জাতির মহানায়ক তিনিই।

রাসূলে খোদাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলতেন... আমি পিতা ইব্রাহিমের দোয়ার ফল এবং ভাই ঈসার সুসংবাদের পরিণতি। আমি গর্ভে আসার পর আমার মা স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর মধ্য থেকে একটি জ্যোতি বেরুলো যার দ্বারা সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে গেলো...

একজন মহামানবের আগমন যেমন ব্যতিক্রমী, তেমন ব্যতিক্রমী তার আলোকিত জীবন প্রবাহ। রাসূলে খোদা চেয়েছিলেন সমস্ত দুনিয়াকেই নিরাময় করতে। নিরাময় করতে চেয়েছিলেন বলেই ব্যতিক্রমী জীবনে তার সমস্ত আয়োজন কাজে লাগিয়েছিলেন আদর্শনিষ্ঠ একদল মানুষ সংগঠনে। তার এই লোকগঠনের প্রবলতার প্রয়াস ছিলো সমাজের প্রতিটি অবধারিত বাঁক-বঙ্কিম পথমোহনায়।

শুধু রাজনৈতিক অঙ্গনেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন কিংবা সমরনৈতিক প্রয়োজনকেই একমাত্র বিষয় বলে মনে করে নিয়েছিলেন তা নয়- বরং একটি সম্যক পরিবর্তনের লক্ষ্যে যেখানে যে পরিমাণ বিচক্ষণ জনসম্পদের আবশ্যকতা ছিলো, সেখানে সে পরিমাণ জনসম্পদই তিনি যথার্থভাবে গড়ে তুলেছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মুফতী আমিমুল ইহসান এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনসম্পদের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লিখেছিলেন- উওহ হার ফন মেঁ কামেল ওয়া মাহের কে। রাসূলে খোদা (সা.) যাদের গড়ে তুলেছিলেন, তারা প্রত্যেকটি বিষয়ে পরিপূর্ণভাবে দক্ষ ছিলেন।

রাসূলে খোদা একটি সত্য এবং সাম্যের সমাজ গড়ার কাজ শুরু করতেই কায়েমি স্বার্থবাদী নেতারা ও কবিরা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এক নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার পথে নেতারা বাধার সৃষ্টি করতে থাকে জনসাধারণকে সংগঠিত করা মধ্য দিয়ে। আর কবিরা কবিতা রচনার ভেতর দিয়ে ইসলাম ও রাসূল মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে কুৎসা গেয়ে গেয়ে জনমতকে বিভ্রান্ত করার কাজে উঠে-পড়ে লেগে যায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিকতার বাইরে চলে গেলে রাসূল তার সাহাবীদের ডাক দিয়েছিলেনঃ যারা হাতিয়ারের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে, কথার দ্বারা [অর্থাৎ কবিতার দ্বারা] আল্লাহর সাহায্য করতে তাদের কে বাধা দিয়েছে? রাসূলে খোদার


www.nagorikpathagar.org

একান্ত সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কবি সাহাবীদের ভেতর থেকে হাস্‌সান বিন সাবিত, কা'ব বিন মালিক, আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) প্রমুখ ঐ উদাত্ত আহবানে সাড়া দিলেন। মসজিদে নববীতে কবি হাসসানের (রা.) জন্য মিম্বর তৈরি করা হলো। রাসূলে খোদার নির্দেশনা অনুযায়ী আবু বকর (রা.)'র পরামর্শ নিয়ে হাস্‌সান ইসলামের চরমতম শত্রু কবিদের দাঁতভাঙা জবাব দিতে লাগলেন। হাস্‌সান বিন সাবিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করলে রাসূলে খোদা তার জন্য দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! রুহুল কুদুসকে দিয়ে তাকে তুমি সাহায্য করো। হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতা শুনে রাসূলে খোদা মুগ্ধ হয়ে বলতেন: এ কবিতা তাদের জন্য তীরের আঘাতের চেয়েও সাংঘাতিক।

এই সাহাবী কবি হাস্‌সান বিন সাবিতের (রা.) প্রতি রাসূলে খোদার ভালোবাসা ছিলো এতোটা প্রবল যে, মিসরের রোমক শাসক দুই অপরূপা সুন্দরী উপঢৌকন পাঠালে শিরী নাম্নী অনিন্দ্য সুন্দরী রূপবতীকে তিনি তাঁর সাথেই বিয়ে দিয়ে দেন।

শুধু কবিতা লেখার অপরাধেই কোনো কবির প্রতি রাসূলে খোদার আদৌ অবহেলা ছিলো না; বরং কবিদের প্রতি তাঁর ছিলো এক অপরিসীম আস্থা এবং আস্থা ছিলো বলেই কবি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) একদা রাসূলে খোদার পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন সেনাপতির দায়িত্বও। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি একজন ঈমানদারের জন্য আল্লাহর দেয়া সর্বোত্তম যে উপাধি- শহীদ, সেই শহীদ খেতাব অর্জন করার মধ্য দিয়ে চিরকালের জন্যই খোদ খোদারই তত্ত্বাবধানে চলে গিয়েছিলেন।

রাসূলে খোদা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই কবিদের প্রতি ক্ষমাসুন্দর। প্রাণদণ্ডের মতো অপরাধ করার পরও তারা মার্জনা পেয়েছে ঐ মহানুভব মানুষের। কবি কা'ব বিন জোহায়েরের ইসলাম গ্রহণের ইতিহাসের সাথে সেঁটে রয়েছে তেমনি একটি ঘটনা:

কবি কা'ব বিন জোহায়েরের ভাই বুজায়ের বিন জোহায়ের ইসলাম গ্রহণ করলেন। কা'ব বিন জোহায়ের ভীষণ বিক্ষুব্ধ হলেন। বুজায়ের এবং রাসূলে খোদাকে নিয়ে লিখলেন অত্যন্ত আপত্তিকর সব কবিতা। ইসলামের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলো। কবি কা'ব বিন জোহায়েরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন রাসূল মুহাম্মদ (সা.)। কবি আত্মসমর্পণ করলেন প্রেমের নবীর কাছে। শুধু আত্মসমর্পণ করলেন না, কবি বানাত সু'আদু'-র মতো এক দীর্ঘ কবিতা পড়ে শোনালেন। মানবতার নবী এতো খুশি হয়ে গেলেন যে, কবির মৃত্যুদণ্ডাদেশ তো রহিত করলেনই; উপরন্তু তাঁকে তাঁর গায়ের চাদরও উপহার দিলেন। এই চাদর পরবর্তী সময়ে আমীর মুআবিয়া (রা.) কিনে নেয়ার জন্যে কবির দরবারে বহুবার ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু কবি তার এই প্রাণের ঐশ্বর্য বিক্রি করার জন্য অমৃত্যু কখনোই সম্মত হননি।


www.nagorikpathagar.org

কবিদের মর্যাদা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যি অপরিসীম। বক্তৃতা দেবার সময় কখনো কখনো তিনি তাদের কবিতার উদ্ধৃতি দিতেন। 'সাবা মুয়াল্লাকা'র কবি লবিদ (রা.)'র কবিতার দু'টি চরণ এভাবেই অমর হয়ে আছেঃ

আলা কুল্লু শাইয়্যিন মা খালাল্লাহ বাতেলু
ওয়া কুল্লু নায়িমিন লা মহালাতা যাইলু।

অর্থাৎ সাবধান হও, আল্লাহ ছাড়া আর সবই মিথ্যা এবং সব নেয়ামতই একদিন অবলুপ্ত হবে, শুধু অবলুপ্ত হবে না জান্নাতের সম্ভার।

রাসূলে খোদা যেমন কবিদেরকে ভালোবেসেছিলেন, তেমনি কবিতার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিলো বিস্ময়কর। উম্মি নবী কবিতা লিখতে পারতেন না, কিন্তু মুখে মুখে বানিয়ে ফেলতেন দু'এক চরণ। যেমন-

আনান্নাবিয়্যু লা কাজিব, আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব।
অর্থাৎ আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই।
আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।

রাসূলে করিম (সা.) মুখে মুখে রচনা করেছিলেন এই দু'টি চরণওঃ

হাল আন্‌তে ইল্লা ইছবাউন দুমীতে
ওয়া ফি সাবিলিল্লাহি মা লাকিতে।

অর্থাৎ হে আঙ্গুলী! তুমি তো একটি আঙ্গুল বৈ কিছুই নও। সুতরাং যা কিছু হয়েছে, তা তো আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে- তাই এতে অনুশোচনা ও দুঃখ কিসের?

ওহুদের যুদ্ধের এক পর্যায় রাসূল (সা.) একটি গর্তে আশ্রয় নিলেন। তবু একখণ্ড পাথরের আঘাতে তার আঙ্গুলী হতে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকলে তিনি আবৃত্তি করতে লাগলেন উল্লেখিত কবিতাটি।

রাসূলে খোদার মুখে মুখে রচিত আর একটি কবিতা যা খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খুঁড়তে খুঁড়তে তিনি তার সাহাবীদেরকে নিয়ে সমবেত কণ্ঠে গাইতেনঃ

আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশাল আখিরা
ফাগফিরিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা।

অর্থাৎ হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ব্যতীত আর কোনো জীবন নেই, তুমি আনসার এবং মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।

মুখে মুখে বলা তাঁর আরো কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। যেগুলো অন্ত্যমিলের দিক থেকে এবং ভাব-ভাবনার তাৎপর্যতায় নিঃসন্দেহে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এসব কবিতার চরণ অমৃত চিরকালই কবি ও কবিতার পাঠকদের সত্যিকার অর্থে রাসূল (সা.) যে একজন সর্বাধুনিক মানুষ ছিলেন তা অনুধাবন করবার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়ে যাবে।


www.nagorikpathagar.org

একজন উম্মি নবীর পক্ষে মুখে মুখে কবিতা তৈরি করা কি করে সম্ভব হয়েছিলো? মূলত রাসূলে খোদা (সা.) ছিলেন শুদ্ধতম মানুষ। তিনি নিজেই বলতেন:

আনা আফসাহুল আরব... ... ... ইন্নি মিন্ কুরাইশিন্ অ-ইন্নি নাশা'তু ফি বাবি সা'আদি বিন বক্‌র।

অর্থাৎ আমি শুদ্ধতম আরব! কেননা, কুরায়েশদের ভেতরেই আমার জন্ম এবং সায়াদ বিন বকর গোত্রে আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি।

ওমর (রা.) রাসূলে আল-আরবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে বড় হলেন অথচ কথা বলেন এতো সুন্দর ভাষায়...। অন্য কোনো কোনো সাহাবীও কখনো কখনো তার সুন্দর সুন্দর কথায় বিমুগ্ধ হয়ে- 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি (চমৎকার) শুদ্ধভাষী, কোনো ব্যক্তিকেই আমি আপনার চেয়ে সুন্দর ও মধুর (ভাষায়) কথা বলতে (শুনিনি) দেখিনি' মন্তব্য করলে সাইয়েদুল মুরসালিন রাসূলে মকবুল (সা.) উত্তর করতেন, ঠিকই বলেছো, এ যে আমার অধিকার, কারণ কোরআন তো আরবি মুবিন ভাষায় আমার নিকটই নাযিল হয়েছে।

নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই রাসূলে খোদা (সা.)-এর মধ্যে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর একটি অসাধারণ দখল এসে গিয়েছিলো প্রকৃতিগতভাবে একজন আরব হবার কারণে। তাছাড়া ভাষার গতি ও লাবণ্যের প্রতি তার একটি স্বভাব-সুলভ কৌতূহলও ছিলো। নাজরানের বিখ্যাত দার্শনিক ও নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টান পাদরি ছিলেন আরবের বিখ্যাত বাগ্মী। তাঁর বক্তৃতা ছিলো সাবলীল, কিন্তু ভাবাবেগ ছিলো খরস্রোতেরই অধিক। তাঁর বিষয়বস্তু ছিলো ধার্মিকতার আদর্শে উজ্জ্বলতর। কুস বিন সা'ইদাহ আল ইয়াদি নামের এই অসাধারণ বাগ্মী উ'কাজের মেলায় বক্তৃতা করতেন। পারস্য সম্রাট কিসরা পর্যন্ত তাঁর বক্তৃতা শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমি ব্যতীত আরবদের আর কোনো বাগ্মী না থাকলেও, তাদের জন্য তুমি একাই যথেষ্ট।'

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলে খোদা কুস-এর একটি বক্তৃতার আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বক্তৃতা শুনে দারুণভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই কুস বিন সাই'দাহ আল ইয়াদির সাথে রাসূলে খোদার একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো এবং তিনি তাঁকে ইসলাম প্রচারের কাজেও লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বক্তৃতার কোনো পর্যায়ে 'আম্মা বায়াদ' শব্দ দুটির আজো যে ব্যবহার দেখা যায় তা এই কুস আল ইয়াদিরই প্রবর্তিত।

কবিতা সম্পর্কে সারওয়ারে দো-আলমের (সা.) কোনো ধারণা আদৌ অস্পষ্ট ছিলো না। তিনি বলিষ্ঠ ভঙ্গিতেই উচ্চারণ করেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে কোনো কোনো কবিতায় রয়েছে প্রকৃত জ্ঞানের কথা'।


www.nagorikpathagar.org

'কবিতা কথার মতোই। ভালো কথা যেমন সুন্দর, ভালো কবিতা তেমনি সুন্দর আর মন্দ কবিতা তো মন্দ কথার মতো মন্দই (বৈ নয়)'।

কবিতা সম্পর্কে বিশ্বনবী এতোটা উদার ছিলেন যে, তিনি বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের কবিতা শেখাও তাহলে তাদের কথা মিষ্টি এবং সুরেলা হবে'।

যেহেতু তিনি কবিতা সম্পর্কে ধারণা করতেন, 'কবিতা হচ্ছে, সুসামঞ্জস্য কথামালা। সত্যনিষ্ঠ কবিতাই সুন্দর কবিতা। আর যে কবিতায় হয়েছে সত্যের অপলাপ সে কবিতায় নেই মঙ্গল'। সেহেতু মন্দ এবং বাজে কবিতা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকাই স্বাভাবিক। তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিয়ে যে কথা বলেছেন, তা হচ্ছে 'তোমাদের কারো পেটে (এ ধরনের বাজে) কবিতা থাকার চেয়ে সে পেটে পুঁজ জন্মে, (আবার) তা পঁচে যাওয়া অনেক উত্তম'।

সায়্যেদুন্নবির কবিতা শোনার মতো ধৈর্যও ছিলো এবং অবহিত কান ছিলো। তিনি কবিতা শুনবার জন্য কখনো কখনো কবি-সাহাবীর বাড়িতেই হাজির হয়ে যেতেন। শুধু শুনতেন না, সংশোধনও করে দিতেন। একবার এক কবি তাঁর সামনে আবৃত্তি করলেন: কাফাশশাইবু ওয়াল ইসলামু বিল মার্‌ই নাহিয়ান...অর্থাৎ বার্ধক্য এবং ইসলাম মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট।

রাসূল (সা.) কবিতার এই অংশটি কবিকে সংশোধন করতে বললেন এভাবে: কাফাল ইসলামু ওয়াশশাইবু বিল মারই নাহিয়ান...

শাইবু শব্দটিকে কবি ছন্দের স্বার্থেই ইসলাম শব্দের আগে বসিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূল আল আমিন (সা.) তা সমর্থন করেননি। যদিও উপস্থিত কোনো কোনো সাহাবী ছন্দ নষ্ট হবার বিষয়টির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আসলে তিনি কবিতার আইনের চেয়ে ভাব-ব্যঞ্জনার ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

> 'তোমাকে মৃত্যু একদিন অবশ্যই গ্রাস করবে'।
> যে যৌবনে মৃত্যুবরণ করলো না
> বার্ধক্যে, অবশ্যই তাঁকে তার স্বাদ গ্রহণ করতে হবে
> কেননা মৃত্যু হচ্ছে এমনই একটি শরবতের পেয়ালা
> যা প্রত্যেককে নিশ্চিতভাবে পান করিয়ে ছাড়বেই।'

মাহবুবে খোদা (সা.) উমাইয়ার ঐ কবিতা শুনে একটি অর্থবহ মন্তব্য করেছিলেন, 'তার কবিতা গ্রহণ করেছে ইসলাম আর তার অন্তর গ্রহণ করেছে কুফরি (খোদাদ্রোহিতা)।' শুধু অবহিত কান আর সন্দেহমুক্ত জ্ঞান থাকলেই ঐ ধরনের মন্তব্য রাখা সম্ভব।

রাসূলে খোদা অবশ্যই কবি ছিলেন না। মহাগ্রন্থ আল কোরআন পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছে:


www.nagorikpathagar.org

আমরা তাঁকে 'কবিতা' রচনা শিক্ষা দেইনি এবং এ ধরনের কাজও তাঁর জন্যে অশোভনীয়' (সূরা ইয়াসিন)। কিন্তু তিনি যে কবিতার সৌন্দর্য হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারতেন এবং কবিতার প্রতি তাঁর যে একটি অর্থবহ আনুকূল্য ছিলো তা কখনোই অস্পষ্ট ছিলো না। অত্যুক্তি হবে না, কবিরা একদিন রাসূলে খোদার (সা.) কাছ থেকে যে মর্যাদা এবং সমর্থন পেয়েছিলেন তা (আজ পর্যন্ত) পৃথিবীর কোনো মহামানুষের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়নি, যাচ্ছে না। বস্তুত যাবেও না। কবি এজরা পাউন্ড তার একটি সুদীর্ঘ কবিতায় রাসূল (সা.) প্রসঙ্গে বলেছেন- তোমরা (ইউরোপের লোকেরা) তো সব সময় কেবল হাতই পাতলে, গ্রহণ করতে চাইলে, গ্রাস করতে চাইলে কিন্তু পৃথিবীতে এসেছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি শুধু দানই করে গেছেন অনবরত। মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছুই চাননি।

আর বিশ্ববিখ্যাত জার্মান মহাকবি গ্যেটে রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে তার গাঁথায় কী চমৎকারভাবেই না বলেছেন-

নিচের উপত্যকা মাঝে ফোটে তাঁর পদক্ষেপ-তলে ফুলরাশি। আর প্রান্তর জীবন পায় তার প্রশ্বাস হতে।

মিশুক ঝরনাগুলো, মেশে তাঁর সাথে। তখন সে চলে সমতল বক্ষে রূপালী গৌরবে। আর তাঁকে নিয়ে গৌরব করে সমতল।

সত্যিকার অর্থেই রাসূল (সা.) কবিতার মতো ছন্দময়, হৃদয়ময় এবং সৌন্দর্যময় একটি নমনীয় পৃথিবী রচনা করতে চেয়েছিলেন। সে পৃথিবী গড়বার জন্য কবিদের প্রতিও তার আহ্বান ছিলো বড় আবেগঘন, বড় প্রাণস্পর্শী। তাঁর একটি স্বভাব ছিলো কোনো দিকে যখন তিনি তাকাতেন আদৌ বাঁকা চোখে তাকাতেন না; বরং সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়েই সে-দিকে তাকাতেন।

অর্থাৎ যে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়ার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন ঐ স্বভাবের। অর্ধেক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মানুষ তিনি একেবারেই ছিলেন না।

সুতরাং কবি ও কবিদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ হৃদয়ের মানুষ, পূর্ণাঙ্গ পরতৃপ্তির মানুষ।


www.nagorikpathagar.org

# রাসূল (সা.) এবং তাঁর সাহিত্য দর্শন

'রাসূলের মধ্যে, রাসূল (সা.)-এর জীবনাচরণের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ' -এই আয়াত খুবই ব্যাপক অর্থ প্রকাশ করে। রাসূলে মাকবুল (সা.) সবার জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। পৃথিবীতে যতো মতের, যতো পথের যতো ধরনের মানুষ আছে, যতো ধরনের কাজ তারা করেছেন, সবার জন্য রাসূল (সা.) হচ্ছেন উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ। কবিদের জন্যে, সাহিত্যিকদের জন্যে, সুন্দরের চর্চা যারা করেন তাদের জন্যেও রাসূলের (সা.) মধ্যে উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে। আমি প্রায়ই একটা কথা বলে থাকি যে, কবিদেরকে বিশেষ করে রাসূলের মতো এতো গভীরভাবে পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ ভালোবাসেনি আমি যতটুকু লেখাপড়া করেছি, যতোটুকু রাসূলকে জানার চেষ্টা করেছি, এতে একটি জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, আজকে যারা কবি সাহিত্যিক এবং এ জগতে যারা বিচরণ করেন তাদেরকেও রাসূলের চেয়ে বেশি করে ভালোবাসার মানুষ পৃথিবীতে আসবেন না। আমাদের কাছাকাছি সময়ের একটু অতীতের বা বর্তমান সময়ের কোনো নেতাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, কোনো নেতাকে যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাদের মনে কবিদেরকে ভালোবাসার আগ্রহ, যে ব্যাকুলতা তা রাসূলের (সা.) এর আগ্রহ এবং ব্যাকুলতার কাছে কোনোদিন ঠাঁই পায়নি, পাবেও না। পাওয়া সম্ভব নয়। আসলে সমস্যা হয়েছে কী, এদেশে রাসূল (সা.) কে সাহিত্যের অঙ্গনে যাদের তুলে ধরার কথা ছিলো, তারা সব সময় রাসূল (সা.) কে অন্যভাবে তুলে ধরেছে।

বিশেষ করে, কোরআনের 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাইন' এই আয়াতাংশকে কেন্দ্র করে রাসূলকে, কবিতাকে, সাহিত্যকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা খুবই আপত্তিকর, 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন'-এর অর্থ হলো: 'কবিরা বিভ্রান্তির উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়।' এখন আমাদের দেশের অনেকেই এই আয়াতাংশটুকু সামনে রেখেই সব সময়ের জন্য কবিদেরকে বিতর্কিত করেছে, কবিদেরকে জাহান্নামি করেছে, কবিদেরকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেছে, কবিদেরকে সমাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরিয়ে দিয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় একটি অংশ হিসেবে তুলে ধরেছে। একদা এ দেশেরই প্রখ্যাত আরবি জানা বিখ্যাত এক



www.nagorikpathagar.org

আলেম শিল্পকলা একাডেমিতে বসে কবি আল মাহমুদের সামনে 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন'-এর ব্যাখ্যা করে ছিলেন। ব্যাখ্যা করতে করতে সে আলেম এমন এক পর্যায়ে চলে গেলেন যে, আল মাহমুদ ভাই ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'মল্লিক, কবিদের অবস্থান যদি এই হয়, তবে তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, এতোকাল বসে কী করলাম!' আমি চুপচাপ শুনছি- 'আশশুয়ারাউ ইয়াত্তাবিউহুমুল গাউন' এর যে ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। শেষের দিকে যখন মওলানা থামলেন এবং মাহমুদ ভাই ঐ রকম বললেন, তখন আমি মওলানাকে বললাম, 'আপনি এ আয়াতের শেষ পর্যন্ত কেনো এখানে মাহমুদ ভাইর সামনে ব্যাখ্যা করলেন না? শেষের দিকে 'ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসালিহাত' বলা হয়েছে। অর্থাৎ কবিদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে কল্যাণের কাজের সাথে জড়িত করেছে এবং যারা ঈমান এনেছে তারা অবশ্যই মুক্তি পেয়ে যাবে। চট করে সেই মওলানা আমাকে বললেন, 'আপনি কি মাদ্‌রাসায় পড়েছেন? আমি বললাম যে, 'মাদ্‌রাসায় পড়ি আর না পড়ি, আপনি একটা আয়াতকে বিশ্লেষণ করবেন আর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তা বিকৃত করবেন, এটা কি করে হতে পারে?

আসলে এই যে আয়াত, এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল করিম (সা.) কবিদের সাথে খুব মজাও করেছিলেন। কবিদের কাছে সংবাদ পৌঁছে গেলো, এমন আয়াত নাযিল হয়েছে, যে আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে, কবিরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (সা.) বললেন, হ্যাঁ, তাই তো এ রকমই তো আয়াত নাজিল হয়েছে।' সবাই তখন কান্নাকাটি শুরু করলো। শেষের দিকে রাসূল (সা.) হাসতে হাসতে বললেন, 'আয়াতের শেষ পর্যন্ত তো যাও। আয়াতের শেষ পর্যন্ত কী বলা হয়েছে, শোন, 'ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসসালিহাত'। এ আয়াতের শেষাংশ শোনার সাথে সাথে কবি-সাহাবী যারা ছিলেন, কাঁদতে কাঁদতে যারা এসেছিলেন, হাসতে হাসতে তাঁরা চলে গেলেন। আসলে রাসূল (সা.) কে এবং রাসূল (সা.)-এর কাব্য প্রীতিকে, রাসূলের (সা.) কাব্যদর্শনকে সব সময়ের জন্যেই আমাদের দেশে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমি বলবো, শুধু বিকৃতভাবে নয় এসব সম্পর্কে আমাদের দেশের তথাকথিতরা খুব কমই জানেন।

এই না জানার কারণে এবং একটি বিদ্বেষের কারণে সব সময় বিকৃতভাবে রাসূল (সা.) সম্পর্কে, রাসূলের কাব্যপ্রীতি সম্পর্কে, রাসূলের (সা.) কাব্যাদর্শ সম্পর্কে এখনো ঐ বিষয়গুলো বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কবি এজরা পাউন্ড বলেছিলেন, 'পৃথিবীতে একজন মানুষই শুধু এসেছেন যিনি কেবল দিয়ে গেছেন এবং দিয়ে গেছেন।' রাসূল (সা.) শুধু মানুষকে দেয়ার জন্যই চেষ্টা করেছেন।


www.nagorikpathagar.org

সারা জীবন তার সাধনাই ছিলো মানুষকে কেবল দিয়ে যাওয়া আর দিয়ে যাওয়া। আর তোমরা যারা কেবল পৃথিবী থেকে নিতেই এসেছো। তোমাদের কাজ হলো একটা, শুধু একটাই, তা হলো কেমন করে নেয়া যায়। তোমরা এই মানুষটির দিকে দেখো, যে মানুষটি সারা জীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে কেবল পৃথিবীর মানুষকে দিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই করেছেন। আসলে পৃথিবীতে একজন মানুষই এসেছেন যিনি কেবল দিয়ে গেছেন, ভালোবাসা বিলিয়ে গেছেন, সবাইকে। শুধু যে কবিদেরকে তা-ই নয়। এজরা পাউন্ডের কথাটা এখানে কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেই বললাম।

একজন চাষীর সাথে রাসূল (সা.)-এর খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো। সেই চাষী (সাহাবী চাষী) থাকতো গ্রামে। যখন চাষী রাসূল (সা.)-এর কাছে যেতো, গ্রামের যে সব মূল্যবান জিনিস, যেমন- টাটকা তরিতরকারী, ফলমূল নিয়ে রাসূল (সা.)-এর দরবারে আসতো। যে-সব পেলে রাসূল (সা.) খুব খুশি হতেন। গ্রামের মূল্যবান জিনিস বলতে যা বোঝায় আর-কী। আর রাসূল (সা.) তাঁকে দিয়ে দিতেন শহরের এমন সব মূল্যবান জিনিস যে-সব পেলে গ্রামের লোকেরা খুশি হয়। তাহলে দেয়া এবং নেয়ার যে পদ্ধতি, সে পদ্ধতি কি ধরনের হবে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি। সে চাষীর সাথে রাসূলের (সা.) এতোটা গভীর সম্পর্ক হয়েছিলো যে, রাসূল (সা.) দেখলেন, চাষী বাজারের একটি দোকানে কি যেনো দেখছে, বা কিছু কেনার জন্য দরদাম করছে। রাসূল (সা.) চুপি চুপি গিয়ে তার দু'টি চোখ ঝাপটে ধরলেন। সে চাষী মনে করেছে যে, তার কোনো সহযাত্রী বা তার কোনো বন্ধু দুষ্টুমি করে তার চোখ চেপে ধরেছে। সে চিৎকার শুরু করেছে, 'এই চোখ ছাড়ো, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি। তুমি অমুক যা আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে করে থাকি। রাসূল (সা.) তাঁর হাতটা একটু ফাঁক করেছেন, চাষী দেখে কী যে, রাসূল (সা.) পেছনে থেকে চেপে ধরেছেন এবং মজা করছেন। তৎক্ষণাত রাসূল (সা.) মুচকি হেসে চাষীর একটি হাত ধরে ওপরে উঠিয়ে চিৎকার করে বললেন, এই কে আছো? একটা গোলাম আছে, একটা দাস আছে, বিক্রি হবে, বিক্রি হবে। একটা দাস, একটা গোলাম আমি বিক্রি করবো।' তখন সে চাষী মুচকি হেসে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার স্বাস্থ্য তো ভালো না, দেখতেও আমি সুবিধের না, আমাকে বিক্রি করে দাম তেমন পাবেন না। বেশি দামে বিক্রি করতে পারবেন না।' তখন রাসূল (সা.) বললেন- 'তোমার যে কতো দাম আল্লাহর দরবারে, একজন ক্রেতা যদি বুঝতে পারতো তাহলে সে খুব দ্রুতই তোমাকে কিনে নিতো।' এভাবেই এক একজন চাষীকে, এক একজন গ্রামের মানুষকে রাসূল (সা.) ভালোবেসেছিলেন। হাদীসটি আমি হুবহু না বলে ব্যাখ্যা করেই বললাম।


www.nagorikpathagar.org

আর কবিদেরকে যতো ভালোবেসেছিলেন, আমি যতোটুকু পড়াশোনা করেছি তাতে বুঝতে পেরেছি যে, সত্যিকার অর্থেই যে কবিদের একটা আলাদা মূল্য, আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তা রাসূল (সা.)ই শুধু আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। রাসূল (সা.) শুধু কবিদেরকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন তা-ই নয়। খুব সহজেই তিনি যে এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছেন, সে ব্যাপারে তিনি কথাও বলেছিলেন।

শুদ্ধতম শব্দ আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। একজন মানুষই শুধু তার নিজের সম্পর্কে শুদ্ধতম কথাটি বলেছিলেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'আনা আফসাহুল আরব। ওয়া ইন্নি মিন বনু সাদ বিন বকর'। 'আমি আরবদের মধ্যে শুদ্ধতম এবং আমি বনু সাদ বিন বকর সম্প্রদায়ের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছি। দু'টো কথা তিনি বলেছেন, 'আমি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বনু সাদ বিন বকর গোত্রে লালিত পালিত হয়েছি। বনু সাদ বিন বকরের গোত্র হলো সম্মানিতা হালিমার গোত্র। এই গোত্রটি শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতো। আর কুরাইশদের সাহিত্যজ্ঞান, সাহিত্যের ব্যাপারে তাদের পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞা ছিলো অসাধারণ। যার ফলে চিন্তা, চেতনা ও ভাবনা এবং ভাষার দিক থেকে রাসূল (সা.) ছিলেন অসাধারণ। রাসূল (সা.) যখন বক্তব্য রাখতেন তখন সাহাবীরা অবাক হয়ে যেতেন। একবার আবুবকর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চেয়ে সুন্দরভাবে কথা বলার মতো আর একজনও আরববাসী নেই। এমন কোনো মানুষ নেই, যে সুন্দরভাবে আপনার মতো কথা বলতে পারে। আপনি তা শিখলেন কোথায়? কিভাবে আয়ত্ত করলেন এই মোহনীয় ক্ষমতা-ভাষার মধ্যে এবং ভাষার ব্যবহারের মধ্যে? রাসূল (সা.) তার জবাবে বলেছিলেন, আমার ওপরে কোরআন নাজিল হয়েছে না?

পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী একজন ডক্টর এই 'বনু সাদ বিন বকর' গোত্র সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। সেটি অনুবাদ হওয়া দরকার, চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে অনুবাদ করা যায়। রাসূল (সা.) এর সাহিত্য ধারণা সম্পর্কিত আলোচনার জন্যে যে পরিসর দরকার, সে পরিসর এখানে আমাদের নেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে এসব সম্পর্কে যদিও আলোচনা করা যায়।

রাসূল (সা.) কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, যে দু'টি মনোরম আচরণে কোনো বিশ্বাসীকে আল্লাহ সাজিয়ে থাকেন, কবিতা তার একটি। অর্থাৎ কোনো বিশ্বাসীকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্যে কবিতার অপরিহার্যতাকে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন এবং খুবই উচ্চকণ্ঠেই বলেছিলেন। রাসূল (সা.) আরো বলেছিলেন আরবদের সম্পর্কে: 'আরবদের সুসংঘবদ্ধ কথা হলো এদের


www.nagorikpathagar.org

কবিতা। কবিতার ভাষায় কিছু চাইলে ওদের মন ভরে যায়। ওদের রোষের আগুন নির্বাপিত করে কবিতার অন্তসলিলা প্রভাব।' আরবদের যে মনোবৃত্তি, আরবদের যে চেতনা, যে সৌন্দর্যবোধ তা রাসূলের চেয়ে চমৎকারভাবে আর কেউ বলতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। আরবদের যে রাগী স্বভাব, আরবদের যে মেজাজ, আরবদের যে বেপরোয়াভাব তাঁকে রহিত করতে পারে কবিতা। রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, 'উট তার সকরুণ ক্রন্দন থামাতে পারে, কিন্তু আরবরা তাদের কবিতার সুর থামাতে পারে না।' কবিতার প্রতি আরবদের যে টান, যে মমতা; সে মমতা কখনো নিঃশেষ হতে পারে না। এভাবে রাসূলে কারিম (সা.) আরবদের কবিতা প্রেমকে আবিষ্কার করেছিলেন। কী ধরনের কবিতা রাসূল পছন্দ করতেন, সে সম্পর্কেও তিনি কথা বলেছেন, 'কারো মর্জির তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে গ্রথিত কথামালা মানুষকে দান করে অসীম মর্যাদা।

আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা কোনো কথা তাকে পৌঁছে দেবে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে।' লেখকদের এটা জানা উচিত, সেই লেখকই অপরিসীম মর্যাদা লাভ করতে পারে, যে কারো তোয়াক্কা না করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে লেখে। আর আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে শুধু মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য লেখা, কোনো কথা বলা তাকে জাহান্নামের দরোজায় পৌঁছে দেবে। যে-কোনো কিছু রচনা করার সময় আল্লাহর শাস্তির কথা চিন্তা করে না, তার লেখাই তাঁকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।

রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, 'শুধু মানুষের হৃদয় কেড়ে নেবার জন্য যে মনোহর কথা বানানো শেখে, কিয়ামতের মাঠে তার কোন বিনিময় গৃহীত হবে না।

শালীনতা সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে, কবিতা ও সাধারণ কথা-বার্তার বিচার একই নীতিতে হবে। অনাবিল এবং পরিমল কথাবার্তার যে মূল্য, শ্লীল কবিতার সেই মূল্য। অশ্লীল বক্তব্য যেমন অপ্রীতিকর, অশ্লীল কবিতাও তেমন। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) আরো বলেছেন, 'যে ইসলাম গ্রহণের পরও অশ্লীল কাব্য ছাড়তে পারলো না, সে যেনো তার জিভটাকে নষ্ট করে ফেললো।' তিনি আরো বলেছেন, 'মুমিন কোনোদিন মিথ্যারোপ করতে পারে না, পারে না অভিশাপ দিতে; সে কখনও অশ্লীল হতে পারে না, পারে না নির্লজ্জ হতে।' এভাবেই রাসূলে করিম (সা.) সব কিছুকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মধ্যপ্রাচ্যের একজন আরবি ভাষার পণ্ডিত, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডা. ওয়ালিদ কাসসাব সাহিত্য সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর বেশ কিছু বক্তব্য ও তথ্য আবিষ্কার করেছেন। সাহিত্য সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রাসূলের রয়েছে। এগুলো পড়ে আমি বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। রাসূল (সা.) পুরুষ কবিদের কবিতাই শুনেছেন তা নয়।


www.nagorikpathagar.org

তিনি মহিলা কবিদের কবিতাও শুনতেন। একজন মহিলা কবি যার নাম হচ্ছে কবি খানসা (রা.)। তিনি ছিলেন আরবের একজন নামকরা মহিলা কবি। কবি খানসাকে (রা.) কখনো কখনো রাসূল (সা.) বলতেন, 'কবিতা শোনাও তো দেখি।' এই মহিলা কবি খানসা (রা.) রাসূল (সা.) কে কবিতা শোনাতেন।

বদরের যুদ্ধে যখন সাহাবীরা জয় লাভ করলেন, বদরের যুদ্ধের বিজয়ের সুসংবাদ শহরে পৌছে দেবার জন্যে দু'জন কবিকে বেছে নিয়েছিলেন; একজন হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. আরেকজন খুব সম্ভব কা'ব বিন মালিক (রা.)। এ দু'জনকে বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ পৌছে দেবার জন্য রাসূল (সা.) নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মক্কা যখন বিজিত হলো, রাসূল (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেছেন, সে সময়ও একজন কবিকে সঙ্গী নিয়োজিত করেন তিনি। আর তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বদরের যুদ্ধের সুসংবাদ পৌছে দেবার জন্যেও রাসূল (সা.) কবিকে সাথে রেখেছেন, আবার মক্কা বিজয়ের সময়েও রাসূল (সা.) একজন কবিকে তাঁর পাশে পাশে রেখেছেন। এই আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. অত্যন্ত সাহসী মানুষ ছিলেন, যোদ্ধা ছিলেন, সেনাপতি ছিলেন। রাসূল (সা.) তাঁর উপর এতোটা আস্থা স্থাপন করেছিলেন যে, যখন রাসূল (সা.) বাইরে গেছেন যুদ্ধ বা রাষ্ট্রীয় সফরে, তখন ইসলামী রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত প্রধান হিসাবে কখনো কখনো রেখে গেছেন তাঁকে। শুধু কথায় রাসূল (সা.) কবিদের মর্যাদা দেননি, কার্যকারণগত ব্যাপারেও রাসূল (সা.) কবিদেরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। কবিদেরকে পাগল, উৎকট ব্যবসায়ী কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হিসেবে রাসূল (সা.) মনে করেননি। আজকে যারা কবিদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে মনে করে তারা রাসূল (সা.) এর সুন্নতকে অবহেলা করছে। তারা কিছুই জানে না; অথচ সবকিছু জানে বলে মানুষের কাছে নিজেদেরকে পরিচিত করছে। এসব আহাম্মকদের কবল থেকে জাতি যেদিন রেহাই পাবে, সেদিন জাতির সত্যিকারের মুক্তি আসবে বলে আমাদের মনে হয়।

রাসূল (সা.) এতোটা বিবেচনাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন যে, কোন কবি ভালো কবিতা লিখতে পারে- সে খবরও তাঁর ছিলো। যখন বাতিলপন্থী কবিরা ও ইসলামের দুশমনরা ইসলামের বিরুদ্ধে, নবীর বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে লাগাতার কবিতা লিখে যাচ্ছে ও লাগাতার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তসলিমা নাসরিনদের মতো লাগাতার প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। লাগাতার বিভিন্ন জায়গায় তারা কথা বলে বেড়াচ্ছে। এই রকম সময় রাসূল (সা.)-কে একজন সাহাবী ধরে বসলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর জবাব দেওয়া উচিত। তখন রাসূল (সা.) বলছেন- 'তোমরা যারা তলোয়ার দিয়ে সাহায্য করেছো, তোমাদেরকে কে নিষেধ করেছে, কবিতা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে? তারপর আলি (রা.) এলেন। আলি (রা.) আসার


www.nagorikpathagar.org

পর রাসূল (সা.) বললেন, আলিকে দিয়ে সম্ভব নয়। তারপর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) এলেন। রাসূল (সা.) বললেন, রাওয়াহাকে দিয়েও সম্ভব নয়। তারপর এলেন হাসসান বিন সাবিত (রা.)। হাসসান বিন সাবিত রা. আসার পর রাসূল (সা.) খুশি হয়ে বললেন, 'তোমাকে কে পাঠালো ভাই? আর তোমার কবিতার শব্দ তো সিংহের লেজের মতো।' অর্থাৎ তার কাজ তো সিংহের কাজের মতো, সিংহের গর্জনের মতো। তার উচ্চারণ বিষধর সর্পের মতো যা ছোবল মারে। আমার কি মনে হয় জানেন? হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) যেনো লজ্জায় জিভ কামড়ে দিচ্ছেন। লজ্জায় রেঙ্গে গেছে তার গাল দুটো। আসলে কবিদের স্বভাবত লজ্জা একটু বেশি থাকে। জিহ্বা নাড়াতে নাড়াতে তিনি বলছেন, 'আমার একটা জিহ্বাই যথেষ্ট এসব কিছুর মোকাবেলা করার জন্যে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, হাস্‌সান বিন সাবিতের জন্য রাসূল (সা.) মসজিদের ভেতরে অর্থাৎ মসজিদে নববীতে কবিতা পড়ার জন্যে আলাদা মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন। যে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন, সে মঞ্চ রাসূলের জন্যে ছিলো। কিন্তু কবি হাসসান বিন সাবিতের (রা.) জন্যে আলাদা একটি মঞ্চ করে দিয়েছিলেন রাসূল (সা.)। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে কোনো এক সময় হাসসান বিন সাবিত (রা.) দলবল নিয়ে মসজিদে নববীতে কবিতা পড়ছিলেন। খলিফা ওমর ফারুক (রা.) পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

হৈ চৈ দেখে চিৎকার করে উঠলেন, মসজিদের মধ্যে আবার এ ধরনের শোরগোল কেনো? বর্তমান সময়ের ভাষা অনুযায়ী দুনিয়াদারী কাজ। হাস্‌সান বিন সাবিত দাঁড়িয়ে বলেন, 'তুমি কে কথা বলার? আমি হচ্ছি সেই হাসসান, যার জন্যে রাসূল (সা.) নিজে মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি নবীর মসজিদের ভেতরে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছি। তুমি কে কথা বলার? খলিফা ওমর (রা.) মাফ চেয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন।

কবিরা অনেক সময় একটু গীবতপ্রিয় হয়। এর দোষ ওর কাছে, ওর দোষ এর কাছে লাগানো তাদের একটা অভ্যাস থাকে সচারাচর। এ ব্যাপারে কবিরা একটু পারঙ্গম আদিকাল থেকেই।

আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে কিছু কথা উঠলো। আয়েশার (রা.) চরিত্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করে কিছু সাহাবী কথা বলা শুরু করলেন। হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.)ও। তারপর যখন আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রের স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো, সবাই এসে মাফ চাইলেন। হাসসান বিন সাবিত (রা.) ও এসে মাফ চাইলেন এবং লজ্জিত হলেন। আয়েশা (রা.) এই অপরাধী কবিকে কিভাবে সম্মান দিয়েছেন এবার সেটা শুনুন।


www.nagorikpathagar.org

হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্রের বিরুদ্ধে যে কবি কুৎসা রটনা করে বেড়িয়েছে, সেই কবি যখন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সামনে এলেন, তখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো '.......... এই হচ্ছে সেই কবি।' আয়েশা (রা.) বললেন 'চুপ করো। হাসসান বিন সাবিত তার কবিতা দিয়ে ইসলাম এবং তার নবীর প্রতি যে খেদমত করেছে সেই খেদমতের কথা স্মরণ করো।'

এই আয়েশা (রা.) সাড়ে চার হাজারের মতো কবিতা মুখস্থ রেখেছিলেন। দোলনায় বসেই ইমরুল কায়েসের কবিতা মুখস্থ করেছিলেন পিতার কাছ থেকে।

একদা আয়েশা (রা.) যখন শুনলেন, তাঁর আব্বা ইন্তেকাল করছেন, তাড়াতাড়ি তিনি তার পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কানে কবিতা পড়তে শুরু করলেন। সাহাবীরা বলছেন, 'মরে যাচ্ছে একটা মানুষ, তার সামনে কি এখন কবিতা পড়ার সময়? এখন তো কোরআন পড়ার সময়।' আয়েশা (রা.) কেঁদে দিয়ে বলেছেন, 'আব্বা কবিতা খুব পছন্দ করতেন। আমার ধারণা, এই কষ্টের মুহূর্তে যদি আব্বাকে কবিতা শোনানো যায় আব্বা একটু আরাম পাবেন।' এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো রাসূল (সা.) এর স্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর পিতার কাব্যপ্রেম সম্পর্কে কা'ব বিন মালিক (রা.) একবার রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কবিতা সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'ইন্নাল মুমিনা য়ুজাহেদু ফি সাইফিহি ওয়া লিসানিহ।' অর্থাৎ একজন মুমিন যুদ্ধ করে তরবারী দিয়ে, ভাষা দিয়ে। রাসূলে আকরাম (সা.)-এর কবি ও কবিতার প্রতি যে ভালোবাসা, সে ভালোবাসা সম্পর্কে ড. ওয়ালিদ কাসসাব ৬৪ টি হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

আজকে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে রাসূলের সমস্ত দিক ও বিভাগকে আবিষ্কার করা। রাসূল (সা.)-এর যে বিশ্বাস, রাসূল (সা.)-এর যে ধারণা, রাসূল (সা.)-এর যে উক্তি, রাসূল (সা.)-এর যে বক্তব্য, সে বক্তব্য সরাসরি আবিষ্কার করা। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে আমাদের দেশেরই কয়েকজন ছাত্র। যাদের কাছে মনে হয়, আরবি বাংলা ভাষার চেয়ে সহজ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে সালাম আজাদী অন্যতম। আমার সাথে তাদের চিঠির আদান-প্রদান হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি তাদের পাঠানো একটি চিঠি পড়ে। লিখেছেন একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে। গল্প সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর যে দিক নির্দেশনা, সে দিকনির্দেশনা সম্পর্কে। আল্লাহর রাসূল কতোটা আধুনিক ছিলেন যে, সেই সময়ে গল্প সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখে গেছেন। আজকের দুনিয়াতে সাহিত্য ক্ষেত্রে গল্পের প্রাধান্য আমরা লক্ষ্য করছি।


www.nagorikpathagar.org

গল্প সম্পর্কে বিশ্ববাসীর আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্পের যে গুরুত্ব, সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সামনে রেখে রাসূল (সা.)-এর যে বক্তব্য, যে উক্তি সেগুলো যদি আজকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি তাহলে সত্যিকার অর্থে আমরা এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করবো- সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, আলোচনা জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, সে দিক-নির্দেশনাই হচ্ছে সত্য-সুন্দরের ক্ষেত্রে যথার্থ সাধনার পদ্ধতি ও নীতিমালা।

শুধু ওই প্রবন্ধই নয়, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে বড় বড় বেশ কয়েকটি বই ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইগুলো আমাদের দেশে এসে গেলে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবো, আমরা এই আস্থা স্থাপন করতে পারবো, রাসূলের সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কিত ভাষণ এবং অভিভাষণ, বক্তব্য এবং বাণী ও দিক-নির্দেশনা কতো চমৎকার। কতো অমূল্য।

আমি কার্লাইলের একটা বিষয় কিছু দিন আগে পড়ছিলোম। পড়তে গিয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, যখন ইউরোপে রাসূল (সা.) সম্পর্কে মনীষীরা নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে তখন কার্লাইল খুব বলিষ্ঠভাবে রাসূল (সা.)-এর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিলেন। যখন রাসূলের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দুনিয়ার ইউরোপের ও বৃটেনের বুদ্ধিজীবীরা কুৎসা ও কটূক্তি করছে তার জবাবের জন্য টমাস কার্লাইল দাঁড়িয়েছেন। টমাস কার্লাইল অসম্ভব সাহসিকতার সাথে পাশ্চাত্য মনীষীদের কটূক্তির জবাব দিয়েছিলেন।

জার্মানীর মহাকবি গ্যেটে তো মহানবী (সা.)-এর প্রতি এতোটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন।

সুন্দরভাবে মহানবীর চরিত্রকে ব্যাক গ্রাউন্ডে রেখে তৎকালীন আরব পরিস্থিতি এবং মানব সভ্যতায় রাসূল (সা.)-এর ভূমিকা টেনে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু জার্মানীতে কোনো মঞ্চ সে নাটক গ্রহণ করেনি।

অবাক লাগে যখন পড়ি বিধর্মী বিবেকসম্পন্ন পণ্ডিতগণ রাসূল (সা.)-এর স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবা খলিল জিবরানের মতো কবি, যিনি খ্রিস্টান হয়েও রাসূল (সা.)-এর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন; তখন আমাদের সমাজেরই সন্তান, আমাদের দেশেরই সন্তান, দাউদ হায়দারের মতো কবি কি করে লিখতে পারেঃ বধিদ্রুত ছায়াতলে বসে আছে বুদ্ধ, মুহাম্মদ তুখোড় বদমাশ/চোখে মুখে রাজনীতি (নাউজু বিল্লাহ মিন জালিক)।

আজকে যদি রাসূল (সা.)-এর সমস্ত দিক ও বিভাগ জনগণের সামনে পরিষ্কার এবং পরিচিত থাকতো, তবে দাউদ হায়দারের জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতো


www.nagorikpathagar.org

এদেশের মানুষ এবং রাসূল (সা.), কোরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য তসলিমা নাসরীন গোটা দুনিয়াতে দিয়ে বেড়াচ্ছে, রাসূল (সা.) সম্পর্কে আজকের এই সমাজের মানুষ, সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবকরা যদি জানতো রাসূল (সা.) কতোটা আধুনিক ছিলেন, কতোটা মানবকল্যাণকামী প্রগতিশীলতার অধিকারী ছিলেন, যে প্রগতি ও আধুনিকতা মানুষকে প্রকৃত আশরাফুল মাখলুকাত রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বয়ে আনে কল্যাণ, তবে তসলিমা নাসরীনের জায়গা হতো ড্রেনে। ড্রেনের কীটদের খোরাক হতো সে, এটাই হতো তার শেষ পরিণতি।

আমাদের দুঃখ হলো আমরা রাসুলের কোনো দিকই স্পষ্ট করে জানি না। রাসূল (সা.)-এর অর্থনীতি, রাসূল (সা.)-এর রাজনীতি, রাসূল (সা.)-এর সমরনীতি, রাসূল (সা.)-এর খাদ্যনীতি, রাসূল (সা.)-এর পথচলার নীতি, রাসূল (সা.)-এর অভিভাষণের নীতি, রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য রাখার নীতি কোনো একটা নীতি সম্পর্কেও আমাদের খবর নেই। সেই জন্যে এতো বড় একটা জাতি হওয়ার পরও আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতো বড় বিপুল জনশক্তির অধিকারী হবার পরেও আমরা থরথর করে কাঁপছি, প্রতিদিন আমরা ভারতের ভয়ে কাঁপছি, আমরা গোটা দুনিয়ার ভয়ে কাঁপছি। যদি কারো একবার কাঁপন শুরু হয়ে যায়, যে দিক থেকেই ভয় আসে তার উল্টো দিকে গড়িয়েই সে কাঁপতে থাকে। থরথর করে কাঁপতে শুরু করে। আমরা যেদিক থেকেই ভয় আসছে তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে কাঁপছি। এর একটিই মাত্র কারণ, তা হলো রাসূল (সা.) যে ধরনের মানুষ ছিলেন, সেই একজন রাসূল (সা.) কে আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। আমাদের উচিত, যে যেখানে আছি সেখানে দাঁড়িয়েই রাসূল (সা.) কে সার্বিকভাবে উপলব্ধি করা।

যে অধ্যাপক, সে আবিষ্কার করুক রাসূল (সা.)-এর শিক্ষানীতি কী? যে আইনজীবী, সে আবিষ্কার করুক রাসূল (সা.)-এর আইন কী? যে শিল্পী সে আবিষ্কার করুক আঁকিবুঁকির ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর কী সিদ্ধান্ত? সাংবাদিক আবিষ্কার করুক তার সংবাদনীতি, সাহিত্যিক আবিষ্কার করুক তাঁর সাহিত্যনীতি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন, রাসূল (সা.) কে আবিষ্কার করার এবং যে বেদনা অনুভব করেছিলেন কবি নজরুল, সে বেদনা আমাদের মাঝেও আল্লাহ পাক জাগ্রত করুন- সম্ভবত বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে; বাংলার কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে রাসূলকে চিনতে পেরেছিলেন নজরুল। তিনি লিখেছেন-

'পাঠাও বেহেশত হতে হযরত পুনঃ সাম্যের বাণী
আর যে দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি।'


www.nagorikpathagar.org

# আমাদের সংস্কৃতি
# প্রেক্ষিত কবি নজরুল ইসলাম

'আমাদের সংস্কৃতি' সম্পর্কে দু'টি কথা বলবার আগে শুধু সংস্কৃতি নিয়ে একটু পর্যালোচনার দরকার আছে। দরকার আছে এই জন্যে যে, কেবল 'সংস্কৃতি'র-ই বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে 'আমাদের সংস্কৃতি'র একটি অবকাঠামো আপনা-আপনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

'সংস্কৃতি' শব্দটি 'সংস্করণ' না হয় 'সংস্কার' এই বিশেষ্য পদ থেকে সংগঠিত। আর 'সংস্কার' অর্থ হচ্ছে- শুদ্ধিকরণ, শাস্ত্রীয় নীতিমালা এবং অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পবিত্রকরণ, শোধনকরণ অথবা পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধারকরণ, নির্মলকরণ, অলংকরণ, প্রসাধন, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান, মেরামতকরণ ইত্যাদি।

সংস্কৃতির ইংরেজী পরিভাষা হচ্ছে- Culture কালচারের সোজাসুজি অর্থ চাষ করা, কর্ষণ করা। সেই জন্য চাষকৃত জমিকে বলা হয় Cultured Land আবার পরিমার্জিত মানুষকে বলা হয় Cultured man.

'সাকাফাহ' সংস্কৃতির আরবি পরিভাষা। সফল হওয়া, শিক্ষা পাওয়া, প্রশিক্ষণ পাওয়া ইত্যিাদি হচ্ছে সাকাফাহ্‌র বাংলা অর্থ।

## দুই.

উপরের বিশ্লেষণের ভেতর দিয়ে অন্তত এতটুকু পরিষ্কার হলো- সংস্কৃতি একটি বিশুদ্ধ বিষয় বরং একটি শুদ্ধতম তাৎপর্যকে সে মান্য করে। সে আরো মান্য করে একটি বহিঃপ্রকাশের এবং একটি অন্তঃপ্রকাশের প্রগাঢ়তাকে- যা মানুষের যথার্থ পরিচিতি। আর 'মানুষ হিসেবে মানুষের আসল পরিচয়ই তার সংস্কৃতি।'



www.nagorikpathagar.org

সেই জন্য বলা হয়েছে :

'যে ব্যক্তি বা সমষ্টি আপন চিন্তা- চেতনা ও জীবনধারার মধ্য দিয়ে নিজেকে সজ্জিত, নন্দিত, পরিশীলিত ও সমাদৃত করতে পারে- তাঁকে বলা হয় সংস্কৃতিবান ও সভ্য। সৃষ্টির সেরা মানুষ। তার এ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখা ও এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতির।'

কেননা, Culture is the development of inner characteristics of a nation which differentiate it from other nations.

আবারঃ Culture is that process through which the inner qualities develop.

তেমনিভাবে : Culture starts from faith a particular faith creates special qualities.

অবশ্য শিল্প এবং সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আছেঃ

Art is not Culture, art is the expression of idels in various forms- poetry, music, dance, architecture, painting etc.

অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবেঃ To call dance and music culture is to give a good name to bad things.

এইচ. জে. লাস্কির একটি মন্তব্য খুব অর্থময়ঃ Culture is that what we are.

সংস্কৃতি সম্পর্কে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর ভাবনাকে সামনে রাখতে পারি। তিনি বলেন-

১. নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, চিত্রিত করো- এই কালচারের আদেশ...
২. 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচতে শেখা।'
৩. 'সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ- নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।'

সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বদরুদ্দীন ওমর বলেন- জীবনচর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোকতাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য- ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজ-কর্ম, সবকিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।

ইউনেস্কো সম্মেলনে একটি চমৎকার সংজ্ঞা গ্রহণ করেছিলো জাতিসংঘঃ

'ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা এবং কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প


www.nagorikpathagar.org

ও সাহিত্যই একমাত্র সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত বস্তু নয়, মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।'

সংস্কৃতি মানুষকে নিজের সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করে। আমরা যে বিশেষভাবে যুক্তিবাদী মানুষ, যে মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে এবং ন্যায়ের প্রতি আনুগত্য আছে তা আমরা অনুভব করতে পারি সংস্কৃতির মাধ্যমে। সংস্কৃতির মাধ্যমেই আমরা মূল্য নিরুপণ করি এবং ভালো-মন্দের মধ্যে নির্বাচন করতে শিখি। সংস্কৃতির মাধ্যমেই মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে, আত্মসচেতন হয়, নিজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে বোধ জন্মে, নিজের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে, অনবরত নিজের সীমা অতিক্রম করে দক্ষতা অর্জন করে।'

## তিন.

সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি তাৎক্ষণিক রেখাচিত্র আঁকবার জন্যে আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু নজরুলের সমূহ-সৌজন্যে আমাদের সংস্কৃতি বোঝবার জন্যে ঐ কবি কাজীরই দ্বারস্থ হওয়া উচিত। দ্বারস্থ হওয়া উচিত তাঁর রচনার, তাঁর ভাষণ-অভিভাষণের।

'ইসলামে সত্যকার প্রাণশক্তি গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ।

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমি স্বীকার করি, যারা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তারাও স্বীকার করেন, ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য কেনো, মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে।' -কাজী নজরুল ইসলামের পত্র। প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁকে লেখা।

আমাদের সংস্কৃতি কি আর কবি নজরুলের সংস্কৃতিই বা কি : তা বোঝবার জন্য ঐ একটি উদ্ধৃতিই যথেষ্ট।

একজন পাকা রাঁধুনীর জন্যে সারা হাঁড়ির ভাত টিপে টিপে সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে পরখ করার দরকার হয় না; একজন বোদ্ধা পাঠকের ক্ষেত্রেও উল্লেখিত তথ্য সূত্রটিই তেমনি কোনো কাজে লাগতে পারে। তবুও কবি কাজীর আরো কিছু বক্তব্য আমরা তুলে ধরলামঃ

১. আমি চাই, এই পর্বতের বিবর থেকে বেরিয়ে আসুক তাজা তরুণ মুসলিম, যেমন করে শীতের শেষে বেরিয়ে আসে জরার খোলস ছেড়ে বিষধর ভুজঙ্গের দল। বিশ্বের এই নব অভ্যুদয়-দিনে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলুক আমার নিদ্রোত্থিত ভাইরা। -মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা।


www.nagorikpathagar.org

২. আমাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান-আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রী এসে এখানে ভীড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আজ শুধু শোধই করবো না ঋণ দানও করবো, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করবো- এই হোক আপনাদের চরম সাধনা। হাতের তালু আমাদের শূন্য পানে তুলে ধরেছি এতোদিন, সে লজ্জা আজ আমরা পরিশোধ করবো। আজ আমাদের হাত উপুড় করবার দিন এসেছে। তা যদি না পারি সমুদ্র বেশি দূরে নয়, আমাদের এ লজ্জার পরিসমাপ্তি যেনো তারি অতল জলে হয়ে যায় চিরদিনের তরে! আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতনের মতো আমাদেরও কালচারের, সভ্যতার জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমির ভিত্তি স্থাপনের মহৎ ভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমাদের মতো শত শত তরুণ খাদেম তাদের সকল শক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা জীবন মঞ্জলির মতো করে আপনাদের সে উদ্যমের পায়ে অর্ঘ্য দেবে। -মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম শুধু স্বপ্নই দেখেননি, বরং শান্তি-নিকেতনের মতো আরেকটি সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ করে ছিলেন। যে কেন্দ্রটি হবে আমাদের কেন্দ্র অর্থাৎ যেখানে চর্চা হবে আমাদের ঐতিহ্যের, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের। সেই কারণে তিনি নিজের জাতিকে সতর্ক করেছিলেন এই ভাবে:

'বাংলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির সঙ্গে যতো পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম, সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।'


www.nagorikpathagar.org

# বাংলা নামের উৎপত্তি : কয়েকটি বিবেচনা

[যাবতীয় অস্তিত্বেরই নিঃসন্দেহে একটি ধারাবাহিকতা আছে; ঐতিহ্যের। অস্তিত্ব ঐতিহ্যের সেই নদী-বহতা- ধারাবাহিকতার স্বতঃস্ফূর্ত অনুসন্ধান মূলত প্রেরণাদায়ী বলেই এক্ষেত্রে আমাদের যত্নময় শুভ প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন আছে। আমরা এখানে একটি শব্দেরই উৎসমূল উদ্ধার-উদঘাটনে খানিকটা চেষ্টা করছি মাত্র।]

১৫৯৯ খৃস্টাব্দের একটি চিঠিতে Bengalla শব্দের উল্লেখ আছে। যা দেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। চিঠিটি ফার্নন্দেজ নামের একজন পর্তুগিজের বলে গবেষকরা মনে করেন।

ঐ শব্দটি কি হঠাৎ একজন বিদেশী তার মতো করেই ব্যবহার করলেন, না-কি এর একটি ইতিহাস আছে? এ-ব্যাপারে আমরা বৌদ্ধ সাহিত্যের 'মিলিন্দ প্রশ্নহো' গ্রন্থের একটি পাঠ বিবেচনা করতে পারি, যেখানে 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ আছে। মহাভারতেও এ-শব্দটি উচ্চারিত হতে দেখি, 'বঙ্গ' অঙ্গ মগধ মৎসহ সমৃদ্ধহ বাশী কোশলহ' [বনপর্ব। মহাভারত। ২,৩০] এ বাণীর মাধ্যমে। ঋগ্বেদের ঐতরের অরণ্যকেও একটি শ্লোকে 'বঙ্গ' শব্দটি এসেছে, 'বৈতা ইমাঃ প্রজস্তিস্র সত্যায়মায়ংস্তানী মানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদঃ' এ-ভাবে। কিন্তু ভুসুকু বা শান্তিদেবের 'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ে' 'বঙ্গালে' শব্দটি পাই নিত্য ব্যবহৃত শব্দের কাছাকাছি উচ্চারণের মতো, 'বজ্রবত্রাইব পাড়ী পউআ-খালে বাহিউ অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুডিও আজ্জিভুস বঙ্গালী ভইলি নিঅ ঘরিণী চন্তালী লেলী।'

কিছু কিছু শিলালিপিতেও 'বঙ্গ' এর উল্লেখ দেখা যায়। প্রতীহার রাজ ভোজের শিলালিপিতে 'বাঙ্গালী' বলা হয়েছে বঙ্গপতির সেনাদলকে। অবশ্য তিরুমলয় পর্বতের শিলালিপিতে পাওয়া গেছে 'বঙ্গালদেশ' নামটি।

এরিয়ান, ডাইওডোরাস প্রমুখ প্রাচীন লেখকদের গ্রন্থে 'গঙ্গাবিজয়' নামক একটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টিয় প্রথম শতকের 'গ্রিক' ভৌগলিক টলেমি



www.nagorikpathagar.org

লিখেছেন, 'গঙ্গা মোহনার সব অঞ্চল জুড়েই গঙ্গারিডীরা বাস করে। তাদের রাজধানী 'সঙ্গা' খ্যাতিসম্পন্ন এক আন্তর্জাতিক বন্দর। এখানকার তৈরি সূক্ষ্ম মসলিন ও প্রবাল রত্নাদি পশ্চিমদেশে রপ্তানী হয়। তাদের মতো পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধশালী জাতি ভারতে আর নাই।' কোনো কোনো গবেষকের মতে 'গঙ্গাবিজয়' রাজ্যের রাজধানীর নাম হচ্ছে 'গাঙ্গেয় নগর'। বর্তমানের বাংলাদেশ হচ্ছে 'গঙ্গাবিজয়' রাজ্য আর সোনারগাঁও হচ্ছে তার রাজধানী 'গাঙ্গেয় নগর'। খৃস্টিয় একাদশ শতাব্দীর জৈনাচার্য হেমচন্দ্রসুরী তার অভিধান চিন্তমনিতে 'হরিকেল' শব্দটিকে বঙ্গের নামান্তর বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বাংলাদেশ যে এক সময় হরিকেল নামেও পরিচিত ছিলো তা এ থেকে বোঝা যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর একটি অনুশাসনে দেখা যায়, 'বঙ্গালবল' এমন একটি উল্লেখ। সুতরাং একটি দেশের নামও সে সময় কি হতে পারে তা ঐ শব্দটিকে সামনে রেখে অনুমান করা যেতে পারে। খৃস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ প্রস্তর স্তম্ভলিপিতে সম্ভবত প্রথম উল্লেখিত হয়েছে 'সমতট' নামটি। এ সম্পর্কে মনোজ্ঞ বিবরণ আছে চিনা পরিব্রাজক ইউয়ান চোয়াং সেঙ্গচি, ইৎসির ভ্রমণ বৃত্তান্তে। ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মতে ইউয়ান চোয়াং সমতটের রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁওকেই নির্দেশ করেছেন।

একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ, তাঞ্জোরে প্রাপ্ত একটি প্রশস্তিতে 'বঙ্গলম' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গলম শব্দ থেকেই আরবি ভাষায় বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে- অনেকে মনে করেন। ষোড়শ শতাব্দির কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী তার একটি কবিতায়, নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বাঙ্গাল গাঙ্গুলী গাঁই পিত গদাধর'। এখানে বাঙ্গাল শব্দটি ভাষা সম্পর্কিত নয়, বাংলাদেশের অধিবাসী তাৎপর্যেই।

বঙ্গ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে... মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ হরি বংশে বর্ণিত রয়েছে যে, দৈত্যকুলের বিষ্ণুভক্ত ধার্মিক রাজা প্রহলাদের পৌত্র বলী ছিলেন একজন পরাক্রান্ত মহাবলশালী রাজা। তিনি শুধু সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরই ছিলেন না, বরং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজিত করে তিনি স্বর্গলোকেও স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র ও বরুণ বাহুবলে পরাজিত হলেও কূটকৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে মহাবলশালী পরম ধার্মিক এবং দানবীর বলীকে স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করে পৃথিবীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য করেন। বলী পৃথিবী ছেড়ে যখন পাতাল পুরীতে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণাকে নিয়ে বাস করছিলেন তখন একদিন স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক বিতাড়িত দীর্ঘতমা নামক এক অতি দুশ্চরিত্র অন্ধ ঋষিকে ভেলায় করে নদী পথে ভেসে যেতে দেখলেন। বলী ছিলেন নিঃসন্তান। সুতরাং তিনি এই অন্ধ ঋষিকে নিয়ে এলেন এবং সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্র


www.nagorikpathagar.org

উৎপাদনের জন্য তাঁকে নিয়োগ করলেন। সুদেষ্ণার গর্ভে এই লম্পট ঋষির ঔরষে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তাঁদের নাম হলো অংগ, বংগ, কলিংগ, পুন্ড্র ও সুম্ম। অঙ্গ হলো বর্তমান ভাগলপুর জেলা। বংগ হলো বর্তমান বাংলাদেশ। পুণ্ড্র পরে গৌড় বা বরেন্দ্রভূমি নামে পরিচিত হলেও বর্তমানের উত্তর বংগকে বোঝায়। সুম্ম পবরবর্তীকালে রাঢ় দেশ এবং বর্তমানের পশ্চিম বংগ। কলিংগের. বর্তমান নাম উড়িষ্যা।

যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখেছেন, 'রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই তাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পৌরাণিক সময় হইতে সে বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত বর্তমান সময়ে যাহা পূর্ব বংগ নামে অভিহিত কেবল তাহাকেই বংগ বলিত।'

প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলো। 'উত্তর বঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপি, দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিলো।' উত্তর ও পশ্চিমের কতোকাংশ আবার গৌড় নামে বিখ্যাত ছিলো ।

পণ্ডিত ব্যক্তিদের অনেকে অনুমান করেছেন, 'বঙ্গ' যা থেকে এসেছে বাঙ্গালা দেশের নাম– শব্দটি মূলে ছিলো চিনতিব্বতী গোষ্ঠীর শব্দ। আর এই বঙ্গ শব্দের 'অং' অংশের গঙ্গা, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং ইত্যাদি নদী-নামের সম্বন্ধ ধরে তারা ধারণা করেছেন যে, শব্দটির অর্থ ছিলো জলাভূমি।

আবার কেউ কেউ নির্দেশ করে থাকেন যে, 'বঙ্গপাল' থেকে বঙ্গাল শব্দের বুৎপত্তি। 'বঙ্গপাল' শব্দটি অধিচ্ছত্র রাজার উপাধি বলে উল্লেখিত হয়েছে উত্তর প্রদেশের কৌশামির কাছে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে। আর একটি সূত্র বলেছে, কারো কারো মতে তিব্বতীর 'Bans' [অর্থাৎ জলাময় স্যাঁত স্যাঁতে] শব্দ থেকে বঙ্গ শব্দের উৎপত্তি। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে আবুল ফজল লিখেছেন, 'নামি আসলি বাংলা বংগে' অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত নাম বঙ্গ।

মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশ একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা হইতেই ইউরোপীয়গণের 'বেঙ্গলা' ও 'বেঙ্গল' নামের উৎপত্তি। মুসলমান বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামের প্রচলন প্রাক-মুসলমান আমলেও ছিলো। কিন্তু বঙ্গ বা বাঙ্গালা নাম দ্বারা তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে বোঝাতো।'

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন: বাংলার পাল রাজাদের আমলে বাঙ্গালা শব্দ দ্বারা সারা বাংলাদেশকে বোঝাতো। কিন্তু পাল আমলের শিলালিপি পরীক্ষা করার পর ড. এ.এইচ দানী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, পাল আমলের শিলালিপিতে বঙ্গ বা


www.nagorikpathagar.org

বাঙ্গালা দ্বারা বাংলা দেশের শুধু একাংশকেই নির্দেশ করা হয়েছে। ড. এ.এইচ. দানী আর. রায় চৌধুরীর সিদ্ধান্ত অনুরূপ।

হিন্দু এবং মুসলমান আমলের সূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সুলতান-শামস উদ-দিন ইলিয়াস শাহ্ যখন সারা বাংলাদেশকে একীভূত করলেন, 'বাঙ্গালা' শব্দ দ্বারা তখন থেকেই সমস্ত বাংলাদেশ চিহ্নিত হতে থাকে। অন্য কথায় স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের নাম মুসলমান আমলে মুসলমান সুলতান কর্তৃকই প্রদত্ত।

সাম্প্রতিক সময়ের একটি গবেষণা আমাদের আগ্রহকে আরো শাণিত করেছে, ড. মঈনদ্দিন আহমদ খান তার এ মূল্যবান গবেষণায় বলেন, 'শব্দটির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে, সংক্ষেপে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, 'বাংলা' শব্দটি আরবি ব্যাকরণের ধাঁচে মূল 'বাঙ্গালা' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপই ,'বাঙ্গালা' শব্দটি আরবিতে 'বংগাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপে গঠিত। আরবদের জানা মতে, আবহমানকাল থেকে খৃস্টিয় তের শতক পর্যন্ত [বং+আল] তথা 'বংগাল' ছিলো বাংলাদেশের নাম। আরবি কায়দায় তারা বংগাল শব্দটিকে পুংলিঙ্গ হিসাবে, 'মুলক' তথা মুল্‌ক্‌-এর সম্পৃক্ত পুংলিঙ্গ বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করত। তারা এদেশকে বলত 'মুল্‌ক্ বংগাল', কথাটি পুংলিঙ্গ।

কিন্তু খৃস্টিয় ১২০৩ বা ১২০৪ সালে মুসলমানরা এদেশটি বিজয় করে রাষ্ট্রে পরিণত করে। আরবিতে 'মূলক' অর্থাৎ দেশ যদিও পুংলিঙ্গ, রাষ্ট্র তথা দাওলত, সালতানাত্, হুকুমাত ইত্যাদি সবগুলিই স্ত্রীলিঙ্গ। তাই 'সালতানাত' কায়েম হয়ে 'মুলক বংগাল' 'সালতানাত-ই-বাংগালা' এ রূপান্তরিত হয়। ... এক কথায় খৃস্টিয় তের শতকের গোড়ায়, বংগাল দেশের লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে 'বাংগাল'-তে রূপায়িত হয়। আর বাংগালা রাষ্ট্রের বা সালতানাতের অধিবাসীদের ভাষাকে 'লিসান-ই-বাংলা' বা যবান-ই-বাংলা' তথা বাংলা ভাষা বলে অভিহিত করা হয়। উক্ত বিজয়ের পূর্বে 'বাংগালাহ' শব্দটির অস্তিত্ব ছিলো না, অতএব বাংলা নামের ভাষারও কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। ইতোপূর্বে এদেশের রাষ্ট্রীয় নাম কি ছিলো? আর এদেশের ভাষার নামই বা কি ছিলো? এ সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা আমাদের অবহিত করেনি।

সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, 'আ'মরি বাংলা ভাষা'র' 'বাংলা' শব্দটি আরবি ব্যাকরণের নিয়মে উদ্ধৃত। ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মতে, বাংলা নামের ভাষাটি মুসলিম সুলতানদের উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। খৃস্টিয় পনেরো শতক থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত মুসলিম পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্য রচনায় প্রভূত ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করে। এমনকি মুসলিম কবি আলাওল ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে চিহ্নিত হন।


www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এ দেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত মুসলমান জ্ঞানী-গুণীরা মান, ইজ্জত ও প্রতিপত্তি হারিয়ে বিলীয়মান হয়ে পড়ে এবং ইংরেজ খ্রীষ্ট ধর্মযাজকদের সহযোগিতায় ও ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় উদীয়মান হিন্দু পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় এক নতুন বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় যা সাধু ভাষা নামে খ্যাত। উইলিয়াম ক্যারি, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতগণ সাধু ভাষাকে একটি উন্নতমানের লেখ্য ভাষায় রূপায়িত করেন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সাধু ভাষার উদ্যোক্তারা এটাকে 'বাংলা ভাষা' না বলে 'বঙ্গ ভাষা' নামে অভিহিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের মাতৃভাষার উপর রচিত প্রসিদ্ধ কবিতার শিরোনাম 'বঙ্গ ভাষা'। এর অনুকরণে 'বঙ্গানুবাদ' শব্দটি এখনো প্রচলিত রয়েছে। সাধু ভাষাকে 'বঙ্গ ভাষা' বলার একটি কারণ এ হতে পারে যে, উপরোক্ত মনীষীগণের প্রথম তিনজন সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাঁচে বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। এতে 'বাংলা' শব্দটি ব্যাকরণিক নিয়মবহির্ভূত হওয়ায়, বাংলাদেশের সংস্কৃত নাম 'বঙ্গ' কথাটি নিশ্চয়ই তাদের নিকট অধিকতর গ্রহণীয় ছিলো। অন্য একটি কারণ এ-ও হতে পারে যে, ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে এদেশ দখল করার পর, এর নামের রাষ্ট্রীয় সূত্র 'বাংগালা'কে বাদ দিয়ে দেশীয় সূত্রে প্রাপ্ত 'বংগাল' [যা আরবি কথায় বাংগাল অথবা বেংগাল রূপে উচ্চারিত হয়] থেকে 'বেঙ্গল' শব্দটি ইংরেজি ভাষায় গ্রহণ করে, যদিও ইতোপূর্বে তারা পর্তুগিজদের মতো এদেশকে 'বেংগালা' নামে উল্লেখ করতো। আর বাংলাভাষায় তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় নাম 'বাঙ্গালা' বর্জন করে, এটাকে একটি প্রদেশ হিসাবে 'বঙ্গদেশ' বলে চিহ্নিত করে।

সম্ভবত এতে করে তারা একদিকে মুসলমানদের মন থেকে রাষ্ট্রীয় ভাব-ধারণা মুছে দেওয়ার ও অন্যদিকে পূর্ববাংলার প্রাচীন সংস্কৃত নাম 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা সারা বাংলাদেশকে চিহ্নিত করে, হিন্দুদের শ্রদ্ধা করার প্রয়াস পায়। 'বঙ্গ' শব্দটির বিশ্লেষণ কেউ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে শব্দতত্ত্বের নিরিখে এর বিশ্লেষণ অত্যন্ত সহজ। 'বং+আল' থেকে যেমন বংগাল হয়েছে তেমনি 'বং+অ' থেকে 'বংগ' বা 'বঙ্গ' হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এতে শব্দের শেষভাগে উচ্চারণের জোড় পড়ে, যেমন ল্যাটিন ভাষায় হয়ে থাকে। স্থানীয় ভাষায় 'বং' এর অর্থ ছিলো পানি, যেমন- 'গং' ও 'গাং'- এর অর্থ নদী। তাই প্রাচীন স্থানীয় লোকেরা, এদেশকে পানির দেশ, তথা 'বংগাল' অর্থে 'আল বাঁধা পানি বলে অভিহিত করে। অতএব স্থানীয় ভাষায় 'বংগাল' দেশের নাম। অনুরূপভাবে পালিতেও 'বংগাল' দেশের নাম। কিন্তু সংস্কৃতিতে এর উচ্চারণ হয় 'বংগাল অ'। এটা গ্রহণ করলে সংস্কৃত শব্দবিন্যাসে নানা ঝামেলার সৃষ্টি হয়।


www.nagorikpathagar.org

তাই পণ্ডিতেরা বুদ্ধি করে 'বং'-এর অনুস্বরের দ্বিত্ব করে 'বঙ্গ' করে, এটাকে দেশের নাম হিসাবে ধার্য করে এবং 'বংগাল অ' শব্দটি এ দেশের অধিবাসীকে বোঝাবার জন্য প্রয়োগ করে। আবার এটার ভুল সারাবার জন্য ও এদেশকে আর্যায়ন করে নেওয়ার জন্য অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের কিংবদন্তী সৃষ্টি করে। অতএব সংস্কৃতের ক্ষেত্রে বঙ্গের অর্থ শব্দমূলে হবে না, উদ্দেশ্যমূলে হবে।

সুতরাং পশ্চিম বাংলা 'বঙ্গ' কেন? আর পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণ বাংলা 'বাংলা' কেন? এর উত্তর দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। এটা পশ্চিমাংশের সংস্কৃত ও আর্য ভাবাপন্নতার এবং পূর্ব-উত্তর-দক্ষিণাংশের আরবি ও ইসলাম ভাবাপন্নতার পরিচায়ক। একই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, দেশের নাম 'বাঙ্গালা' ও ভাষার নাম 'বাংলা'। ভাষার নাম 'বাঙ্গালা' ও দেশের নাম 'বাংলা' নয়। আর 'বঙ্গ' কথাটি 'গঙ্গা' কথাটির ন্যায় পশ্চিমাংশের কিংবদন্তী মূলে ঐতিহ্যবহ। এটা বর্তমান বাংলাদেশে অনুপ্রেরণা বিবর্জিত ও অনভিপ্রেত। আর শাব্দিক দিক থেকে রাষ্ট্রীয় অর্থে বাংগালা বা বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী কথা দু'টি শুদ্ধ ও সার্বভৌমত্বের অর্থবহ, কিন্তু 'বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশী' কৃত্রিমতা বিজড়িত ও অশুদ্ধ। অনুরূপভাবে 'বাঙলা' কথাটিও 'বাংলার' বিকৃত রূপ বৈ কি।

গবেষক আবদুল মান্নান তালিব 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'রিয়াযুস সালাতীন গ্রন্থ প্রণেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়েন সলিম তার গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসের এ অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। হযরত নুহ আলাইহিস সালামের যুগে যে মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দুনিয়ার কাফেরকুল সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। হযরত নুহ (আ.) আর সাথে তার অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরাই রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যেই পুনরায় দুনিয়ায় মনুষ্য বসতি শুরু হয়। এ মহাপ্লাবনের পর হযরত নুহ (আ.) এর পুত্র হাম তার মহান পিতার অনুমতি নিয়ে পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে মনুষ্য বসতি স্থাপনে মনস্থ করেন। এ উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরণ করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্রের নাম হিন্দ, দ্বিতীয়ের নাম সিন্ধ, তৃতীয়ের নাম হাবাস, চতুর্থের জানাজ, পঞ্চমের বার্বার এবং ষষ্ঠের নাম নিউবাহ। যে সব অঞ্চলে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেন তাদের নামানুসারেই সেসব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। জ্যেষ্ঠ হিন্দের নামানুসারে তার আবাসভূমির নাম হয় হিন্দ। সিন্ধ জ্যেষ্ঠের সঙ্গে এসে সিন্ধুদেশে বসতি স্থাপন করেন। তাই তার নামানুসারে এ দেশের নাম রাখা হয়। হিন্দের চার পুত্র ছিলো: প্রথম পুরব, দ্বিতীয় বং, তৃতীয় দখিন, চতুর্থ নাহার ওয়াল। এরা যে যে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে তাদের নামানুসারেই সেই সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। হিন্দের


www.nagorikpathagar.org

পুত্র দখিনের তিন পুত্র ছিলো এবং দখিন [দাক্ষিণাত্য] তাদের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই তিন পুত্রের নাম সারহাট, কানার ও তালং। দক্ষিণ দেশবাসীরা সবাই এদের বংশধর এবং অদ্যবধি এ তিনটি জাতি এ অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। নাহার ওয়ালের ছিলো তিন পুত্রঃ বাবুজ, কনোজ ও মালরাজ। এদের নামানুসারেই নগরীসমূহের নামকরণ করা হয়েছে।

হিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরবের বিয়াল্লিশটি পুত্র ছিলো। অল্পকালের মধ্যে এদের বংশ বৃদ্ধি হয় ও তারা বিভিন্ন দেশে বসতি গড়ে তোলেন। যখন তাদের সংখ্য অনেক বেশি হয়ে যায় তখন তারা সমগ্র এলাকার পরিচালনার জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করেন।

হিন্দের পুত্র বং [বঙ্গ]- এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন এবং এর 'আল' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ হচ্ছেঃ বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে– সে জন্য জমির চারদিকে বাঁধ দেয়া হতো। প্রাচীনকালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নীচু জমিতে দশ হাত উঁচু ও কুড়ি হাত চওড়া স্তূপ তৈরি করে তার উপর বাড়ি নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো 'বাঙ্গালা'।

'রিয়াযুস সালাতীন' লেখকের এ বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতোটুকু নিহিত রয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভবপর না হলেও এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে সেমিটিক দ্রাবিড় এবং মধ্য এশিয়া থেকেই তাদের আগমন ঘটেছিলো; উপরন্তু বাংলায় আর্যদের অনুপ্রবেশ যে বহু পরবর্তীকালের ঘটনা– এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। কাজেই বং বা বঙ্গ থেকেই বঙ্গাল, বঙ্গালা ও বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে– তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অবশ্য সেমেটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে [বং+আল] বঙাল বা বঙ্গাল [অর্থাৎ বং-এর বংশধর] শব্দের উৎপত্তিটাকে নেহায়েত উড়িয়ে দেয়া যায় না। বিশেষ করে খৃস্টিয় অষ্টম শতকে বা এর পূর্ব থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এদেশটি বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকটবর্তী ছিলো। হতে পারে এ দেশের অধিবাসীরা বঙ্গ-এর যথার্থ আওলাদ হবার দাবীদার ছিলো।

সুতরাং বলা যায়, ইতিহাসের বাঁক ঘুরে ঘুরে, ঐতিহ্যের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে বাংলা শব্দটি আজ আমাদের অপরিহার্য অস্তিত্বের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।


www.nagorikpathagar.org

# স্বাধীনতা : বিষয় ও ভাবনার অনুষঙ্গে

স্বাধীনতা কী? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের জন্যে, এ-ব্যাপারে একটি যথাযথ উপলব্ধির জন্যে, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের একটি মূল্যায়নকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এ বর্ষীয়ান দার্শনিক যথার্থই বলেছেন:

'মানুষের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে যে অবস্থার প্রয়োজন তাকেই স্বাধীনতা বলে।

মূলত স্বাধীনতা হচ্ছে, সবকিছুর ওপরিভাগে নিহিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্ভাসন। মানুষ এ উদ্ভাসন কাম্য করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে- চিন্তায়-ভাবনায়, চলনে-বলনে, পোশাকে-আশাকে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ওঠায় -বসায়, অর্জনে-বর্জনে, খাওয়ায়-দাওয়ায় এককথায় ব্যক্তিক-পারিবারিক, সামাজিক-রাষ্ট্রিক-আন্তর্জাতিক সর্ব রকমের অভিজ্ঞানেই। আসলে আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই স্বাধীনতার ইতিহাসের দিগ-দিগন্ত।

স্বাধীনতা সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার নাম নয় বরং সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে এক ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা। আর উচ্ছৃঙ্খলতা হচ্ছে পশু প্রবৃত্তিরই অন্য নাম। সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলতা আর পশুবৃত্তি সমধর্মী অর্থই প্রক্ষেপ করে বলে স্বাধীনতার প্রেক্ষণ সেখানে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য। সেই কারণে, স্ব-অধীনতা থেকেই যে স্বাধীনতা শব্দটির উৎপত্তি- তা অনুধাবন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যে মানুষের নিজের বলতে একেবারেই কিছু নেই, সে মানুষকে যেমন স্বাধীন মানুষ অথবা আত্মনির্ভরশীল মানুষ বলা যায় না। তেমনি যে জাতির নিজের বলতে কিছুই থাকছে না, সে জাতিকে কি করে স্বাধীন জাতি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে।



www.nagorikpathagar.org

ইংরেজি ভাষাভাষীরা Freedom শব্দটিকে বেছে নিয়েছে কেবল স্বাধীনতার আনন্দ ও স্বভাবে উন্মোচিত করবার জন্যে। তারা মনে করে, যেখানে Freedom আছে, সেখানে Liberty আছে; সেখানে Independence আছে, সেখানে Release আছে, যথাসর্বস্বমুক্তি আছে, নাগরিক অধিকার আছে, আছে- Citizenship স্বাতন্ত্র্য ও Separation. তাহলে যেখানে Liberty - Freedom from restrain নেই, মানে-নানাবিধ দমন থেকে মুক্তি নেই, সেখানে Freedom নেই ; যেখানে স্বাতন্ত্র্য নেই, নেই যথাসর্বস্ব মুক্তি, সেখানে Release নেই Separationও নেই।

উপযুক্ত মূল্যায়ন যদি স্বাধীনতার প্রকীর্তিত সংজ্ঞা হয়, তাহলে একটি দেশের স্বাধীনতা সঠিক অর্থে কোন সময়ে- যথার্থ স্বাধীনতার রূপ পরিগ্রহ করে- তা উপলব্ধি করা যায়। তাই একটি ভূ-খণ্ডের স্বাধীনতাই সম্পন্ন স্বাধীনতা নয়; তাই একটি মানচিত্রের স্বাধীনতা পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা নয়। বরং স্বাধীনতা হচ্ছে, এমন এক মূল্য অর্জন, এমন এক পবিত্র প্রাপ্তি যা একটি জাতির আবেগ-প্রাণবন্যা-উচ্ছ্বল তরঙ্গাভিঘাতকে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করে। সুতরাং যে জাতির স্বনির্বাচিত দর্শন নেই, আদর্শ নেই, রাষ্ট্রব্যবস্থা নেই, শিক্ষাব্যবস্থা নেই, বিচারব্যবস্থা নেই, ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই, সাহিত্য নেই, সংস্কৃতি নেই, নেই নিজস্ব একটি পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর মুক্তধারাস্রোত- সে জাতিকে একটি জাতিও বলা যায় না, নিশ্চয়ই। কেননা জাতিগঠনের সংজ্ঞার মধ্যেও যে সমাধান আছে, সে সমাধানও একটি মুক্ত প্রবাহকে কবুল করেছে। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইবনে খালদুন বলেছেন:

আশারিয়া-সংহতি হচ্ছে জাতি গঠনের শ্রেষ্ঠতম ইতিবাচক উপাদান...'আমরা এক ও অভিন্ন এই মনোভাব ধারণ করার অর্থই হলো সংহতির দিকে যাত্রা করা। ঐ যে এক ও অভিন্ন মনোভাব, ঐ এক ও অভিন্ন মনোভাবই একটি জাতিকে পৌঁছে দেয় তার সামগ্রিক স্বাতন্ত্র্যে, নিজস্ব বিশিষ্টতায়। খালদুনের মতে, একটি জাতির সংহতি নির্ণিত ও নির্মিত হয় তার ধর্মীয় সংবিত্তির ফলে, সাংস্কৃতিক চৈতন্যের ফলে এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। খালদুন অবশ্য ভাষা এবং ভৌগোলিক উপাদানকে অস্বীকার করেননি। যদিও এই দু'টি উপাদান অপরিহার্য কোনো উপাদান নয়। কেননা এই দু'টি উপাদান জাতিগঠনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করে না, সংযোজিত করে না।

জাতিগঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি যেমন অপরিহার্য উপাদান, তেমনি সেই জাতির স্বাধীনতা উপার্জন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অপরিহার্য উপাদান। সুতরাং ভৌগলিক স্বাধীনতা থাকলে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকলে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকলে, শিক্ষা-বাক-বিচার-নীতি-আদর্শ-প্রগতি


www.nagorikpathagar.org

ও প্রবৃদ্ধির স্বাধীনতা থাকলে, এমন কি পানি ও প্রত্যয়ের স্বাধীনতা থাকলে একটি জাতিকে স্বাধীন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এই চিহ্নিত করার ভেতর দিয়েই ফুটে ওঠে স্বাধীনতার পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা।

স্বাধীনতা সম্পন্নতা হারায় কিভাবে? কিভাবে অরক্ষিত হয়? এ ব্যাপারে কয়েকটি বিষয়কে সনাক্ত করা যায়ঃ

ক. যখন কোনো জাতি বিচারের শাসনের অধিকার হারিয়ে ব্যক্তি অথবা দলের দুর্দান্ত দমনের দুর্ভাগ্য অর্জন করে, ঠিক তখনই একটি অরক্ষিত স্বাধীনতা জাতির অন্তর-প্রদেশে ভীতি ও ভাবনার জন্ম দেয়।

খ. ব্যক্তি পূঁজার রাজনীতিও স্বাধীনতার সম্পূর্ণতাকে বিঘ্নিত করে। কেননা কোনোক্রমেই তখন আর একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায় না।

গ. আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন সব সময়ই জনগণকে প্রতারিত করে বলে গণতন্ত্রের স্বভাব ও আনন্দ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুরু হয়ে যায় কেনা-বেচার কুসংস্কার।

ঘ. ব্যক্তি-স্বার্থ উদ্ধারের এক অসম্ভব প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে এমন একশ্রেণীর মীর জাফর তৈরি হতে থাকে, যারা কালক্রমে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বও বিক্রয় করে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এই ধরনের লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি একটি আগ্রাসী শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত হয় বলে অর্জিত স্বাধীনতার সমস্ত সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দেয়।

ঙ. যখন কোনো যুক্তিযুক্ত জাতীয় ইস্যু সুবিধা-ভোগীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে থাকে– স্বাধীনতা তখনও অরক্ষিত অবস্থাকে এড়িয়ে চলতে পারে না। কেননা, এ ধরনের ইস্যু ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে পড়ে কেবলই ওপরে উঠার সিঁড়িতে পরিণত হয়। তাই কখনো কখনো জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মতো একটি গৌরব-উজ্জ্বল অধ্যায়কেও আগ্রাসী শক্তিগুলো জাতি-খণ্ডনের কাজে লাগায়। একটি জাতির ঐক্য বিনষ্ট করাই হলো সাম্রাজ্যবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জিত হলেই সরাসরি স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করাটা তাদের জন্যে অধিকতর সহজ হয়ে যায়।

চ. আধিপত্যবাদীদের 'বিগ-ব্রাদার' সুলভ আচরণের তোয়াক্কার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে স্বাধীনতা অরক্ষিত হবার সম্ভাবনা। এই তোয়াক্কা যখন কোনো সরকার অথবা কোনো বড় দল করতে শুরু করে, তখন জনগণ তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের মানসিকতায় ঐ সরকার এবং ঐ দল বিভ্রান্তির কালো প্রচ্ছায়া নিক্ষেপ করে বলে কোনো কোনো


www.nagorikpathagar.org

সত্য মিথ্যায় প্রতিপন্ন হয়, কোনো কোনো মিথ্যা সত্যে পরিগণিত হয়। পরিণতিতে জন্ম নেয় এক জটিলতর হীনমন্যতা। আর একটি জাতির মানসিকতায় হীনমন্যতার জন্ম হওয়ার অর্থই হলো স্বাধীনতার শত্রুপক্ষ শক্তিশালী হওয়া।

ছ. জনগণের মৌলিক বিশ্বাসের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের ফলে ঐ বিশ্বাসের পরিপন্থী শক্তিগুলো চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি নিতে থাকে। কারণ, একটি জাতির ঐক্যবদ্ধ হবার সবচেয়ে বড় মাধ্যমটিকে যদি একবার দুর্বল করে দেয়া যায়, তাহলে ঐ জাতির শিকড়-শুদ্ধ উৎপাটন সহজতর হয়। পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার যে লালিত আকাঙ্ক্ষা বহুকাল ধরে ঐ বিশ্বাসী জাতির বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছিল– সেই আকাঙ্ক্ষাই এ-সময়ে অজগরের বেশে অবিচঞ্চল এগিয়ে আসতে থাকে।

পর্যালোচিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করার উপায় কী? আসলে আদর্শ ও মূল্যবোধ এই উভয় অর্থেই পৃথিবীর বহু ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী ও জাতির স্বাধীনতাকে সন্দেহাতীতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, শব্দটিরও অনেক অপব্যবহার হয়েছে। বস্তুত স্বাধীনতা শব্দটির মৌল-মূল্যায়ন কোনো মানবসমাজেই নিরঙ্কুশভাবে মুক্ত করা যায় না। সমাজকে সচল রাখার জন্যই, কোনো না কোনো প্রকারের সীমারেখা এবং বাধ্যবাধকতা সেখানে থাকতেই হবে।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হামমুদাহ আব্দালাতি বলেন:
দেখা যায়, ইসলামই মানুষকে যথার্থ স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়, একে সযত্নে লালন করে এবং মুসলমানদের ন্যায় অমুসলিমদের জন্যও এর নিশ্চয়তা বিধান করে।

স্বাধীনতার ইসলামী সংজ্ঞা মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে ও সকল স্বেচ্ছামূলক কাজের বেলায়ই প্রযোজ্য। পূর্বে যেমন বলা হয়েছে, প্রতিটি মানুষই স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে 'ফিতরাতের' ওপর অথবা নির্ভেজাল প্রাকৃতিক অবস্থায়। এর অর্থ হলো, মানুষ জন্মগ্রহণ করে পরবশ্যতা, পাপাচার, বংশগত নীচতা ও কৌলিক বাধা বিপত্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে। সে যতোক্ষণ না উদ্দেশ্যমূলকভাবে খোদার আইন লংঘন করে কিংবা অন্যের অধিকার খর্ব করে, ততোক্ষণ তার স্বাধীনতার অধিকার পবিত্র ও অলংঘনীয়।

ইসলামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনকে কুসংস্কার ও অনিশ্চয়তা থেকে, তার আত্মাকে পাপাচার ও দুর্নীতি থেকে, তার বিবেককে নিপীড়ন ও ভয়-ভীতি থেকে এমনকি তার দেহকে বিশৃংখলা ও অধঃপতনের কবল থেকে মুক্ত করা। এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত ইসলাম মানুষের জন্যে যে কর্মধারা নির্দেশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, নিয়মিত আধ্যাত্মিক


www.nagorikpathagar.org

অনুষ্ঠান পালন, নৈতিক বিধিমালার বাধ্যবাধকতা এবং এমনকি পানাহারের বিধি-নিষেধ পর্যন্ত। মানুষ যখন এই কর্মধারা ধর্মীয় দৃষ্টিতে অবলম্বন করে, তখন সে কিছুতেই স্বাধীনতা ও মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না করে পারে না।

সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মন ও মননের মুক্তির ওপর। একবার যদি মন-মানসিকতা কোনো পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে সামরিক হোক, রাজনৈতিক হোক, অর্থনৈতিক হোক, সাংস্কৃতিক হোক– কোনো অধীনতা থেকেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদিষ্ট স্বাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সেই স্বাধীনতার স্বাদ তো পৌঁছে দিতে পারে একমাত্র ইসলামী জীবনব্যবস্থাই। তাই ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার অর্থই হলো প্রকৃত স্বাধীনতার আনন্দ ও উপঢৌকনকে স্বাগত জানানো।

ঐ আনন্দ ও উপঢৌকনকে স্বাগত জানানোর পথে বাংলাদেশের জন্যে সবচেয়ে বড় বাধা আজ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত–ভারতের রণসন্ত্রাস, ভারতের নীতিসন্ত্রাস, ভারতের অর্থসন্ত্রাস ও সংস্কৃতিসন্ত্রাস। ভারত আমাদের প্রধান শত্রু। একদা যেমন ফ্রান্সের প্রধান শত্রু ছিলো বৃটেন– এই উপলব্ধি আমাদের জাতির মন-মানসিকতায় যতো তাড়াতাড়ি বদ্ধমূল হবে, ততো তাড়াতাড়িই আমরা বিষয় ও ভাবনার অনুষঙ্গে স্বাধীনতার মৌলিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবো।


www.nagorikpathagar.org

# কবি ইকবাল : তাঁর যরবে কলিম ও অনূদিত যরবে কলিম

কবির কাব্যে দুটো দিক আছে- একটি তার ভেতরের, অন্যটি তার বাইরের। শুধু পোশাকের ও দেহের পরিচয় যেমন সম্পূর্ণ কবির স্বরূপের পরিচয় নয় তেমনি একা কাব্য বিষয়ের বা কবির ভাব জগতের পরিচয় প্রকৃত কবির সমগ্র প্রকৃতির ও চরিত্রের পরিচয় নয়। ... সে জন্য ভেতর-বাহিরে সমগ্র কবিসত্তার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা প্রয়োজন থাকলেও মূলত অনূদিত যরবে কলিম সম্পর্কিত এই স্বল্প পরিসরের প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। তারপরেও, সংক্ষিপ্তভাবে হলেও, ঐ বিষয়ে দু'একটি কথা প্রাসঙ্গিকতার খাতিরেই বলতে হবে।

হুইটম্যান বলেছিলেন-

Behold, I do not give a little charity. When I give. I give myself.

ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই বক্তব্য কবি ইকবালের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি সত্য বলে মনে করা হয়। কেননা, ইকবাল তার সমগ্র ইকবাল সত্তাকেই উৎসর্গ করেছিলেন সমস্ত পৃথিবীকে সুস্থ এবং নিরাময় করার জন্য।

'উনবিংশ শতাব্দীর যবনিকা নেমে আসছে আর ঘনিয়ে আসছে মুসলিম জীবনের ঘনঘটা। এমনি দিনে মুসাফিরের যাত্রা শুরু হলো এক দুর্গম পথে। অতীতে, গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলোতে সঞ্চয় করা সে শক্তি ও আত্মবিশ্বাস আজ কোথায় হারিয়ে গেছে; বাহুতে সে বলবীর্য আর নেই, নীল আসমানের তারারা কোন অতলে ডুবে গেছে। মুসলিম মুসাফির পেছন পানে চেয়ে দেখলো অতীতের গর্ভে আগামী দিনের জীবনের ইতিহাস বুঝি পাওয়া যাবে। অনাগত ভবিষ্যতের সোনালি জীবনের দিকে সে এগিয় যেতে চায়, তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি, কঠোর তার সাধনা, তার লক্ষ্যস্থির; জীবনকে সে একান্ত করে পেতে চায়, মৃত্যুকে তাই সে



www.nagorikpathagar.org

দোসর করেছে; জীবনকে বাঁচাতে সে আত্মহুতি দিতে চায়, আত্মোপলব্ধির মাঝে সে আত্মার নির্বাণ খুঁজে ফেরে।

পথিক পথ চলছিলো আনমনে। তবু শুধু পথ চললে তো আর জীবন হয় না, নিছক অস্তিত্ব আর মৃত্যুময় গতি কোন পথে কে জানে? তাই সে চাইলো এক জীবনবাণী আর গাইলো জীবনের জয়গান, নিখিল বিশ্বের এক মহান শক্তিকে কেন্দ্র করে সে তার আত্মাকে জাগ্রত, বিকশিত ও চিরগতিময় করবে, যৌবনের মহিমা ষোলকলায় গিয়ে পৌঁছাবে এক সাধনাস্নিগ্ধ পূর্ণিমায়।'

এই কর্মবীরের জয়গাঁথা গেয়েছেন দার্শনিক মহাকবি ইকবাল।

উৎসর্গিত প্রাণ কোনো মহাত্মা না হলে এমন কর্মবীরের জয়গাঁথা সত্যি সত্যিই গাওয়া যায় না। কবি ইকবাল এক আদর্শবাদী মহাপৃথিবীর জন্যে উৎসর্গিত-প্রাণ সেই মহাত্মা ছিলেন বলে তার পক্ষে ঐ জয়গাঁথা গাওয়া সম্ভব হয়েছে। গাওয়া সম্ভব হয়েছে:

দৃষ্টি যখন ফিরায়েছি আমি মোর আত্মার পাথারে
দেখেছি তখন আছে সুগোপন সিন্ধু আমারি মাঝারে
আত্মাবিকাশে দীপ্ত হয়েছে বর্তমানের দিন
আগামী উষার দিগ্বলয়ের ছবি হলো রঙ্গিন।
[অনুবাদ: ফররুখ আহমদ]

অনূদিত যর্বে কলিমের পূর্ব কথায়– মূলত আবদুল মান্নান তালিবের এটি একটি সুলিখিত প্রবন্ধ- ইকবালের একটি সন্নিহিত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

সেই পরিচিতিতে বলা হয়েছে:

ইকবাল নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত। পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারার তিনি একজন পাঠক, পর্যবেক্ষক ও সমালোচক। এই সাথে প্রাচ্য জীবনধারা ও জীবন দর্শনের সাথেও তিনি পরিচিত। ইসলামী চিন্তা ভাবধারা ও জীবন দর্শনে তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। পাশ্চাত্য ও ইসলামী ভাবধারা ও জীবন দর্শনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ তার বৈশিষ্ট্য। এ দৃষ্টিতে তিনি বিশ শতকের বিশ্ব মানবতার সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। এই ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের ফলাফলই তার কবিতা।

ইকবাল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন, মানুষ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও গভীর চিন্তাশীল। তবুও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিছক বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে প্রতি যুগেই মানুষ বড় ভুল করে এসেছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর অহি সমস্ত ভুলের উর্ধ্বে। আল্লাহ মানুষের এবং বিশ্বপ্রকৃতি ও পরিবেশের স্রষ্টা। তিনি জানেন, মানুষের দুর্বলতা ও শক্তিমত্তা। কাজেই মানুষের প্রকৃতি তিনিই নির্ধারণ করেছেন। কাজেই


www.nagorikpathagar.org

মানুষের জন্য কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ এবং কোনটা কল্যাণকর ও কোনটা অকল্যাণকর তা তিনি মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করে নির্ভুলভাবে জানেন, তাই আল্লাহর অহি মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক পথ-নির্দেশক। এ দৃষ্টিতে ইকবাল বিশ্ব মানবতাকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার আপাত চাকচিক্যে মুগ্ধ না হয়ে গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার শুধুমাত্র কল্যাণকর বিষয়টুকু গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশ্চাত্যকে তার গলদগুলো তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে তিনি বলেছেন গরিবকে শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। পুঁজিবাদী ব্যাংকিং সম্পর্কে বলেছেন 'যাহির মে তিজারাত বাতিন মে জুয়া হায়' বাইরে থেকে দেখতে তেজারতি প্রতিষ্ঠান কিন্তু আসলে ভেতরে জুয়ার আড্ডাখানা। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেছেন, সেখানে মানুষের মাথা গুনা করা হয়, কিন্তু মানবতাকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ফলে গণতন্ত্র অদ্ভুত প্রহসনে পরিণত হয়। মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারা এবং বলশেভিক রাশিয়ার কম্যুনিজমের বিস্তারও তিনি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। একে পুঁজিবাদী শোষণের প্রতিক্রিয়া মূলক একটি বিভ্রান্ত ও নিষ্ফল পদক্ষেপ রূপেই চিহ্নিত করেছেন।

আগেও বলেছি এবং পুনর্বিবেচনারও প্রয়োজন আছে; মূলত ইকবালের বাণী আলস্য সুপ্ত মানুষের কর্মে এনেছে গতিচাঞ্চল্য, বলিষ্ঠতা ও আত্মবিশ্বাসের অমোঘ সুসংবাদ। ইকবাল কাব্যকে জাতিগঠনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইকবাল ধর্মকে বিশ্বাস করতেন জীবন ও শক্তির উৎসরূপে। তার কবিতায় শুধু ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধেই তীব্র মতবাদ প্রচারিত হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তিনি সুতীব্র সমালোচনা করেছিলেন। শ্রমিক-কৃষকের দুর্ভাগ্য এবং ধনিকের নিপীড়ন সম্বন্ধে ইকবাল দু'হাতে কবিতা লিখেছেন। কতগুলো আপত্তিজনক বস্তুর জন্য তিনি প্রচলিত গণতন্ত্রকেও মেরেছিলেন কাব্যের চাবুক। জাতিসংঘকে তিনি অভিহিত করেছেন 'শববস্ত্রাপহারী' [stealers of shrouds] বলে।

আধুনিক বিশ্বে মানুষের জন্য সঠিক ও কল্যাণমূলক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কবি মর্দে মুমিন ও মর্দে মুসলিমকে আহ্বান জানিয়েছেন। ইকবালের 'মর্দে মুমিন' ও 'মর্দে মুসলিম' কোনো গতানুগতিক বা নিছক বংশানুক্রমিক মুসলমান নয়। তথাকথিত সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত মুসলিম জাতীয়তার ধারক তিনি নন। সেই জন্যে সম্ভবত, আমাদের দেশের এক যথার্থ জ্ঞানী বুদ্ধিজীবী কবি ইকবাল সম্পর্কে বলেছেন:

Iqbal dedicated his life of inspiring the Muslim to go back to the teaching of Al-Quran, to consolidate them as the philosopher poet of the Muslim Umma.


www.nagorikpathagar.org

[RELEVANCE OF ALLAMA IQBAL IN THE MODERN WORLD–
Advocate Mujibur Rahman]

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ। তার জ্ঞানের উৎসধারা ছিলো এমন একটি মৃত্যুহীন উৎসধারার সঙ্গে ওতপ্রোত– যা মানুষকে আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পৃথক ধারণা আত্মস্থ করতে সাহায্য করে। কবি হিসেবে আল্লামা ইকবাল নিজেও যেমন ঐ কারণে নিজের লক্ষ্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি অন্য কবিদেরও পথনির্দেশ করতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রকৃত কবির প্রকৃতি কি হবে সে সম্পর্কে ইকবাল বলেনঃ

কবির প্রকৃতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু
সৃষ্টি করে নিত্য নতুন আকাঙ্ক্ষা
করে তার লালন-পালন।
কবির মর্যাদা অসীম-
জাতির বক্ষে যেমন দিল।
যে জাতি পায়নি কখনো কাব্যের অপূর্ব প্রেরণা
তা যেনো মৃত্তিকার স্তুপ।
কবির হৃদয়জ্বালা
জ্যোতির্ময় করে তোলে একটি জগৎ।
মর্মজ্বালা আর আবেদনহীন কাব্যমালা
অর্থহীন শোকগাঁথামাত্র।
কবির লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়ে তোলা
এই কাব্যই হতে পারে পয়গম্বরীর উত্তরাধিকারী।

[তরজমাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান]

ইকবালের মতে, কবি শুধু ব্যবসায়ীই হবে না, তাঁকে জাতির চিন্তাজগতে আনতে হবে বিপ্লব। ইকবাল দিশারী কবির বর্ণনা দিয়ে কাব্যরচনা করেছেন এভাবেঃ

কবির বক্ষদেশ হলো সৌন্দর্য্যের মঞ্চ
এ থেকেই বিকিরত হবে ভাস্কর দীপ্তি
কবির দৃষ্টির প্রলেপ সুন্দরকে সুন্দরতম করেঃ
প্রকৃতিতে প্রতিভাত করে অধিকতর প্রিয়রূপে
কাফেলা পথ চলে তার ঘন্টাধ্বনি ও
তার বাঁশীর সুরের অনুসরণ করে।


www.nagorikpathagar.org

## দুই.

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ইকবালের সমগ্র কাব্যসম্ভারকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্বের সময়কালকে তিনি ১৯০১-১৯০৫ পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। এ সময়ের রচিত কবিতার মধ্যে 'হিমালা', 'নালা-ই এতিম' ইত্যাদি রয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়কালকে তিনি ১৯০৫-১৯০৮ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন। কবি ইকবাল অধিকতর তাত্ত্বিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন এ সময়ই এবং ইউরোপের আত্ম-বিধ্বংসী জাতীয়তার পরিবর্তে ইসলামেরই বিজয় ঘোষণা করেন। তৃতীয় পর্যায়টি হচ্ছে ১৯০৮-১৯২৪ পর্যন্ত। 'শেকোয়া' ও 'জওয়াবে শেকোয়া'র মতো অভূতপূর্ব কবিতা তিনি এ পর্যায়েই রচনা করেন। চতুর্থ পর্বের সময়কাল হচ্ছে ১৯২৪-১৯৩৮ পর্যন্ত। কবি ইকবালের খণ্ডকাব্য লিখবার প্রবণতা এ সময়ই লক্ষ্য করা যায়। এই পরিণত এবং সর্বান্ত পর্বেই তিনি রচনা করলেন যবুরে আজম, জাবিদনামা, বালে জিব্রিল এবং যরবে কলিমের মতো আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্য।

ইকবালের সর্বমোট ১৫ হাজার শে'র বা চরণের মধ্যে যা মূল গ্রন্থসমূহে প্রকাশিত হয়েছে, তার ৯ হাজারই ফার্সি ভাষায় রচিত। বাকি মাত্র ৬ হাজার উর্দুতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তিনি তার কাব্য-সাধনার সিংহভাগ প্রদান করেছেন ফার্সি ভাষাকে এবং ইকবালের সর্বোৎকৃষ্ট ভাষ্য– কোনো কোনো মনীষীর মতে অন্ততপক্ষে মননের দিক দিয়ে সেটাই– যা তিনি ফার্সি ভাষায় রচনা করেছেন।

ইকবালের প্রথম ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 'আস্‌রায়ে খুদি' প্রকাশিত হয় ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সালে। 'রমুজে বেখুদি' ১৯১৮-এর এপ্রিলে। ফার্সি কাব্যগ্রন্থ 'পায়ামে মাশরি'ক' ১৯২৩ সালের মে মাসে।

উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'বাঙ্গে দারা' প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে। ফার্সি কাব্যগ্রন্থ 'যবুরে আজম' আত্মপ্রকাশ করে জুন ১৯২৭ সালের তৃতীয় সপ্তায়। 'জাবিদ নামা' ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ সালে ফার্সি ভাষাতেই প্রকাশিত হয়। ফার্সি মসনভি 'মুসাফির' নভেম্বর ১৯৩৪ সালে। উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'বালে জিব্রিল' বের হয় ১৯৩৫ সালে।

আমাদের আলোচ্য কাব্যগ্রন্থ 'যরবে কলিম' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন এ তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত যরবে কলিমের পূর্বকথা প্রবন্ধে 'যরবে কলিমের' প্রকাশকাল ১৯৩৬ এর মে উল্লেখ করেছেন।

যরবে কলিম প্রকাশিত হবার দু'বছর পর কবি ইকবাল ইন্তেকাল করেন।

যরবে কলিম কবি ইকবালের পরিণত বয়সের লেখা। এ কারণেই কবি ইকবালের চিন্তাধারা এখানে এতোই সুস্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ যে, পাঠকমাত্রই তার প্রভাব গ্রহণ না করে পারেন না।


www.nagorikpathagar.org

'যরবে কলিম' এর শব্দগত অর্থ হচ্ছে কলিমের আঘাত। কলিম হচ্ছেন হজরত মুসা কালিমুল্লাহ অর্থাৎ হজরত মুসা আ. যেমন তার লাঠির আঘাতে পাথরের বুক বিদীর্ণ করে ঝরণা ধারা প্রবাহিত করেছিলেন, ইকবাল ঠিক তেমনি এই কবিতাগুলোর মাধ্যমে জাতির স্পন্দনহীন দেহে আবার নতুন প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করতে এবং ঘুমন্ত মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

'যরবে কলিম'-এ মূলত ইকবাল মুসলিম জাতির পতনের কারণ এবং জাতি হিসেবে পুনরায় তার দুনিয়ায় কর্তৃত্বশালী হবার পদ্ধতি নিরূপণ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পূর্বে মুসলমানদের চিন্তায় জড়তা দেখা দেয়। তাদের মৌলিক চিন্তার স্রোত প্রায় শুকিয়ে যায়। সমগ্র জাতিই অন্ধ অনুসৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় পাশ্চাত্য সভ্যতা তার আপাত মনোমুগ্ধকর মতবাদ নিয়ে হাজির হয় এবং এই সংগে মুসলিম এলাকাগুলোতে পাশ্চাত্য তার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে। রাজনৈতিক দাসত্বের ফলে পাশ্চাত্যের মানসিক দাসত্বও মুসলমানদের জন্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ডকে মুসলমানরা গ্রহণ করে নেয়। অথচ এ মানদণ্ড ছিলো ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কবি চমৎকারভাবে বলেছেনঃ

'একদা যা মন্দ ছিলো ধীরে ধীরে তাই হলো ভালো
কেননা গোলামিতে পরিবর্তিত হয় জাতির বিবেক।'

যরবে কলিমের অন্তর্গত একটি বিখ্যাত কবিতা 'ভারতীয় ইসলাম'। এ কবিতায় ইকবালের গভীর এবং প্রখরতর অন্তর্দৃষ্টি, সেই সাথে বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সেই প্রখরতর অন্তর্দৃষ্টি, বিপ্লবী চেতনা এবং আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদের রস আস্বাদনের জন্য ঐ 'ভারতীয় ইসলাম' কবিতাটি তুলে ধরলামঃ

'চিন্তার ঐক্যসূত্রই মিল্লাতের প্রাণ আর কিছু নয়
ঐক্যের বিলুপ্তির সাথে ইলহামও
ধারণ করে ইলহাদের রূপ।
ঐক্য সংরক্ষণ বাহুর শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়
বুদ্ধিরা ব্যর্থ এখানে
নিষ্ফল সব কাজে।
হে মর্দে খোদা; সে শক্তি তোমার আয়ত্তে নেই
যাও, আল্লাহকে স্মরণ করো বসে কোন পর্বত গুহায়।
দীনতা, দাসত্ব আর হতাশা চিরন্তন
এই যার তাসাউফ সে ইসলাম করো উদ্ভাবন।
হিন্দে মোল্লার সিজদার অনুমতি আছে দেখে
নাদান ভেবেছে ইসলাম স্বাধীন এই দেশে।


www.nagorikpathagar.org

মুসলিম তথা বিশ্বমানবতাকে জাগিয়ে তোলার যে অস্ত্র ইকবাল বিশ্ববাসীর হাতে তুলে দিয়েছেন 'আজ এবং কাল' নামের যরবে কলিমে অন্তর্ভুক্ত কবিতায় তার চমৎকার পরিচিতি ফুটে উঠেছে।

সফল অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিবের ভাষায় 'আজ এবং কাল' কবিতাটি হচ্ছে:

সে
কালের দুঃখ আনন্দের ওপর রাখে না অধিকার
যে
আজ স্বতঃসমুজ্জ্বল উত্তপ্ত হৃদয় নয়।
সে
জাতির আগামী কালের সংগ্রামের যোগ্যতা নেই
যে
জাতির ভাগ্যে নেই আজকের দিন।
মানে, আগামীকাল নয়,
আজই তাঁকে জেগে উঠতে হবে–
যে নিজেকে বিজয়ী হিসেবে দেখতে চায়।

অতি সম্প্রতি উর্দু-ফার্সি-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বলেছেন, যরবে কলীম হলো সমগ্র ইকবাল-কাব্যের নির্যাস। খানিকটা আক্ষরিকভাবেই আবদুল মান্নান তালিব এর অনুবাদ করেছেন। যরবে কলিমের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করা দরকার।

একটি প্রবন্ধে প্রাজ্ঞ-দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'যরবে কলিম' সম্পর্কে বলেছেন: 'যরবে কলিমকে ইকবাল মানসের সর্বশেষ ও পরিণত অভিব্যক্তি বলা যায়। এতে ইকবালের জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।'

আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত 'যরবে কলিম' সম্পর্কেও তিনি ঐ প্রবন্ধে একটি দায়িত্বশীল মন্তব্য করেছেন: 'মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব 'যরবে কলিমে'র তরজমাতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাভাষায় তার এ অবদান বিশেষভাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে আমাদের ধারণা।

## তিন.

এজরা পাউন্ড কবিতাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন:

১. Melopeia [মেলোপিয়া] ২. Phanopeia [ফ্যানোপিয়া] ৩. Logopeia [লোগোপিয়া]। -এই তিন রূপে।


www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেছেন, 'মেলোপিয়া' কবিতার আছে সেই বিশেষগুণ যেখানে শব্দের সাধারণ অর্থের অতিরিক্ত অর্থ থাকে যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সাংগিতিকগুণ যা সেই শব্দের অর্থকে সঞ্চারণ শক্তি দান করে।

'ফ্যানোপিয়া' তাই যা পরিদৃষ্টি কল্পনাকে চিত্রকল্পে রূপায়িত করে এবং 'লোগোপিয়া' হলো তাই যেখানে পরিলক্ষিত হয় শব্দের মধ্যে বুদ্ধির নর্তন যা প্রত্যক্ষ অর্থে অতিরিক্ত ভাব-কল্পনায় জাগ্রত অর্থকে পাঠকের কল্পনায় উপহার দেয়।

পাউন্ডের মতে, 'মেলোপিয়া' হলো সেই ধরনের কাব্যভাষা যা একজন স্পর্শাতুর কানের অধিকারী বিদেশীর প্রশংসা অর্জনে পারঙ্গম যদিও তিনি সে ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ যা দ্বারা কবিতাটি লিখিত। এ সেই ভাষা যা দৈবঘটনায় হঠাৎ অন্য ভাষায় অনূদিত বা রূপান্তরিত হতে পারে– সেটাও একই সময়ে অর্ধপঙ্ক্তির জন্য সম্ভবত সত্য। অন্যথায় তা রূপান্তরিত বা অনূদিত হওয়া বাস্তবতা অসম্ভব।

অন্যদিকে 'ফ্যানোপিয়া' সেই কাব্যভাষা, বাদসাদ না দিয়ে যার প্রায় পুরোটাই অনুবাদ করা সম্ভব। যখন এটা যথেষ্ট ভালো হয় তখন কাব্যবোধহীন অনুবাদক ছাড়া একে ধ্বংস করা অসম্ভব, যিনি ঐ কাব্য ভাষা জানেন না বলে তার মূর্খতা দিয়ে ভাষাটির একটি তালগোল পাকানো রূপ প্রকাশ করেন।

'লোগোপিয়া' সেই কাব্যভাষা যার কোনো অনুবাদ হয় না। শুধু কবির মানসিক ভাব প্রবণতা অনুধাবন করে মূল কবির চিন্তানুসরণে অনুবাদক সমার্থকে নিজের ভাষায় তার ভাবানুবাদ করতে পারেন।

কবিতা এবং কবিতার অনুবাদ সম্পর্কিত এজরা পাউণ্ডের ঐ বক্তব্যটি শুদ্ধতম বিশ্বকবি ইকবালের কবিতা এবং তার অনুবাদ সম্পর্কেও যথার্থ বলে মনে করি। খ্যাতিমান অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিব 'যরবে কলিম' অনুবাদ করেছিলেন প্রায় ৩ যুগ আগে, কিন্তু তা প্রকাশিত হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঘুরে ১৯৯৪-এর জানুয়ারিতে। প্রকাশের গৌরবময় কৃতিত্ব 'আল্লামা ইকবাল সংসদের'। আমরা ঐ প্রকাশকালকে যথার্থ মনে করি এই জন্যে যে, 'যরবে কলিম'-এর সত্যিকারের বোদ্ধা পাঠক-জনশক্তি এবং বোদ্ধা পাঠক যুবশক্তি তুলনামূলকভাবে এই সময়ে অনেক বেশি। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছিলেন- He who touches the book, touches a man.

সুতরাং অনূদিত 'যরবে কলিম' যিনি একবার হাতে তুলে নেবেন, পঠনের স্পর্শে উন্মোচিত করবেন, তিনি অবশ্যই মহাকবি ইকবালকে আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত হবেন- এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আর শিল্পী হামিদুল ইসলামের প্রচ্ছদ দৃষ্টিনন্দন এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ; দামও মাত্র ৮০ টাকা বলে অনূদিত যরবে কলিম অচিরেই সবার হাতে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ।


www.nagorikpathagar.org

# ইকবালের হাস্যরস

আল্লামা ইকবাল ছিলেন দৃঢ়চিত্ত ও উঁচু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। তবুও মার্জিত কৌতুকপ্রিয়তা আর উন্নত রসবোধ তার চরিত্রের একটি উজ্জ্বলতর দিকও বটে। গুরু-গম্ভীর আলোচনা-পর্যালোচনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনায়াসে পরিবেশন করতেন সুনির্মল ব্যঙ্গ-রসিকতা, পরিবেশ হয়ে উঠতো উচ্ছল, আনন্দ-ভরপুর। ভদ্র এবং রুচিপূর্ণ হাস্য-রসিকতা খুবই পছন্দ করতেন তিনি। নিজেও এ ধরনের হাস্য-রস পরিবেশনের মাধ্যমে বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। একটি কবিতায় ড. ইকবাল নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

সর্বদা এই হৃদয় আমার
মুক্ত বাঁধনহীন
কেউ পারে কি ফুলের কলি হতে
ছিনিয়ে নিতে মুচকি হাসির চিন!

## জীবন্ত গ্রন্থ

একবার পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড ড. ইকবালকে বললেন:

- আপনার কি এমন কোনো মর্যাদাবান জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পর্কে জানা-শোনা আছে, যাকে 'শামসুল উলামা' (জ্ঞানীদের সূর্য) উপাধি প্রদান করা যায়?

ড. ইকবাল সিয়ালকোট কলেজের অধ্যাপক সৈয়দ মির হাসানের নাম উল্লেখ করলে গভর্নর সাহেব খানিকটা বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন:

- তার নাম তো এ-ই প্রথম শুনলাম আপনার কাছে। আচ্ছা, তার কি কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে?

উত্তরে ইকবাল বললেন:

- না তাঁর কোনো বই অবশ্য এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। তবে, একখানা জীবন্ত গ্রন্থ কিন্তু এখনও বর্তমান রয়েছে তাঁর।



www.nagorikpathagar.org

খুব কৌতুহলী হয়ে গভর্নর সাহেব বলে উঠলেন:
তাহলে সেই গ্রন্থের নামটা কি? সহাস্যে জবাব দিলেন- 'এই তো আমিই তো সেই জীবন্ত গ্রন্থ, তিনি আমার সম্মানিত শিক্ষক।' গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড ড. ইকবালের এই জ্ঞানদীপ্ত রসিকতায় অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং খুব তাড়াতাড়ি অধ্যাপক সৈয়দ মির হাসানকে 'শামসুল উলামা' উপাধি প্রদান করলেন।

## বোজর্গী

উর্দু সাহিত্যের মহান কবি গালিবের মতো মহাকবি ড. ইকবালেরও ছিলো আমের প্রতি ভীষণ আকর্ষণ। মৌসুম শুরু হতে না হতেই ইকবাল নিজেই বাজারে যেতেন আম কিনতে। শুধু নিজেই খেতেন না, বন্ধুদের বাড়িতেও পাঠাতেন। একবার কবি আকবর এলাহাবাদি কবি ইকবালের জন্য এলাহাবাদ থেকে আম পাঠালেন- ল্যাংড়া জাতের। ড. ইকবাল অত্যন্ত খুশি হলেন এবং এলাহাবাদিকে ফেরত ডাকেই কবিতা লিখে পাঠালেন:

আকবার আপনার বোজর্গীতে
আহারে,
ল্যাংড়া সে-ও পৌঁছলো এসে লাহোরে।

## সেকেন্দারিয়া-কলন্দারিয়া

একদিন আল্লামা ইকবাল ঘরের বাইরে বসে আছেন, এমন সময় ইয়াবড় এক পাগড়িওয়ালা ইয়াবড় এক লাঠিওয়ালা এসে হাজির হন। এসেই ড. ইকবালের পা টেপা শুরু করেন। চুপ করে রইলেন তিনি, সুযোগ দিলেন তাঁকে আরো কিছুক্ষণ পা টেপার। তারপর এক সময় বললেন:
- কিন্তু 'বাবাজী, কি খবর, কি মনে করে এখানে?
ফকির বাবাজী জবাবে বললেন:
- আমি আমার পীরের কাছে গিয়েছিলাম তো তিনি বললেন, 'ড. ইকবালকে তোমাদের এলাকার 'কলন্দারিয়া তরিকা'র খেলাফত দান করা হয়েছে।'
ইকবাল বললেন:
- কিন্তু আমাকে যে 'কলন্দারিয়া তরিকার' খেলাফত দান করা হয়েছে বাবাজী সে-ব্যাপারে তো কোনো হুকুম নামাই এখনও পাইনি। হাজির হলেন চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেব। তিনি এসে সেকেন্দার হায়াত খান সম্পর্কে কিছু বলা শুরু করতেই ড. ইকবাল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন:
- চৌধুরী সাহেব, রাখুন আপনার 'সেকেন্দারিয়া তরিকা', দেখছেন না এখানে 'কলন্দারিয়া তরিকা'র আলোচনা চলছে এখন।


www.nagorikpathagar.org

## আল্লাহর কাছে দরখাস্ত

পাঞ্জাবে একজন বিখ্যাত পীর একবার আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন এবং কথায় কথায় এক পর্যায়ে তার আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন:

- সরকার তো বর্তমানে জনসাধারণের মধ্যে কিছু জমি বন্টন করছেন, আমারও কিছু জমির খুবই দরকার, এ-ব্যাপারে আপনি যদি একটি দরখাস্ত লিখে দিতেন, বড্ড ভালো হতো।

ইকবাল জবাব দিলেন:

- দরখাস্ত লিখতে তো আমার কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু আপনি কি জানেন এই দরখাস্ত কার কাছে পেশ করতে হবে? পীর সাহেব বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলেন।
- ড. ইকবাল উত্তর করলেন: একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে যার নাম– কোরআন যা কি-না আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর নাজিল করেছেন, ঐ কিতাবেই লেখা আছে, জমির মালিকানা হচ্ছে আল্লাহর। সেই জন্যেই যদি আপনি সত্যি সত্যি দরখাস্ত লেখাতে চান, তাহলে আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই লিখে দিতে পারি।

## শয়তানের ক্রীতদাস

ড. ইকবালের দৃষ্টিশক্তি কমে গেলে নসরুল্লাহ খানই তাঁকে 'সোল এন্ড মিলিটারি গেজেট' পত্রিকাটি প্রায়ই পড়ে শোনাতেন। ঐ নাসরুল্লাহ খানের এক বন্ধু নাস্তিক হয়ে গেলে তাঁকে তিনি ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করাতে এনে বললেন:

- আমার এই বন্ধুটি শয়তানের দলে ভিড়ে গেছে, শয়তানের ক্রীতদাস বনে গেছে। ড. সাহেব, আপনি যদি একে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিতেন?

ইকবাল বললেন,

- হায়, আল্লাহই যাকে বোঝাননি, বুঝবার ক্ষমতা দেননি, বলো আমি তাঁকে কী করে বোঝাই।

## পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব

জলন্ধরের এক বিখ্যাত গ্রাম 'দানেশমান্দান' এর সরদার ছিলেন খান রিয়াজ উদ্দিন খান। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তার ছিলো গভীর আকর্ষণ। আল্লামা ইকবাল এবং খান রিয়াজ উদ্দিন খান পরস্পরের নিকটতম মানুষ ছিলেন। দু'জনেই উন্নত



www.nagorikpathagar.org

জাতের কবুতর পুষতেন। কবুতর পশু-পাখিদের মধ্যে বাচ্চা লালন-পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর।

সেই রিয়াজ উদ্দিন খান সাহেব আল্লামা ইকবালকে মাঝে-মধ্যে জলন্ধর থেকে খুবই উন্নত জাতের কবুতর পাঠাতেন। কিন্তু একবার এমন একজোড়া কবুতর পাঠালেন, যাদের মধ্যে বাচ্চা লালন-পালনের ঐ সহজাত গুণাবলী একবারেই ছিল না। সুতরাং আল্লামা ইকবাল তাঁকে লিখে পাঠালেন:

- আপনার পাঠানো কবুতর দুটো খুবই সুন্দর কিন্তু আফসোস, বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার হাওয়া তাদের গায়েও লেগেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। না হলে, বাচ্চা লালন-পালনের ব্যাপারে ওরা এতটা উদাসীন হয়ে পড়লো কেনো?

## লাইলি-মজনুর সম্বন্ধ

আল্লামা ইকবাল কখনো কখনো মরহুম চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন এবং নিজের খাদেম আলি বখশের সাথেও খুব রসিকতা করতেন। একবার ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন মরহুম মিম, শিন, সাইয়েদ নাজির নিয়াজী; মরহুম চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেবও সাথে। আলি বখশ ইকবালের গা টিপে দিচ্ছিল। মহাকবির মেজাজ ছিল খুব প্রফুল্ল। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, আলি বখশ এবং চৌধুরী মুহম্মদ হোসাইন সাহেব চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন। এ-অবস্থাটা কবি কিছুক্ষণ চুপচাপ উপভোগ করে মুচকি হেসে বলে উঠলেন:

- আ-হা-হা সম্বন্ধটা যেনো সুহানী মাহনেওয়াল সম্বন্ধ [লাইলি-মজনু সম্বন্ধ]

## একটাই তো

আল্লামা ইকবাল একবার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হেকিম সাহেব আম খেতে নিষেধ করলেন। কবি খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন:

- হায় মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু আম না খেয়ে মরার চেয়ে খেয়ে মরাই তো উত্তম।

এ-ব্যাপারে কবি ইকবালের অস্বস্তি সত্যি সত্যিই অধৈর্যে পরিণত হলে, বাধ্য হয়েই হেকিম সাহেব দিনে-রাতে মাত্র একটি আম খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

মওলভী আবদুল মজিদ সালেক সাহেব লিখেছেন:


www.nagorikpathagar.org

- আমি একদিন আল্লামা ইকবালের অসুস্থতার খবরাখবর নিতে গিয়ে তার খাবার পর দেখি ড. সাহেবের সামনে ইয়াবড় এক বোম্বাই আম, ওজনে এক সেরের কম তো হবেই না। কাটবার জন্য ছুরি কেবল উঠিয়েছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম:

- আপনি আবারও আম খাওয়ার বদ-অভ্যাসটা শুরু করলেন?

ইকবাল জবাবে বলে উঠলেন:

- হেকিম সাহেব সেই কবে মাত্র একটা খাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন, জানা নেই বুঝি? আর এই যেটা দেখা যাচ্ছে- এটা তো একটাই। একটাই তো।

## এবার আমার পালা

ইকবালের বাসার নাম 'জাবিদ মঞ্জিল'। সবেমাত্র অন্যত্র পরিবর্তিত হয়েছে, এ সময়ে এক পীর আল্লামা ইকবালের সাথে দেখা করতে এলেন। দুপুরবেলা প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ঘামে জাবজুব এক লোক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পীরের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। লোকটি ঐ পীরের অন্ধ ভক্ত মুরিদ, ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে শুরু করলো:

- এখানে তাশরিফ রাখার সাথে সাথেই আমি খবর পেয়ে গেছি, তাই সোবহে সাদেক হতে না হতেই 'হাগলপুরা' থেকে রওয়ানা হয়েছি হুজুরের কদমবুছির এরাদায়। এক জায়গায় গেলাম তো শুনলাম আপনি আর এক জায়গায়, এভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে আপনাকে এখানে পেয়ে গেছি- আল্লাহর লাখ-লাখ কোটি-কোটি শুকরিয়া।

হুজুর! বর্তমানে আমার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে। না খেয়ে খেয়ে দিন গুজরান করতে হচ্ছে। ঋণের পাহাড় সমান বোঝা আমার মাথায় হুজুর, চাকরি-নকরি নেই হুজুর। হুজুর, হুজুর আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্য একটু দোয়া করুন গো- যেনো আল্লাহ আমাকে সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি দান করেন।

ঐ রকম অনুনয়-বিনয় করতে করতে লোকটি পীর সাহেবের পায়ের উপর দু'টি টাকা নজরানা পেশ করলো। পীর সাহেব তা পকেটে পুরেই মোনাজাতের জন্য হাত উঠালেন, ইকবালকেও হাত উঠাতে বললেন। এই বলে:

আসুন, আমার পরওয়ারদেগারের দরবারে হাত উঠাই।

আল্লামা জবাবে বললেন–

- আপনি দোয়া করুন প্রথমে তারপরে করবো আমি।



www.nagorikpathagar.org

পীর সাহেব চোখ দু'টি বন্ধ করে ঠোঁট বিড় বিড় করতে লাগলেন। তারপর মুখ-দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মুরিদের সারা শরীরে ফুঁ দিতে লাগলেন। খুশির চোটে মুরিদের অবস্থা ফেটে পড়ার মত। ঈমানের তরক্কি হচ্ছিল তার। দু'দণ্ড পরেই সমস্ত অভাব-অনটন তার ফুঁ হয়ে যাবে মনে মনে ভাবছিল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইকবাল পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন:

- তাহলে এবার আমার মোনাজাতের পালা।

ইকবাল দোয়ার জন্য হাত উঠালেন এবং বড় বড় করে বলতে লাগলেন:

- হে খোদা! এ যুগের পীরেরা বে-ঈমান হয়ে গেছে,তাদেরকে হেদায়াত দাও।

পীর সাহেব বললেন:

- এ আপনি কি বলছেন? বরং তাদেরকে সতর্ক হবার জন্য দোয়া করুন।

ড. ইকবাল বললেন:

- দেখুন পীর সাহেব! আপনার দোয়ার সময় বাধা দেইনি, আমাকে প্রশান্ত চিত্তে দোয়া করতে দিন দয়া করে।

পীর সাহেব অগত্যা চুপ করলেন। আল্লামা আবার দোয়া শুরু করলেন:

- হে খোদা! এ যুগের মুরিদদেরকেও আপনি হেদায়েত দান করুন, যেনো তারা তাদের পীরদের অবাধ্য হতে পারে।

পীর সাহেব আবারও অনুযোগ করলেন, কিন্তু ইকবাল মোনাজাত করেই চললেন:

- এ মূর্খ মুরিদ বলছে, সে দুই শো দুই টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছে।

পীর সাহেব ছটফট করে উঠলেন:

- আপনার এ ধরনের মোনাজাত করা সত্যিই উচিত হচ্ছে না। আপনি আমাকে অপমানিত করছেন।

ড. ইকবাল বলে উঠলেন:

- আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার মোনাজাত শেষ করছি, তবে শর্ত হচ্ছে-আপনার মুরিদের কাছ থেকে নাজরানা হিসেবে পাওয়া ঐ টাকা এখনই ফেরত দিতে হবে। ঋণ শোধ করার জন্য মুরিদটিকে আপনারই সাহায্য করতে হবে, একটি চাকরিরও ব্যবস্থা করে দিতে হবে। পীর সাহেব অসন্তুষ্টির সাথে ঐ দুই টাকা তখনই ফেরত দিলেন এবং অন্যান্য শর্তগুলোও পূরণ করার ওয়াদা করলেন।


www.nagorikpathagar.org

# বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

১৩৫৮ সনে প্রকাশিত আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধানে 'চলন্তিকা' 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ করেছে; 'ভারতের উত্তরপূর্বোংছ্ প্রদেশ।' [পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ] 'বাংলাদেশ', 'পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন নাম।' আর বন্ধু শব্দের অর্থ করেছে :

'মিত্র', 'সখা', 'হিতৈষী', 'সুহৃদ', 'বয়স্য', 'সহচর', 'হিতাকাঙ্ক্ষী', 'কল্যাণকামী'। সুতরাং সমগ্র বঙ্গের যিনি প্রকৃত মিত্র, প্রকৃত সুহৃদ এবং প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী– তিনিই প্রকৃত বঙ্গবন্ধু, অন্য কেউ নয়। অবশ্য অর্থগতভাবে যে কেউ বঙ্গবন্ধু হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিদগ্ধ সমাজ যখন কোনো এক মহান মানুষের জন্যে ঐ একটি শব্দকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তখন উপাধিগতভাবে সেই শব্দটি কেবল তাঁর জন্যেই উচ্চারিত হতে পারে। অন্য কারো জন্যে নয়। একদা বাংলার সমগ্র জনতার পক্ষ থেকে সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহর উপাধি দেয়া হয়েছিলো 'বঙ্গবন্ধু'।

'মুন্সী মেহেরুল্লাহ; দেশ কাল সমাজ' গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব উল্লেখ করেছেনঃ

'সমকালীন মুসলিম মনীষীরা মুন্সী সাহেবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃতই তিনি সেকালের বাংলার বন্ধু ছিলেন।'

মুন্সী মেহেরুল্লাহর ইন্তেকালের সংবাদে 'মিহির ও সুধাকর' মন্তব্য করেছিলোঃ

'ভাই বঙ্গীয় মুসলমান! আজ তোমরা প্রকৃত বন্ধু হারাইলে।'

যে সেবা এবং যত্নের হাত নিয়ে সেকালের নির্যাতিত-নিষ্পেষিত বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাতে তাঁকে 'প্রকৃত বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন ছিলো যথার্থ। নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত 'আখলাকে আহমদিয়া' নামের একটি কাব্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রশংসা করে বলা হয়েছিলোঃ



www.nagorikpathagar.org

'মুন্সী মেহেরুল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।'

তিনি বাংলার মানুষের হৃদয়ে কতোটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তা ঐ দু'টি লাইন থেকেই সহজে বোঝা যায়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে ঐ কাব্যে আরো বলা হয়েছে:

'আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দিনের হাতিয়ার
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া
হিন্দু-খৃষ্টান কতো লোক ওয়াজ শুনিয়া
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া
অসার তাদের দিন দিলো যে ছাড়িয়া।

সেকালে রাজশাহীতে মির্জা ইউসুফ আলী সাহেব প্রতিষ্ঠিত করেন 'নুরুল ঈমান'। 'নুরুল ঈমান' সমাজের সঙ্গে মুন্সী সাহেবের সম্পর্ক ছিলো গভীর। মির্জ ইউসুফ আলী মুন্সি মেহেরুল্লাহর অগ্রজ হলেও সাহিত্য ও সেবাকার্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহরই অনুসারী ছিলেন। মূলত এ সময়ে মুসলিম সাহিত্য ও সমাজসেবী প্রায় সবাই তার অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলিম তরুণরা তো ছিলোই। জনৈক লেখক এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'সত্যি কথা বলতে কি, একালে মুসলিম তরুণ সাহিত্য ও সমাজসেবী দলই ছিলেন মুন্সী সাহেবের সৃষ্টি...।'

এই সব বিবেচনা করে হয়তো মির্জা সাহেব মুন্সী মেহেরুল্লাহকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গবন্ধু' বলে অভিহিত করেন। স্বয়ং মির্জা ইউসুফ আলী সাহেব তার 'দুগ্ধ সরোবর' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন:

'বঙ্গবন্ধু মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব ও তার সহকারীগণের অমূল্য প্রচার-প্রচেষ্টা, শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠন, বিখ্যাত 'সোলতান' পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণের আপ্রাণ পরিশ্রম, শিক্ষা সমিতির প্রতি দেশের বড় লোক ও রাজ পুরুষগণের উজ্জ্বল সহানুভূতি, মিশনকার্য শৃংখলার সহিত গঠনার্থে পরম ভক্তি-ভাজন সুফি আবু বকর, 'সোলতানে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক মৌলভী মুজিবুর রহমান প্রভৃতি মহাপ্রাণ লোকের অতুলনীয় চেষ্টা, চট্টগ্রামের বঙ্গীয় স্টিম নেভিগেশন কোম্পানী গঠন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্থাৎ বিশ্বাসমূলক ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে গভর্নমেন্টের আইন প্রণয়ন, স্থানে স্থানে মুসলমান কর্তৃক চর্মদাবাগৎ ইত্যাদি ব্যবসায়ের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত-এই প্রকার চিহ্ন দৃষ্টে বোঝা যায়, সমাজপতিগণের মনোযোগ ঐ চতুর্বিধ কার্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে।'


www.nagorikpathagar.org

উদ্ধৃতিটিতে একদিকে যেমন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে বঙ্গবন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলার সার্বিক উন্নয়নে কতোটা আন্তরিক ছিলেন, কোন পর্যায়ের ছিলেন তারও উল্লেখ আমরা পাই।

মুন্সী সাহেবকে শুধু 'বঙ্গবন্ধু' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা নয়। তাঁকে অন্যান্য উপাধিতেও সম্বোধন করা হয়েছে। কখনো তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'কর্মবীর' হিসেবে, 'ইসলাম প্রচারক' হিসেবে, 'ধর্ম-বক্তা' হিসেবে।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন: 'আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, কেহ তাঁহাকে 'দ্বীনের মশাল', কেহ বা 'যশোরের চেরাগ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।'

'মনীষী শিক্ষাবিদ, শিক্ষাব্রতী মেহেরুল্লাহ' প্রবন্ধে 'মুন্সী' উপাধি সম্পর্কে চমৎকার কথা বলা হয়েছে:

'মুন্সী আরবি শব্দ; মানে একজন শ্রেষ্ঠ মুসাবিদাকারক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কারো লেখায় 'মুনশিয়ানা আছে' একথা বললে, তাঁর লেখায় বা স্বভাবে আভিজাত্য আছে বুঝতে হয়। পরবর্তীতে অবশ্য মুন্সী সাহেবগণ কেরানী মাত্র হয়ে পড়লেন। এখন মুন্সী হলো স্বল্পশিক্ষিত অনভিজাত দরিদ্র ব্যক্তি। আমাদের মুন্সী সাহেব ছিলেন, এ সবের উর্ধ্বে। সমকালে মুন্সী বলতেই মুন্সী মেহেরুল্লাহকেই বোঝাতো। বাংলাদেশে মুন্সী সাহেব ছিলেন নিতান্তই একক ব্যক্তি।'

'মুন্সী' উপাধিটি কালে কালে মেহেরুল্লাহ নামের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, আজ তা পৃথক করা আর ফুল থেকে সুবাস পৃথক করা একই ব্যাপার।

বস্তুত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর জন্য ছিলো সত্যিই মানানসই। কেননা বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি সারাজীবন সাধনা করে গেছেন। আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীনের ভাষায়:

'মুন্সী সাহেব সারাজীবন যা করেছেন, স্বজাতির জন্যে করেছেন। দেশবাসীর জন্যে করেছেন। নিজের জন্যে তো কিছু রেখে যাননি।'

মুন্সী মেহেরুল্লাহ দেশবাসীকে 'খাঁটি মানুষ, মানে মুসলমান বানাতে চেয়েছিলেন।'

তাই তিনি 'শিক্ষা-শিক্ষা' করে পাগল হয়ে ছুটেছিলেন। ছুটে বেড়িয়েছিলেন তাদের সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য।

কবি হাবিবুর রহমানের ভাষায়:

'সমাজদেহের যেখানে যেখানে যে যে রোগ দেখা যাইতো, তাহার চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকস্বরূপ মুন্সী সাহেব ছুটিয়া যাইতেন।'


www.nagorikpathagar.org

'আমাদের মুন্সী সহেবঃ চরিত্র' প্রবন্ধে অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেনঃ 'মুন্সি সাহেবের জীবন আসলে ছিলো একটি সংগ্রামরত মুসলিমের জীবন। মুসলমানী পরিভাষায় একে বলে মুজাহিদের জীবন। সমাজের যাবতীয় অন্যায়, কুসংস্কার ও পাপের বিরুদ্ধে আমরণ জিহাদ করে গেছেন। এই জিহাদে জাতি, ধর্ম ও বর্ণেরও তিনি কোনো তোয়াক্কা রাখেননি। সবার উপরে মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন। কারণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখেরি নবী রাসূলুল্লাহর আদর্শ তিনি ইখতিয়ার করেছিলেন, তিনি ছিলেন এই ইনসান-উল-কামিল বা পূর্ণ মানবের। Super man নয়, Full man-এর আদর্শ। তাই দেখা যায়, আমাদের সুদীর্ঘ জীবনের পথ-পরিক্রমায় মুন্সী সাহেব সর্বত্রই আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন...

'আজ আমরা মুন্সী মেহেরুল্লাহর কথা, তার জীবনাদর্শের কথা এক রকম ভুলতে বসেছি; কিন্তু মুন্সী মেহেরুল্লাহর পথই যে বাঙালী তথা বাংলাদেশী মুসলমানদের একমাত্র পথ, একথা ভুলে গেলে চলবে না।'

দেশবাসীর জীবন-নির্দেশনায় যথার্থ মিত্র এবং হিতৈষীর ভূমিকা রেখে গেছেন বলে সত্যিকারের বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর মৃত্যু নেই- তিনি অমর।


www.nagorikpathagar.org

# কবি ফররুখ আহমদ : তাঁর সিরাজাম মুনীরা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক মুজিবুর রহমান খাঁ ফররুখ আহমদের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন। তিনি তার 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: ফররুখ আহমদ যেমন জরিন-কমল, তেমনি শিরিন-কমল কবি। ফররুখ আহমদের কবিতায় আমরা রং-এর তীক্ষ্ণ পরিচয় পাই আর পাই শহীদের নিবিড় স্বাদ।

মুজিবুর রহমান খাঁ ফররুখ-প্রতিভার মৌল পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে ঐ একই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

ফররুখ আহমদের আসল পরিচয় হলো, তিনি একজন শিল্পী-কবি। রং ও রূপের, বর্ণ এবং তার সাথে গন্ধের আলো, ছায়া এবং মোহের আবিষ্টতা নিয়ে যারা খেলার চাতুরী দেখান, তারাই শিল্পী-কবি। তাদের কবিতা চিত্রধর্মী এবং তারা আরো কিছু। ফররুখ আহমদের কবিতা পড়তে পড়তে পাঠক মন অলক্ষ্যে ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক ও তার পরবর্তী প্রি-রাফেলাইট Pre-Raphalite কবিদের রাজ্যে চলে যায়। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীটসের কবিতার রঙ্গ-প্রাচুর্যের তুলনা নাই। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মধ্যে মরিস, গুননবার্ণ প্রমুখ কবি রং, আলো, সুগন্ধীর জাল বুনে কবিতায় যে ছবি আঁকতেন এবং দেহাভিসারী স্পর্শাতুরতা আনতেন, তার সাথে ফররুখ আহমদের গভীর সাদৃশ্য আছে।

ফররুখ আহমদ একজন বড় কবি। 'বাংলা কাব্যের তিনি এক সুদক্ষ রূপকার ও ভাষাশিল্পী।' প্রখ্যাত প্রবন্ধকার, গবেষক সমালোচক ও সম্পাদক শাহাবুদ্দীন আহমদ 'কবি ফররুখ : তার মানস ও মনীষা' গ্রন্থে লিখেছেন:

ফররুখ আহমদ সেই কবি নন যাকে নিমেষে আত্মস্থ করা যায়। তিনি খুব সহজ-প্রাচ্য কবিদের একজন নন। তাঁর কবিতার ভক্তদের মধ্যে সবাই তাঁর কবিতা



www.nagorikpathagar.org

খুব সহজে বোঝেন– এটা আমার মনে হয় না। মুসলমানদের জন্য লিখেছেন বলে, তার কবিতায় ইসলামের দর্শনের প্রতিফলন হয়েছে বলে যারা ধর্মীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে তার কবিতা পড়েন, তারা তার কাব্যের সাহিত্য উৎকর্ষ সম্বন্ধে কতোটা অবহিত তা আমার জানা নেই। আমি জানি তার কাব্যের একজন অনুবাদক তার কবিতার সুস্পষ্ট অর্থ উপলব্ধি করতে না পেরে আমাকে তার কবিতার অর্থের মর্মোদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রূপক অতিশয়োক্তি এবং প্রতীক দ্বারা যে কবিতার শরীর আবৃত তার আস্বাদ গ্রহণ সহজ নয়। ফররুখ ধর্মের কথা যতোই বলুন তিনি একজন শিল্পসচেতন কবি এবং খুব সাধারণ মানুষের জন্য তিনি কবিতা লিখেছেন এবং ইংরেজির মাধ্যমে জার্মান ও ফরাসি ভাষার অনেক শ্রেষ্ঠ আন্দোলনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বের আধুনিক কবিতা ও তার শিল্প আন্দোলনের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। কাব্য রচনার সময় সেই শিল্প কৌশলকে যথারীতি প্রয়োগ করতে তিনি সাধ্যমত পরিশ্রম যে করেছেন– সেটা তার লেখার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে প্রতীয়মান।

কবি ফররুখের সাফল্য প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ আলী আশরাফ [বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা নং-৫০] বলেন: ফররুখ আহমদই প্রথম কবি, যিনি সাফল্যের সঙ্গে মুসলিম অতীত ও মুসলিম পুরাকাহিনীকে বাংলা কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন– উর্দু কাব্যে যেমন কাজে লাগিয়েছেন ইকবাল।

কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ 'ফররুখের কবিতা : তার শিল্পরূপ' প্রবন্ধে কবি ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন:

> 'ফররুখ আহমদের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে না এনে রূপ প্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি কৌশল অবলম্বন করেছেন। ফলে বক্তব্য প্রধান এবং উদ্দীপনাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও এই পর্যায়ের তার কবিতা হয়ে উঠেছে আবেগ ও অনুভূতিসঞ্জাত অথচ শিল্প রূপময়।'

কবি, অনুবাদক ও প্রবন্ধকার ফখরুজ্জামান চৌধুরী 'আকাশের শাহিন তিনি' প্রবন্ধে কবি ফররুখের চারিত্রিক দৃঢ়তার এক যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: কবি ফররুখ আহমদ যে আমাদের কাব্য জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, এই সত্য আজ তর্কের উর্ধ্বে।

তাঁকে আমরা জানি ইসলামী রেনেসাঁসের একজন মহান কবি হিসেবে। তার কবিতায় ইসলামের অতীত, গৌরব, ঐশ্বর্য আর সৌকর্যের অনুষঙ্গ ফিরে এসেছে বারবার। এ কারণে অবশ্য তিনি ইতিহাসবেত্তা হয়ে যাননি, কবিই রয়ে গেছেন। কবি নজরুল ইসলামের পর ইসলামী গৌরব গাঁথার সবচেয়ে কৃতি রূপকার ছিলেন ফররুখ আহমদ এবং আশ্চর্য ক্ষোভের ব্যাপার, ফররুখ আহমদের


www.nagorikpathagar.org

ইসলামী ঐতিহ্য সচেতনতা আমাদের কোনো কোনো তথাকথিত প্রগতিবাদীর চোখে ক্রিয়াশীল বলে ধরা পড়েছে। এই সব সুবিধাবাদীরা আবার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করছেন টি.এস এলিয়টের খৃস্ট ধর্ম সচেতনতার।

ড. রাবেয়া মঈন 'কবি সৈয়দ আলী আহসান : প্রভায় বৈভবে' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, চল্লিশ দশকের ফররুখ আহমদ একজন বড় মাপের কবি এবং এ রকম অভূতপূর্ব ফররুখ তিরিশের দশকে আর একটিও নেই।

## দুই.

'সিরাজাম মুনীরা' কবি ফররুখ আহমদের কাব্য জীবনের দ্বিতীয় উত্তরণ-ক্ষেত্র। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে মাদকতাপূর্ণ আহ্বান ছিলো– নতুন সফরে বেরিয়ে পড়ার, দরিয়ার বুকে নতুন করে জাহাজ ভাসানোর; অঙ্গুলি নির্দেশ ছিলো হেরার রাজতোরণের দিকে, মুক্তির সর্বোত্তম দিগন্তের দিকে। 'সাত সাগরের মাঝিতে কবি 'রোমান্টিক' মন নিয়ে অতীতের মোহনায় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে আপন জীবন-স্বপ্নের সমর্থন খুঁজে বেড়িয়েছেন। কিন্তু 'সিরাজাম মুনীরা'য় কবি ফররুখ 'মুসলিম অভ্যুত্থান' যুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার আলোকে আধুনিক মুসলিম জীবনের পুনর্গঠন আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

সিরাজাম মুনীরা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। 'কবি ফররুখ আহমদ' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন: সাত সাগরের মাঝি'র যে কবি চেতনা মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনের প্রাণবায়ুতে স্বপ্নধ্যানে স্ফূর্তি লাভ করেছিলো, সেই কবি চেতনাই 'সিরাজাম মুনীরা'তে 'মুসলিম পুনর্গঠনের আদর্শ পন্থা' নির্দেশে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলো। তাই 'সাত সাগরের মাঝি'র পরে 'সিরাজাম মুনীরা'য় কবি যে পথ ধরেছেন তা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিলো না।

'সিরাজাম মুনীরা' সম্পর্কে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণ আলোচনা করেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। সে আলোচনায় তিনি লিখেছেন:

'সিরাজাম মুনীরা' কবির কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। ঐ পর্যায়ের কবি, জীবনপথের স্পষ্ট দিশা পেয়ে ছুটে চলেছেন সুদূর অতীতের এক অধ্যায়ে। মহানবীর জীবনের যে আদর্শ হয়েছিলো পূর্ণ বিকশিত, যে আদর্শের রূপায়ণ হয়েছিলো ইসলাম জগতের মহামানবের জীবনে তাঁকে আবার দুনিয়ার বুকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার আকুল বাসনায় কবি আলোর জন্য ছুটে চলেছেন 'হেরার রাজতোরণে'। মানব জীবনের চরম দুর্দিনে যে এ দুনিয়ায় মহানবীর আবির্ভাব


www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলো তার এক সুস্পষ্ট ছবি এঁকে তারই পাশে দাঁড় করিয়েছেন নবীজির কল্যাণধর্মী জীবনের নানাবিধ দিক। তৎকালীন জীবনে যে 'জোড়াতালি দেওয়া' সমাজ- সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো, সে হালকা ঠুনকো সভ্যতা যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। সে সমাজের বুনিয়াদ সত্যিকার জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো না। সে ছিলো মানব জীবনের এক বিকার। মানুষ তার আসল স্বরূপ চিনতে পেরেই ছুটে চলেছিলো নবিজীর পাতাকাতলে পূর্ণ বিকশিত জীবনের স্বাদ পেতে।

নবীজির প্রদর্শিত পথে জীবন বিকাশের জন্যে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের অমিয় জীবন কথা কবি আবার তুলে ধরেছেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে। নবীজির আদর্শের প্রেরণায় তার অনুসঙ্গীগণ কোনো সংকটেই বিচলিত হননি কোনোদিন। তারা বিশ্বজুড়ে এক আদর্শ সংস্থা গড়ে তুলতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ফুটে উঠেছিলো নবজীবনের এক একটি বিশিষ্ট দিক খুব স্বাভাবিকভাবেই।

তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে এমন সত্য সিন্ধু-দোল
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনেরও কলরোল,
তাই উসমান খুলে গেলো দার অতুরণ দিল মণিকোঠার
তাই তো আলীর হাতে চামকায় বাঁকা বিদ্যুৎ জুলফিকার
খালেদ-তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞানযাত্রীরা করে প্রয়ান।

অধ্যাপক আবদুল গফুর 'ফররুখ-মানস : তাঁর কবিতা' প্রবন্ধে 'সিরাজাম মুনীরা' প্রসঙ্গে লিখেছেন: কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' মূলতই মহানবী মুহম্মদ মুস্তফা (সা.) ও তাঁর উত্তর সাধকদের জয়গানে মুখর। বিপর্যস্ত মুসলিম জাতি এবং মানবতাহীন সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট বিশ্ব সমাজের জন্যে এক নবযুগ উন্মেষের স্বপ্নে বিভোর কবি এখানে স্মরণ করেছেন মানবতার শ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা নবী মুহম্মদের (সা.) আদর্শকে।

সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সংগঠক অধ্যাপক আবদুল গফুর আরো লিখেছেন:

ফররুখ বিশ্বাস করতেন ইসলামের আদর্শ নিতে হবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছ থেকে নয়, সিরাজাম মুনীরা হযরত মুস্তফা (সা.) থেকে, যিনি ছিলেন আদপেই দুনিয়ার সেরা বিপ্লবী, দুনিয়ার সেরা ইনকিলাবের মহানায়ক।

'ফররুখ আহমদের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি, অনুবাদক ও প্রবন্ধকার ড. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী লিখেছেন: 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য দু'টির মধ্যে সীমানা নির্দেশ করা সহজ নয়। শুধু সময়ের দিক থেকে নয়,


www.nagorikpathagar.org

আবেগ-কল্পনার প্রকৃতির বিচারেও দু'টি কাব্য একই বৃত্তের অন্তর্গত। পয়গম্বর, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য পীর-মুজাদ্দিদ যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে আবেগে বন্দিত হয়েছেন, প্রথম কাব্যের সাথে তা মূলত এক। কল্পনা এখানে বিষয়গত কারণেই কিছুটা সংহত, কিন্তু আবেগ অতিমাত্রায় উচ্ছল– এতোটা, যে বীরপূজার অনভ্যস্ত এলাকার পাঠক কিছুটা বিব্রত বোধ করবেন।

## তিন.

কবি, গল্প ও উপন্যাস লেখক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ ফররুখ আহমদের জীবদ্দশায় তার যে সব কবিতাগ্রন্থ, শিশু কিশোর তোষ ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো এবং সে সবের সংস্করণ হয়েছিলো, তার একটি পরিচয় 'ফররুখ আহমদ : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। আমরা হুবহু পেশ করছি তা থেকে শুধু 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ:

সিরাজাম মুনীরা। [প্রথম প্রকাশ] প্রথম তমদ্দুন সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৫২। রচনাকাল : ১৯৪৩-৪৬। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : তৈয়বুর রহমান এম.এ. তমদ্দুন প্রেস, ৫০ লালবাগ রোড, ঢাকা, পূর্বপাকিস্তান। সর্বস্বত্ব গ্রন্থকারের। দাম: দু'টাকা আট আনা। ডিমাই সাইজ, পৃষ্ঠা ৮৮। উৎসর্গ : পরম শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্ব মৌলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্ত মোবারক–

'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে রচিত হবার সময়কাল নিয়ে একটি বর্ণনা দিয়েছেন সাহিত্য গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি তার 'কবি ফররুখ : তার মানস ও মনীষা' গ্রন্থে লিখেছেন: 'সিরাজাম মুনীরা'র 'আবু বকর সিদ্দিক' ১৯৪৩-এ, 'এই সংগ্রাম', 'উমর দরাজ দিল' ১৯৪৪-এ, 'ওসমান গণি', 'মন' 'মৃত্যু সংকট', 'অভিযাত্রিকের প্রার্থনা' ১৯৪৫-এ, 'অশ্রুবিন্দু'-১৯৪৬-এ, 'শহীদের কারবালা'-১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সংকলিত সিরাজাম মুনীরা, আজ সংগ্রাম, প্রেমপন্থী, গাওসূল আজম, খাজা নক্‌শবন্দ, সুলতানুল হিন্দ, মুজাদ্দেদে আলফেসানি, মুক্তধারা ও ইশারা কবিতাসমূহের প্রকাশকাল ফররুখ রচনাবলী [১ম খণ্ড]-এর গ্রন্থ পরিচিতিতে নেই। বলা বাহুল্য, ১৯৫২-এ প্রকাশিত সিরাজাম মুনীরা'র প্রিন্টার্স পেজ-এ উল্লেখ আছে যে, এই গ্রন্থের কবিতাসমূহ ১৯৪৩-৪৬ এর মধ্যে রচিত ও মুদ্রিত।

'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা' রচনার একটি ঐতিহাসিক পটভূমির খবর দিয়েছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। তিনি তার 'অন্তরঙ্গ আলাপন'-এ লিখেছেন: তিনি [ফররুখ আহমদ] বলেছিলেন, তার 'সাত সাগরের মাঝি'র সবগুলো কবিতাই না-কি মনে মনে একটি ছক তৈরি করে সিকোয়েন্স-এর


www.nagorikpathagar.org

ধরনে লেখা। এমনকি 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাবলীও না-কি তাই। দু'টি গ্রন্থের কবিতাই প্রায় একই কালের রচনা। দেশ বিভাগের আগে পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় রেনেসাঁ-আন্দোলনের পটভূমিতেই এই কবিতাগুলোর জন্ম।

'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে ড. গুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন:

'সিরাজাম মুনীরা'র কিছু সংখ্যক কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি'র সমকালে এবং কিছু পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিলো। ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত-এর প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৫ সাল বলে নির্দেশিত হয়েছে।

'সিরাজাম মুনীরা'র কাব্যাদর্শ সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় 'কবি ফররুখ আহমদ' গ্রন্থে একটি যথার্থ উচ্চারণ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

'সিরাজাম মুনীরা'য় কবি কাব্যপন্থার চেয়ে সমাজকর্মীর আদর্শপন্থার দিকেই বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। 'সাত সাগরের মাঝি'র স্বাপ্নিক কবি এখানে মুসলিম-জীবনের পুনর্গঠন আকাঙ্ক্ষাটিকে রূপায়িত করার জন্য আদর্শ কর্মপন্থা নির্দেশেই নিয়োজিত রয়েছেন বিশেষভাবে।

ড. মুখোপাধ্যায় চমৎকারভাবে আরো উল্লেখ করেছেন:

'সিরাজাম মুনীরা'কে 'সাত সাগরের মাঝি'র স্বপ্নভাবনার একটি যথার্থ আদর্শ সম্মত বাস্তব উপসংহার বলা চলে। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে অতীত স্বপ্ন চারণার মধ্য দিয়ে বর্তমানের কূলে জেগে উঠে কবি চারিদিকে 'ঘোর তমিসা' লক্ষ্য করে হেরার রাজতোরণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই 'হেরার রাজতোরণে'র পথটিকে সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করেছেন কবি 'সিরাজাম মুনীরা'তে। ফররুখ আহমদের কবিতায় ছন্দের যথার্থ উদ্বোধন আছে, আছে কারুকার্যময় অন্তরআগ্রহ।

কবি, সমালোচক, গবেষক, শিক্ষাবিদ সৈয়দ আলী আহসান বলেন:

> ফররুখের কবিতায় ছন্দ-স্পন্দন এবং অন্তর্যামক অপরিহার্য, সে সর্বদা কবিতা লিখেছে শ্রবণযোগ্যতার কথা স্মরণে রেখে। ইংরেজিতে যাকে বলে– To write for the ear. ফররুখের ছন্দ ও ধ্বনির স্পন্দনে সে অভিপ্রায়ই প্রমাণিত। নিরূপিত ছন্দের বন্ধন মেনেই ফররুখ কবিতা লিখেছে, সে সর্বদাই ভেবে-চিন্তে তার কবিতার শব্দাবলী সাজিয়েছে। বিভিন্ন ধ্বনির পুনরাগমকে সে বাঞ্ছিত করেছে, যার ফলে তার কবিতা সহজেই পাঠকের অবধানতা পেয়েছে।


www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ 'ফররুখ কাব্যে ছন্দ' প্রবন্ধে, 'সিরাজাম মুনীরা'য় ব্যবহৃত ছন্দ সম্পর্কে লিখেছেন, বলা বাহুল্য, তার 'সিরাজাম মুনীরা'র অতি দীর্ঘ আটটি কবিতা সম-অসম পঙ্‌ক্তির মাত্রাবৃত্তে রচিত– [এতে অবশ্য অসম পঙ্‌ক্তির বা মুক্তক অক্ষরবৃত্তে রচিত দু'টি এবং অক্ষরবৃত্তে রচিত ৯টি সনেট আছে] লক্ষ্য করা যায়, প্রথমদিকের তার রচিত কাব্যরসে ভরপুর অধিকাংশ কবিতা মাত্রাবৃত্তে রচিত।

## চার.

'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাসমূহ যে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ এর মধ্যে রচিত, তা আমরা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে জেনেছি।

মূলত পুরো চল্লিশের দশকই ইতিহাসের বিচারে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি দশক। 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হয় ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ। এই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ নির্দিষ্ট মাত্রা অর্জন করলো।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার, মুসলিম নেতৃত্বকে বিচলিত করে তুলেছিলো। ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির শিক্ষা-ব্যবস্থা, বন্দে মাতরম সংগীত, শ্রীপদ্ম প্রতীক এবং হিন্দুয়ানী পাঠ্যপুস্তক চালু করার ফলে হিন্দু শাসনে নিজেদের ধর্ম ও কৃষ্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মুসলমানগণ শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণের পর ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তারা অখণ্ড ভারতের চিন্তা থেকে দ্রুত সরে আসেন।

লাহোর প্রস্তাবের দু'টি দিক ছিলো:

এক. উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা।

দুই. উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। ১৯৪১-এর শেষদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এবং তা ভারত উপমহাদেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জাপানের হাতে বৃটেন ও তার মিত্রশক্তির দুর্গ সিংগাপুরের পতন ঘটে এবং বার্মার পতনও ছিলো অত্যাসন্ন। এ সময় গান্ধী বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ ভগবান হিটলারকে পাঠিয়েছেন। কংগ্রেস মনে করতো, যুদ্ধে বৃটেন কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তার ফলে বেশি বেশি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা যাবে।


www.nagorikpathagar.org

জাপান বার্মা দখল করলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনসটন চার্চিল হাউস অব কমন্সে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেন। বিবৃতি দানের পর 'ওয়ার কেবিনেট' কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্তগুলো একটি খসড়া ঘোষণায় সন্নিবেশিত হয়। সেই ঘোষণা নিয়ে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতে আসেন। কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তাদের দাবি মেনে নেয়া হয়নি এই অজুহাতে।

কংগ্রেসের অন্যতম দাবি ছিলো– কেন্দ্রে সত্বর একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হোক। এই দাবির পেছনে কংগ্রেসের গোপন উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদেরকে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত করা। কংগ্রেসের চাল বুঝতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেদিন ভুল করেননি বলে সোজা ঘোষণা দিলেন, মুসলিম ভারতের সত্যিকার রায় প্রতিফলিত হয় এমন কোনো পদ্ধতিতে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতের কোনো স্কীম বা প্রস্তাব তারা মেনে নিতে পারবেন না। কংগ্রেস চরমভাবে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের শিকার হলো।

১৯৪২ সালের ৭ আগস্ট কংগ্রেস ঘোষণা করলো, 'যদি বৃটিশ ভারত ত্যাগে অসম্মত হয় তাহলে গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম শুরু করা হবে।'

এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করলেন মুসলিম নেতৃত্ব। বললেন, এই আন্দোলনের ফলে কেবল যে উগ্রতা দেখা দেবে তা-ই নয়, পরন্তু এর ফলে বহু রক্তপাত ও নির্দোষ মানুষের জীবন নষ্ট হবে, এ কথা কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ জানেন না বিশ্বাস করা অসম্ভব। কংগ্রেসের অহিংস [?] সংগ্রামের ফলে ৭৫০ জন নিহত হলো, আহত ১২ শতেরও অধিক, অপরিমেয় ক্ষতি হলো সম্পদের। মুসলিম নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থা আরো বাড়লো নেতৃত্বের দূরদর্শিতার কারণে।

১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালের বাংলা, আসাম, সিন্ধু ও উত্তর -পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বলবৎ ছিলো। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মন্ত্রীসভা বলবৎ থাকলেও তারা মুসলিম লীগ ও ভারত বিভাগ সমর্থন করতেন। ফলে জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ থাকার কারণে মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং পাকিস্তান আন্দোলনও শক্তিশালী হতে থাকে। এতে করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।'

১৯৪৪ সালের নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন সভা এবং ১৯৪৬ সালের মার্চে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে বৃটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবি যাচাইয়ের জন্য। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব মূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেদের দাবি প্রমাণ করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নেয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, শক্তি ও সংহতি এবং স্বাতন্ত্র্য জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক আবাসভূমির দাবির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন এই নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।


www.nagorikpathagar.org

আমরা চল্লিশের দশকের প্রথমদিকের কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা উপর্যুক্ত করেছি। মুসলিম- জাগরণের আরো অনেক ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্যে ঐ সব ঘটনা উদ্ধারের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে কোন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাসমূহ রচিত হয়েছিলো তা জানার জন্যে। বস্তুত 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাবলী রচিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে যখন নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণ জাগ্রত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে পৃথিবীর মানচিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং বলা যায়, একটি উত্তাল সময়ের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশিকা হচ্ছে 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থ।

সামাজিক পরিত্রাণের জন্য তিনি (ফররুখ আহমদ) রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামী রীতিনীতি বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সে জন্য তার 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২, 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'হাতেম তায়ী' (১৯৬৬) কাব্যের সম্পূর্ণ অবয়ব জুড়েই মহানবী ও খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণের আমন্ত্রণ আছে। কেবল আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে নয়, কবি মূলত সমাজ থেকে জুলম-অত্যাচার দূর করে অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়নীতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইসলামী আদর্শের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

## পাঁচ.

বাস্তব পৃথিবীকে, পৃথিবীর মানুষকে, মানুষের সমাজকে, আন্তরিকভাবে ফররুখ আহমদ সুন্দর দেখতে চেয়েছিলেন। সিরাজাম মুনীরা গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), খোলাফায়ে রাশেদিন,আসহাবে রাসূল এবং পরবর্তী সময়ের মুজাদ্দিদদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে কবি সেই সৌন্দর্য-ধ্যান করে দিয়েছেন।

কবি চেয়েছিলেন মানুষ 'সিরাজাম মুনীরা'র আদর্শে উদ্দীপিত হোক, উজ্জীবিত হোক তার কর্মসাধনায় এবং একটি সর্বাত্মক বিপ্লব আনুক কল্যাণ ও মানবতার পৃথিবীময়। কেননা তার আগমনেঃ

কে আসে, কে আসে সাড়া পড়ে যায়,
কে আসে, কে আসে নতুন সাড়া।
জাগে সুষুপ্ত মৃত জনপদ, জাগে শতাব্দী ঘুমের পাড়া।
হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবেহায়াত
জানি সিরাজাম মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত।


www.nagorikpathagar.org

# ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : তাঁর সাহিত্যচিন্তা

জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এবং ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে এক সপ্তবর্ণ ইতিহাস, এক বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য হিসেবে কেবল ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে– অগ্রগণ্য করা যায় বাংলা ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে, উপমহাদেশের পরিব্যাপ্তির মধ্যে এবং এ-সময়ের একটি অবারিত-বিশ্বাসদীপ্ত পৃথিবীর চৌহদ্দির মধ্যে। আর আমাদের সমাজের অন্তরে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিলো বলে আমরা এবং আমাদের জন্মভূমি সন্দেহাতীতভাবে সৌভাগ্যবান। মূলত এ-ধরনের দুর্লভ ব্যক্তিত্বের জন্য যে কোনো সমাজই গৌরব করতে পারে। যে কোনো সমাজের জন্যই এ ধরনের মানুষ ও মনীষা রীতিমত শ্লাঘার আশয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর উজ্জীবিত কালে এবং কালান্তরে কিংবদন্তীর অনঙ্গের মতো, রূপকথার অভিজ্ঞানের মতো, এক অবিস্মরণীয় পরিচিতির মাধুর্যে সর্বসময়ে চিহ্নিত করার মতো। তবু তাঁর কৃতিস্বত্বের উপঢৌকন একটি সোনালী সূর্যের উন্মেষের গৌরবময় উপমা।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক ক্ষণজন্মা পুরুষের নাম– 'জ্ঞানের মহিমায় এবং প্রজ্ঞার অধিকারে দীপ্তিমান যিনি। 'শুধুমাত্র প্রশংসার শব্দ উচ্চারণ করে' যার অনন্য প্রতিভার স্বীকারুদ্ধৃতি যথেষ্ট নয়। বরং বারবারের এবং বহুবারের স্মৃতিচারণের মতো বৈভবে ও বিনয়ে তাঁকে আবিষ্কার করাই যুক্তিসংগত এবং তাতে করে আমাদের এই অনুপ্রেরণা, আমাদের এই আত্মবিশ্বাসের আশ্রয়স্থল আমাদেরই 'চিরকালের মনোলোকে জ্যোতির্ময় অস্তিত্বে'র মতো অবস্থান করবেন।

একজন বিস্ময়কর শহীদুল্লাহ সম্পর্কে অমোঘ উচ্চারণ করেছেন অনেকেই, অনেক মহাজনই। আমরা কেবল কয়েকজনের বিনীত অভিব্যক্তি তুলে ধরার প্রয়াস পেলাম–

'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মরণে' অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন:

> 'বাংলার ভাষা সাহিত্যের বিজয় অভিযানে তিনি নির্ভিক পতাকাবাহী সৈন্যরূপে অনাগত ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবেন।'



www.nagorikpathagar.org

ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন:

> 'প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানরাজ্যে যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাহার একটি জলন্ত উদাহরণ।'

'দিনের পর দিন মৌমাছি যেমন নানা ফুল হইতে পরাগ আহরণে মৌচাক বোঝাই করিয়া মধুর সৃষ্টি করে, এই জ্ঞান সাধকটিও জীবনের পৌনে এক শতাব্দী কাল হইতে ইংরেজি, ফ্রেন্স, জার্মান, সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবি, ফারসী, উর্দু, বৈদিক, আবেস্তান, তিব্বতী, সিংহলী, হিন্দী, মৈথিলী, আসামী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি দেশ-বিদেশের ভাষা হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া আপনাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।'

'একক ব্যক্তিসত্তার মনীষার চরম বিকাশের সাথে একটি জাতির জাতীয় গৌরব বোধের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, অন্য কথায় বুদ্ধিচর্চার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রতিভা ও মনীষীদের সমষ্টিগত সাফল্যের প্রেক্ষিতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ জাতির মর্যাদা নিরূপিত হয়ে থাকে। অসামান্য প্রতিভা সর্বদেশে-কালে দুর্লভ; অধিকন্তু তার সমসাময়িককালে প্রায়শ নাগরিক-সাধারণের অবজ্ঞার ভাগী হয়ে থাকেন। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, যশস্বী নাগরিকরাই একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয়কে অর্থবহ করে তোলে। তাই জার্মানীর চাইতে গ্যেটের জার্মানী এবং ইংল্যান্ডের চাইতে শেক্সপিয়রের ইংল্যান্ড আমাদের কাছে অনেক বেশি মহান ও সমাদৃত ...

দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে ছোটখাটো মানুষটি হলেও পাণ্ডিত্যের মাপকাঠিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ আমাদের সময়ের এক মহান পুরুষ, এমনকি ড. শহীদুল্লাহকে প্রাচ্য-বিদ্যার Oriental Lore একটি চলনশীল জ্ঞানকোষ Walking encyclopedia বললেও অত্যুক্তি হয় না।'

ড. মুহম্মদ এনামুল হক তার একটি পত্রে [১১ এপ্রিল, ১৯৩৫, 'পত্র সাহিত্যে

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ আ. মু. মু নূরুল ইসলাম] উল্লেখ করেছেন:

> 'যিনি [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ] বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় জীবন কাটাইয়া দিয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও গতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, আজ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণে যদি তাঁহার নিকট অযোগ্য উপাচার লইয়াও পৌঁছিতে পারি, মন কি সেই জ্ঞান-সাগর-সঙ্গমে পৌঁছিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করে না?'

ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : এক ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন' এ আরো লিখেছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মধ্যে আমরা দু'টি বিপরীতধর্মী প্রতিভার দুর্লভ সমন্বয় দেখতে পাই; গবেষণার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং সাহিত্যিক



www.nagorikpathagar.org

সৃজনশীলতা। তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাঙ্গালী সাহিত্যিক। মূলত প্রবন্ধকার এবং ভাষার ব্যুৎপত্তি, বিকাশ এবং প্রকৃতি বিষয়ক গবেষক পণ্ডিত হলেও সাহিত্যের সব শাখাতেই তার গতিবিধি রয়েছে।

কবিতা, ছোটগল্প, শিশুসাহিত্যও তিনি রচনা করেছেন। ১৯৩৭, ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত তার বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। হাফিজ ও ইকবালের অনুবাদ এবং বিদ্যাপতির পদাবলী সম্পাদনায়ও তিনি অনুবাদ, সাহিত্য-সমালোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক– একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে এ তিনের সমন্বয় সাধারণত সুলভ নয়। উপরন্তু এতখানি উন্নত মনীষার অধিকারী হয়েও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিজের মধ্যে লালন করেছেন এক প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস। পূর্ণতার সাধনায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞান সাধনার সাথে আত্মার সাধনাকে যুক্ত করেছেন।'

প্রফেসর আবদুল হাই তার 'ভাষাতাত্ত্বিক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ 'বৈচিত্র্যই তার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বহুভাষা শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং সে সব বিষয় সম্পর্কে লেখা এবং জ্ঞান বিতরণ যেমন তার স্বভাবের অঙ্গ তেমনি তার নিজের বিষয় ভাষাতত্ত্বেও কোনো একটি ধরাবাঁধা বিষয় নিয়ে কালক্ষেপণ করেননি।'

জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেনঃ

'আজ এ পরিণত বয়সেও ভেবে কূলকিনারা পাই না একজন মানুষের মধ্যে এতোগুলো গুণের সমাবেশ কিভাবে হওয়া সম্ভবপর ছিলো, তিনি চৌদ্দটা ভাষায় কথা বলতে পারতেন। ধ্বনিতত্ত্বে তার জ্ঞান ছিলো প্রভূত। তিনি ছিলেন এক মহাঐতিহ্যময় খান্দানী তরিকার পীর। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে তার নিজস্ব মৌলিক মতবাদ ছিলো। তিনি ছিলেন খুব মিতব্যয়ী পুরুষ। ... ব্যক্তিগত জীবনে কতো লোক যে তার কাছে ঋণী, তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভরতপক্ষী বা Skylark সম্বন্ধে বলেছিলেন-

Type of the wise who soar  
but never roam  
True to the kindred points of  
Heaven and Home :

অর্থাৎ 'হে পাখি, তুমি সেরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি– যারা উপরে ওঠে তবে যথাতথা ঘুরে বেড়ায় না, তুমি স্বর্গ ও মর্তের সকলের অতিশয় সহ্যের প্রতীক।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে ওয়ার্ডসওয়ার্থের সে আদর্শিক পক্ষী বলা যায়।


www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান [ড. শহীদুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫।] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : স্মৃতিগত তাৎপর্য' প্রবন্ধে লিখেছেন:

'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, প্রধানত বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে, এই উপমহাদেশে এমন এক অনন্য প্রতিভা যার পরিচয় শুধুমাত্র প্রশংসার শব্দ উচ্চারণ করে দেয়া চলে না। তিনি জ্ঞানকে শুধু গ্রহণই করেছিলেন না, সর্বত্র সেই জ্ঞানের তাপকে ছড়িয়েছিলেন। ভাষা-সাধনার ক্ষেত্রে তার কৌতুহল এবং অন্বেষণের কৃতিত্ব অসাধারণ।'

'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ [আব্বা ও আমি ]' প্রবন্ধে মাহযুযা হক লিখেছেন:

'আব্বার স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর ছিলো। ক্লাসে বরাবর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন। সংস্কৃতে কিন্তু সব সময় প্রথম হতেন। ক্লাসের হিন্দু ছাত্ররা পণ্ডিত মশাইকে বলত, 'স্যার, আমরা বামুন কায়েতের ছেলে থাকতে আপনি ঐ মুসলমান ছেলেটাকে বরাবর ফার্স্ট করে দেন। আপনি অন্যায় করেন।'

এর উত্তরে পণ্ডিত মশাই বলতেন, 'আমি কি করবো, ওই সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভালো। তোরা তো তেমন লিখতে পারিস না।' 'পণ্ডিত মশাই আব্বার নাম মনে রাখতে পারতেন না, তাই সব সময় সিরাজুদ্দৌলা বলতেন।'

কাজী দীন মুহম্মদ তার 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ' প্রবন্ধে লেখেন:

'ক্ষণে ক্ষণে সূর্যরশ্মির বিভিন্ন কিরণের মতো বিভিন্ন ধারায় আমাদের সচেতন সচকিত করে দিয়ে তার কিরণ প্রভার আলোক সমান মহিমায় জাতিকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখা যায়। ঐতিহ্যের কোনো কোনো এলাকায় আমাদের জাতীয় জীবনের গতি প্রবাহে তেমনি একটি ধ্রুব নক্ষত্র ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।'

অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিব তার [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থ। ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ। ১৯৯০] 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জীবনে ও কর্মে' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন:

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বাঙালী হিন্দুদের সঙ্গে তুলনায় বাঙালী মুসলমানদের দানও যে নগণ্য ছিলো না, বরং ক্ষেত্রবিশেষ মুসলমানদের দান অগ্রণীর, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেও তিনি তা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।'

'তাঁকে বাংলাদেশের বর্তমান বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক বা পিতা বলা যায়। বাংলা ভাষা যে আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা ও বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত তার স্বাপ্নিক ছিলেন তিনি।'


www.nagorikpathagar.org

কবি সুফিয়া কামাল [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫] তার কবিতায় লিখেছেন:

বহুবিঘ্ন, প্রতারণা ছলে
অতিক্রম করি পদতলে
গাহন করিয়া তুমি জ্ঞানসিন্ধু নীরে
জয়ের মুকুটখানি লভিয়াছ শিরে।

শাহাবুদ্দীন আহমদ [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : তার সাহিত্য প্রবন্ধে] লিখেছেন:

'তার অধিকাংশ প্রবন্ধ ভাষা ও সাহিত্য কেন্দ্রিক। জীবনের দীর্ঘ সময়ের সাধনায় তিনি অনেক দেশের ভাষা শিখেছিলেন, শিখেছিলেন শব্দ ও ভাষা বিবর্তনের ইতিহাস। তারই তাত্ত্বিক কথা তিনি নানা ধরনের প্রবন্ধে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।'

শাহাবুদ্দীন আহমদ [সেপ্টেম্বর, ১৯৯১-এর কলমে প্রকাশিত 'শহীদুল্লাহ চলন্ত বিশ্বকোষ' প্রবন্ধে] লিখেছেন:

'ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, শিক্ষা, সংস্কৃতি বিষয়ের উপর প্রায় পৌনে দুশো বাংলা প্রবন্ধ, প্রায় শতাধিক ইংরেজি প্রবন্ধ, প্রায় ত্রিশটির মতো বাংলা ও ইংরেজি অভিভাষণ যা এখনো পুস্তকাকারে সংকলিত হয়নি- শহীদুল্লাহর পাণ্ডিত্যের স্বরূপ,গভীরতা ও চারিত্রকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। এই প্রবন্ধ ও অভিভাষণ মুদ্রিত হলেই তখন এই চলন্ত বিশ্বকোষের একটি মোটামুটি ধারণা আমরা লাভ করবো। আমরা বুঝব ডক্টর এনামুল হক, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ আলী আহসান, প্রফেসর আবদুল হাই এবং ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন তা উচ্ছ্বসিত উক্তি নয়- সত্য ভাষণ।'

## দুই.

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন বহুভাষাবিদ–পণ্ডিত–সাহিত্যিক–শিক্ষাবিদ। তাঁর পাণ্ডিত্যের অধিকার এবং খ্যাতির বহুবর্ণ প্রতিভাস তাঁকে দিয়েছে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর শিল্পিত আসন। তাঁর অসামান্য সাহিত্য সাধনা এবং অপরিমিত জ্ঞান-চর্চার ফলভার জাতি ও জাতীয়তাকে দিয়েছে অফুরন্ত আদর্শের নির্যাস।

অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তারও চেয়ে অধিককাল নিযুক্ত ছিলেন পাঠাভ্যাস আর সাহিত্য সেবার অবারিত স্বচ্ছতায়।


www.nagorikpathagar.org

ফলে তার সৃজনশীলতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে নানাবিধ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের প্রাবল্যে। একবার তাঁর বিরচিত বই এবং পাণ্ডুলিপির দিকে দৃষ্টিপাত করা গেলে নির্ণিত হবে যে, একটি স্বপ্নতাড়িত জাতির প্রতি দায়ভারকে তিনি কতোটা শাণিত ও সুষমামণ্ডিত করেছিলেন। তাঁর 'উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরাজি'র একটি তালিকা দিয়েছেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ। একটি 'মৌলিক গ্রন্থের' তালিকা দিয়েছেন ড. গোলাম সাকলায়েন। আমরা তাঁর একটি এখানে পত্রস্থ করলাম তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের জন্য মাত্র। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা–

**ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক :** ভাষা ও সাহিত্য [১৯৩১], আমাদের সমস্যা [১৯৪৯], বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত [ ১৯৫৯], বাংলা ব্যাকরণ [১৯৩৫], বাংলা সাহিত্যের কথা ১ম খণ্ড [১৯৬৩], বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড [১৯৬৫]।

**ধর্ম বিষয়ক:** অমিয়বাণী শতক [১৯৪১], মহাবাণী [১৯৪৬], বাইয়াত নামা [১৯৪৮], ইসলাম প্রসঙ্গ [১৯৬৩]।

**জীবনী :** ইকবাল [১৯৪০], শেষ নবীর সন্ধানে [১৯৬১]।

**অনুবাদ :** দিওয়ান-ই হাফিজ [১৯৩৭], শিকোয়াহ ও জওয়াবে শিকওয়াহ [১৯৪২], রুবাইয়াৎ-ই-উমর খৈয়াম [১৯৪২], বিদ্যাপতি শতক [১৯৫৪], আল কুরআন [অংশত প্রকাশিত]

**গল্পগ্রন্থ :** রকমারী [১৯৩২], গল্প সঞ্চায়ন [১৯৫৩]।

**সম্পাদনা :** আলাওলের পদ্মাবতী [১৯৫০]।

**সম্পাদিত পত্রিকা :** আঙ্গুর [শিশু পত্রিকা-১৯১০], মাসিক আল হেলাল [সহ-সম্পদক, ১৯৫৪], বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা [যুগ্ম-সম্পাদক, ১৯১০], The Peace [১৯১০], মাসিক বঙ্গভূমি [১৯৩৭], পাক্ষিক তকবীর [১৯৪৯]।

এছাড়াও তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রয়েছে যা এখনো সূর্যালোক দেখেনি। তিনি প্রায় দুই কুড়ি স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করেন।

## তিন.

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কেবল সাহিত্যের জন্যে সাহিত্যচর্চা করেননি। তিনি অনিবার্যভাবে অবিসংবাদিত এক সংস্কারকের ভূমিকা পালন করে গেছেন। জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে জ্ঞানী-শিক্ষিত-স্বাধীন-ধার্মিক-মহৎ-সাধক-স্বাদেশিক-আধুনিক-পরিশ্রমী-স্বাবলম্বী-অপরাজেয়-


www.nagorikpathagar.org

সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্যবাদী-আন্তর্জাতিক-আত্মসচেতন এবং অসাম্প্রদায়িক হবার অপরিমেয় অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন।

তাঁর প্রবন্ধগুলো ছিলো অসম্ভব পাঠ্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ; তাঁর যাবতীয় রচনায় ছিলো যথার্থভাবে সংস্থাপিত যুক্তির পরাক্রম; তাঁর সমুদয় অভিবাণী এবং অভিভাষণে ছিলো নির্ণিত পথনির্দেশ; তাঁর সমস্ত গবেষণা কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিলো অবশ্যম্ভাবী দম্ভাবেজের দৌরাত্ম্য বরং বিজ্ঞানসম্মত রায়ের রৌদ্রদীপ্ত প্রাখর্য।

ড. সুনীতি কুমার চট্টোপধ্যায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন:

'তিনি একজন সংস্কার-পূত চিত্তের মানুষ এবং এইরূপ মানুষ-ই Full man 'পূর্ণ মানুষ' অথবা ইনসান-আল-কামিল'-পদবীতে পহুঁছিবার পথে জয়-যাত্রা করিবার যোগ্য।'

আমরা এই পরিপূর্ণ মানুষটির সাহিত্য সম্পর্কিত সমূহ এবং সম্পন্ন চিন্তা-ভাবনার একটি সংগৃহীত প্রতিচ্ছবি উত্থাপনের প্রয়াস চালালাম:

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ [পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনী। কিশোরগঞ্জ ১৩৪৫। ১৯৩৮। বলেছেন :

> 'আজ আমাদের মহা-কাব্য, গীতি-কাব্য, কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস সবই পশ্চিমের ভাবে ভরপুর। বাঙ্গালী সাহিত্যিক, তুমি আজ ঘরের দিকে ফের। বিলাতী ডেজি, ড্যাফোডিল, ক্রিসানথেমমের চটকে গন্ধরাজ, জুঁই, বেলী, চামেলী, চাঁপা, অপরাজিতাকে উপেক্ষা করিও না। বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করা ভালোই, কিন্তু স্বদেশি ভাষা ও স্বদেশি সাহিত্যের সেবার ক্রটি করিও না।'

তিনি তাঁর একটি গ্রন্থের নিবেদনে বলেছেন–

> 'নিশ্চয়ই বাংলা সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহার ভাব বিদেশের আমদানী। খদ্দরের কাপড়ে আমরা বিলাতী সুট তৈয়ারী করিতেছি। দেশি খাটে শুইয়া বিলাতের স্বপ্ন দেখিতেছি।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রতা' সম্পর্কে [আল-এসলাম, ১৩২৩] উল্লেখ করেন:

> 'হে মুসলমান সহিত্যিক, তোমাকে তোমার অতীত গৌরব গাঁথা গাহিতে হইবে শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য। তোমাকে তোমার ইসলামের মাহাত্ম্য, ঔদার্য্য ঘোষণা করিতে হইবে- হিন্দুকে ঘৃণ করিবার জন্য নয়, হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য। তোমাকে কাব্য সঙ্গীত রচিতে হইবে– শুধু কানের তৃপ্তির জন্য নয়, প্রাণে নব উন্মাদনা, উচ্চ চিন্তা, তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। তোমাকে দর্শন বিজ্ঞানের আলোচনা


www.nagorikpathagar.org

করিতে হইবে শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, তোমার প্রতিভার জগৎকে মুগ্ধ করবার জন্য।'

সিলহট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে [১০-১০-৫৩ সন], সাহিত্য বিভাগের সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন:

'মুসলিম সাহিত্য বলিতে কি বুঝি, তা আমার দুইটি পুরাতন অভিভাষণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতেছি।

'আমাদের ঘর ও পর, আমাদের দুঃখ ও সুখ, আমাদের আশা ও ভরসা, লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে, আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কোরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে।'

'সাহিত্যের রূপ' প্রবন্ধে [১৩৩৬ সালে নেত্রকোনা মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীতে পঠিত] উল্লেখ করেছিলেন:

'মুসলিম সাহিত্য মানে নয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। আগেই বলেছি- প্রকৃত সাহিত্য সার্বজনীন না হ'য়ে থাকতেই পারে না।

রবীন্দ্রনাথের–

'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর-রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।'

- হিন্দুত্বের তুলি দিয়ে আঁকা, কিন্তু সে কি চোখের সামনে বৈশাখের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটিয়ে তুলে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সাহিত্য-রসিক মাত্রেরই মন মুগ্ধ করে না? অন্যদিকে পল্লী-কবি মনসুর বয়াতির মদীনা বিবির ছবিখানি একজন মুসলমানের হাতে আঁকা। কিন্তু তাই বলে কি রোঁমা রোঁলা প্রমুখ রসজ্ঞ সাহিত্যিক মাত্রকেই আজ মোহিত করছে না।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্বজাতীয় সাহিত্যের গুরুত্ব দিতে গিয়ে বলেছেন:

'পৃথিবীর কোনো জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হতে পারেনি। ইসলামের ইতিহাসে একেবারে গোড়ার দিকেই


www.nagorikpathagar.org

পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হ'য়েছিলো। পারস্য আরবের ধর্ম নিয়েছিলো, আরবি সাহিত্যের চর্চা করেছিলো। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়েনি।

'সিলহট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে [১০-১০-৫৩] বলেছিলেন:

'পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও কিছু প্রকারভেদ থাকিবে ইহার কারণ, পশ্চিম-বঙ্গ হিন্দুপ্রধান আর ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত আর ইসলামিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। এই Local colouring কিন্তু সাহিত্যের প্রাণধর্ম যে মানবীয়তা, তাহার বিরোধী নহে বরং তাহারই এক বিশেষ প্রকাশ ভঙ্গি।'

চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্র সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণে ব্যক্ত করেছিলেন:

'এখন নব্য বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যের যুগ। পুঁথি সাহিত্য মরা নদী, নব্যবঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ভরা নদী, এখন এইসব ভরা নদী দিয়েই সাহিত্য তরী চালাইতে হইবে। বঙ্গীয় হিন্দু সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের তৃষ্ণা মিটাইতে পারে না। সে সাহিত্য আমাদের বুকভরা আশা পুরাইতে পারে না। আমাদের সভ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা যাহা, আমাদের আকাংখা তাহা নহে। তাহারও বিশেষত্ব আছে। তাই আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য চাই। জাতীয় গৌরব দৃপ্ত অথচ বিশ্বমানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত, ধর্মবলে বলীয়ান অথচ জ্ঞানকর্মে মহীয়ান আমাদের ভবিষ্যৎ মুসলমান সমাজ গঠন করিতে পারে, এমন সাহিত্য চাই।'

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কিশোরগঞ্জ সম্মিলনীতে [১৩৪৫] বলেছিলেন:

'পল্লীর ঘাটে-মাঠে, পল্লীর আলো-বাতাসে, পল্লীর প্রত্যেক পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে। কিন্তু বাতাসের মধ্যে বাস করে যেমন আমরা ভুলে যাই যে বায়ু-সাগরে আমরা ডুবে আছি, তেমনি পাড়াগাঁয়ে থেকেও আমাদের মনে হয় না যে, কত বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে।'

সিলহট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে [১০-১০-৫৩] বলেছিলেন-

'অক্ষর বা রীতির বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সেবায় মন-প্রাণ সমর্পণ করুন।'

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মোয়াজ্জিন-এর প্রথম বার্ষিকী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

'এই সময়ের মত করে আমাদের সমাজ, সাহিত্য সব গড়ে তুলতে হবে। নইলে কিছুই টিকবে না।'

'আমি বিশ্বাস করি, পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব-বাংলার সাহিত্য অধিকতর সমৃদ্ধশালী হইবে। কারণ পশ্চিম বঙ্গের লোক সংখ্যা ২ কোটি আর পূর্ব-


www.nagorikpathagar.org

বঙ্গের লোক সংখ্যা ৪ কোটি। পশ্চিম-বঙ্গ ম্যালেরিয়াপূর্ণ ক্ষয়িষ্ণু, আর পূর্ব-বঙ্গ স্বাস্থ্যকর বর্ধিষ্ণু।'

'কোনো জাতির উন্নতির মাপকাঠি তাহাদের ধনৈশ্বর্য্য কিংবা রণসম্ভার নহে। সাহিত্যই তাদের উন্নতির ও গৌরবের একমাত্র পরিচায়ক।'

১৩৬৬ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নেত্রকোনা মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণে বলেন:

'আমাদের সাহিত্য কখনও তার সর্বাঙ্গ সুন্দররূপে দেখা দিবে না, যে পর্যন্ত না আমাদের জাতীয় পূর্ণতা সাধিত হয়। তাই চাই, আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তি আমাদের সাহিত্যের পরিপূর্ত্তির জন্য।

'একটি পরাধীন জাতির মনে যে সাহিত্য স্বাধীনতার উগ্র বাসনা জাগাতে না পারে, স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতির প্রত্যেক নরনারীর যে গুণের প্রয়োজন, সেই গুণগুলির জন্য আগ্রহ যদি মনে না আনতে পারে,তবে বুঝতে হবে সে সাহিত্য জীবনের জন্য নয়। তাতে যতোই কোনো আনন্দ থাকুক, যতোই কেনো আনন্দ উদ্দাম থাকুক, যতোই কেনো প্রকৃতির নিখুঁত চিত্রাঙ্কন থাকুক জাতির অভাব মোচন না হলে কেবল তার বিশুদ্ধ আনন্দের জন্য সাহিত্য হতে পারে না।'

[মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ললিতকলা বলাকা বার্ষিকী। ১৯৬৪]

'সাহিত্য শিক্ষিত মনের অভিব্যক্তি। চিন্তার স্বাধীনতার মধ্যেই ভাষার উৎকর্ষ ও সীকর্ষ নিহিত তাই স্বাধীনতা থাকা উচিত। ...

'সাহিত্য সার্বজনীন এবং মানব মনের প্রতিচ্ছবি। বর্তমানের প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষার সংস্কার। এই সংস্কার সাধিত হইলে সমৃদ্ধি লাভ করিবে এবং যাহা উপযুক্ত তাহাই গৃহীত হইবে।'

[মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য সমস্যা। গিল্ড সিম্পোজিয়াম। এপ্রিল, ১৯৬১]

আলাপনী মজলিস বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী অভিভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন:

'... সাহিত্য– আমি বলি যদি সে প্রকৃত সাহিত্য হয়, তবে তার ধ্বংস নেই। ... জাতির জনবল, ধনবল, বাহুবল, অস্ত্রবল কাল সমস্তই লোপ করে দেয়, শুধু লোপ করেতে পারে না তার সাহিত্য রত্নকে।'



www.nagorikpathagar.org

চার.

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাহিত্য চিন্তা ছিলো সন্দেহাতীতভাবে জাতীয়-সাহিত্য-চিন্তার বারিদবোধিত আকাশের পরিপ্লাবী ও পরিপ্লুত বারিধারা। বাংলা সাহিত্য-মৃত্তিকার সমূহ উর্বরতা বাড়াবার লক্ষ্যে, সে বারিধারার সঞ্চায়নে ও সিঞ্চনে আমাদের হিতাহিত-তৎপরতার বড় বেশি প্রয়োজন।

কেননা, সাহিত্য গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদের ভাষায়:

> 'তিনি [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ] যেমন তাঁর জাতিকে দেশীয় সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে মূলত বলেছিলেন, তেমনি ইসলামী সাহিত্য রচনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন।'

পরিমার্জিত সাহিত্য চৈতন্যের প্রকৃষ্ট আয়ত্ত ও আয়তনে এখনও তিনি অসাধারণ।

সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায়:

> 'শহীদুল্লাহ সাহেব ছিলেন জ্ঞানের মহিমায় এবং প্রজ্ঞার অধিকারে দীপ্তিমান। কিন্তু সর্বমুহূর্তের আচরণে ছিলেন নিরহংকার এবং সরল। সময়ের প্রেক্ষাপটে এখনও তাঁকে অনন্য সাধারণ মনে হয়।'
>
> 'অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ বিচার–বুদ্ধিসম্পন্ন মনীষী ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার যে প্রস্তাবনা রেখেছেন, সেগুলোকে অবলম্বন করেই আমরা বিবিধ প্রকার গবেষণা কর্মে অগ্রসর হতে পারব।'
>
> [ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ-বাংলা একাডেমি, ঢাকা]।

সমৃদ্ধ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং তার সমৃদ্ধ সাহিত্যচিন্তা আমাদেরকে জাগরিত চৈতন্যের উৎপিপাসু করুক, উত্তরাধিকার করুক।


www.nagorikpathagar.org

# কথাশিল্পী জামেদ আলী এবং তাঁর সাহিত্যচিন্তা

**এক.**

জামেদ আলী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৩-এর ২৫ আষাঢ় মেহেরপুর জেলার আমঝুপী গ্রামে। এ প্রসঙ্গে জামেদ আলী তার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'সে সময় মেহেরপুর জেলা হিসেবে পরিচিত ছিলো না। সেটা ছিলো নদীয়া জেলার একটি মহকুমা শহর। আমাদের আসল বাড়ি ছিলো নদীয়ার কাশিমপুর থানার শিকারপুর গ্রামে। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর আমরা সপরিবারে ভারত ছেড়ে তদানীন্তন পাকিস্তানে চলে আসি।' জামেদ আলী মেট্রিকুলেশন পাস করেন ১৯৫৬ সালে। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন ১৯৫৮ সালে কুষ্টিয়া কলেজ থেকে। বি.এ পাশ করেন ১৯৬০ সালে। বি.এড পাস করেন ১৯৬৬ সালে এবং ১৯৬৭ সালে হোমিওপ্যাথিক পরীক্ষায়ও পাস করেন।

জামেদ আলী শিক্ষকতা করেছেন ১০ বছরের মতো। প্রায় এক যুগ। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারীও করেছেন। ঢাকার বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ প্রতিষ্ঠান 'গ্রীন হোমিও হলে'ই ডাক্তার হিসেবে চাকরি করেছেন [১৯৮২-১৯৯৫] এক যুগ। একজন হোমিও চিকিৎসক জামেদ আলী প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১৯৫৬ সাল জামেদ আলীর জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তার ছেলে আহমাদুল্লাহ 'আমার আব্বা জামেদ আলী' নামের একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, ১৯৫৬ সালের ২৭ জুন মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করে চলে এলেন কুষ্টিয়া কলেজে। এখানে তিনি বোর্ডিং এ থাকতেন। কিছুদিন উকিল আনিসুর রহমান সাহেবের বাড়িতে লজিং ছিলেন। এ সময় তার নাটক চর্চা ও সাহিত্য রচনা ছিলো তুঙ্গে। তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তান, পয়গাম প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে তার বিভিন্ন কবিতা, গল্প। 'বিজয়িনী' নামে তিনি একটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। নাটক করতেও তিনি ছিলেন খুব তৎপর। এ সময় দেবদাস, পথের শেষ, এই তো জীবন, হংস বধ প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়



www.nagorikpathagar.org

করেছেন। গ্রামে থাকাকালীন তিনি 'ঈমান যাত্রা'য় 'কাশেমে'র চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।'

জামেদ আলী বিকশিত হতে থাকেন এ সময় থেকেই।

১৯৭৮ সালে জামেদ আলী একবারে লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ সময় তিনি নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছিলেন।

১৯৮০'র দিকে তিনি আবারও সাহিত্য চর্চায় সক্রিয় হন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক গবেষক-অনুবাদক-চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক আবদুল মান্নান তালিবের অনুপ্রেরণা জামেদ আলীর জন্য এ সময় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলো।

## দুই.

জামেদ আলীর প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা চারটি। এক. অরণ্যে অরুণোদয় [১৯৮৪], দুই. লাল শাড়ী [১৯৮৫], তিন. মুনীরা [১৯৮৬], চার. মেঘলামতির দেশ [১৯৮৮]। তার অপ্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা দু'টি। এক. 'রঙ বদলায়', এটি আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাস। রং বদলায় উপন্যাসটির 'লালু' চরিত্র জামেদ আলী নিজেই। দুই 'এই রোদ এই বৃষ্টি'। জীবনের শেষ দিনগুলোতেই তিনি এই উপন্যাসটি লিখেছিলেন।

জামেদ আলীর প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ দুটি। এক. গোধূলিতে [১৯৮৬। দুই. মধুচন্দ্রিমা [১৯৯১]।

প্রায় পঁচিশটির মতো গল্প জামেদ আলীর এখনও অপ্রকাশিত।

জামেদ আলী চেয়েছিলেন সব শাখাতেই বিচরণ করতে এবং সে মেধাও তার ছিলো। জামেদ আলী নিজেই বলেছেন, 'আমার ইচ্ছে ছিলো সাহিত্যের সব শাখাতেই আমি সাধ্যমত কাজ করবো। কিন্তু সব ইচ্ছাই তো আর মানুষের পূর্ণ হয় না।'

তবু দেখা যায়, জামেদ আলী প্রবন্ধ, কবিতা এবং গান রচনায়ও উদ্যোগী হয়েছিলেন। পঁচিশটির মতো প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাঁর এখনও অপ্রকাশিত। অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা প্রায় অর্ধশত। অগ্রন্থিত গানের সংখ্যাও কম নয়। কিছু চমৎকার হামদ, না'ত এবং ইসলামী গান বিভিন্ন সংকলনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জামেদ আলীর জীবন-কালে গ্রন্থ-প্রকাশ শুরু হয়েছিলো ১৯৮৪-তে এবং শেষ হয়েছে ১৯৯১-তে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে সাহিত্য-কর্মকাণ্ডে নিমগ্ন হয়েছিলেন ৮০'র দশক থেকে। শেষ করে গেছেন ৯০'র মাঝামাঝি। মাত্র ১৪/১৫ বছরের মধ্যে জামেদ আলী প্রতিভার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, এককথায় তা বিস্ময়কর।


www.nagorikpathagar.org

## তিন.

জামেদ আলী সম্পর্কে তার জীবদ্দশাতেই আলোচনা শুরু হয়েছিলো। তার ইন্তেকালের পরে সেই ধারা আর অব্যাহত থাকেনি। তাঁকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এমন দু'একজনই কেবল লিখেছেন। আদর্শবাদী লেখক-ঔপন্যাসিক না হলে তার মূল্যায়ন সম্ভবত আরো দ্রুত হতো।

তার জীবনকালে তার সাহিত্যিক-জীবন সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো। তার লেখা সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিলো দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক ইত্তেফাক, সচিত্র বাংলাদেশ, মাসিক পৃথিবী, মাসিক কলম এবং পরিজনে। লিখেছিলেন, সর্বজনাব ড. আশরাফ সিদ্দিকী, শাহাবুদ্দীন আহমদ, জয়নুল আবেদীন আজাদ, মুহম্মদ শফি, সোলায়মান আহসান, মোশাররফ হোসেন খান, আহমদ মতিউর রহমান, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী।

জামেদ আলীর একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিলো মাসিক কলমের ১৯৮৭ সালের নভেম্বর সংখ্যায়। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন কবি-সাংবাদিক মাহমুদ হাফিজ। প্রকৃত জামেদ আলীকে উন্মোচিত করার জন্যে সাক্ষাৎকারটি সত্যিই মূল্যবান।

জামেদ আলী ইন্তেকালের আগে ও পরে অবশ্য দৈনিক সংগ্রাম [সংগ্রাম সাহিত্য], মাসিক কলম, সোনার বাংলা [সোনার বাংলা সাহিত্য] গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খন্দকার আবদুল মোমেন-সম্পাদিত– 'প্রেক্ষণ'-এ সম্প্রতি কথাশিল্পী জামেদ আলী সম্পর্কে একটি সংযুক্ত ক্রোড়পত্র বের হয়েছে। ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। সংখ্যাটি ভাষা দিবস সংখ্যাও বটে। বেশ কয়েকটি মূল্যবান লেখা আছে এই ক্রোড়পত্রে। লিখেছেন, সাহিত্য-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদ, গবেষক-চিন্তাবিদ আবদুল মান্নান তালিব, কবি-সাংবাদিক মাহমুদ হাফিজ, প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক হোসেন মাহমুদ, মোশাররফ হোসেন খান, মোহাম্মদ লিয়াকত আলী, খন্দকার আবদুল মোমেন এবং কথাশিল্পী জামেদ আলীর পুত্র আহ্‌মদুল্লাহ।

কবিতা লিখেছেন কবি গোলাম মোহাম্মদ, মহিবুর রহিম, রফিক মুহাম্মদ লিটন প্রমুখ। 'প্রেক্ষণে' প্রকাশিত 'কথাশিল্পী জামেদ আলীর জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি' তথ্য নির্ভর এবং যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

কথাশিল্পী জামেদ আলীর গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থার অবদান অবিস্মরণীয়। এক্ষেত্রে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' অগ্রগণ্য। 'সৃজন প্রকাশনী' এবং 'সুরুচি প্রকাশনী'র অবদানও উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের যথার্থ বিচারে সৃজন প্রকাশনী প্রকাশিত 'মেঘলামতির দেশ' একটি অসাধারণ উপন্যাস হিসেবে


www.nagorikpathagar.org

বিবেচিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। 'লাল শাড়ী' দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে 'সংগ্রাম সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়েছিলো। এক্ষেত্রে কবি-সম্পাদক-কলামিষ্ট সাজজাদ হোসাইন খানের আন্তরিকতা ছিলো সুরভিত আন্তরিকতা, আলোকিত আন্তরিকতা। মূলত 'লাল শাড়ী'ই কথাশিল্পী জামেদ আলীর পাঠকপ্রিয়তা এনে দেয় রাতারাতি।

## চার.

কথাশিল্পী জামেদ আলী, ড. আশরাফ সিদ্দিকী এবং শাহাবুদ্দীন আহমদের মতো উঁচুস্তরের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রথম থেকেই। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ প্রতিভাধর তরুণ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেই সব প্রতিভাধর তরুণ সমালোচকদের মধ্যে কবি সাংবাদিক আহমদ মতিউর রহমান, কবি সাংবাদিক মাহমুদ হাফিজ প্রমুখ স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন। ঠিক এখনই এদের সব লেখা যদি আমার সামনে থাকতো, তাহলে আমি আমার উল্লেখিত মন্তব্য 'কথাশিল্পী জামেদ আলী তরুণ সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সবচেয়ে বেশি' আরো শাণিত করতে পারতাম।

আমার হাতের কাছে দু'একটি প্রবন্ধ যা আছে তা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কবি মোশাররফ হোসেন খান লিখেছেন, 'জামেদ আলীর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব যে, আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'লাল শাড়ী' বা 'মুনীরা'র মতো উপন্যাস লেখার সাহস করলেন। সাহস বলছি এই অর্থে, অনেকের ধারণা ছিলো, আদর্শ-ঐতিহ্য, শালীনতার সংমিশ্রণে আর যা-ই হোক উপন্যাস লেখা যায় না। উপন্যাস মানেই তো ডিমের সাথে লবণের সম্পর্ক। অর্থাৎ তাতে স্থূল যৌন-কামোদ্দীপক কিছু থাকতে হবে। তা না হলে আর উপন্যাস কিসের? কিন্তু জামেদ আলী তার পরপর প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসে প্রমাণ করলেন যে, না যৌনতা ছাড়াও বাংলা উপন্যাস লেখা যায়।'

কবি-সাংবাদিক মাহমুদ হাফিজ লিখেছেন, 'ইতিপূর্বে তার আরো কয়েকটি উপন্যাস পড়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রত্যেকটি রচনাই চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত। আকর্ষণীয় চরিত্রে ভরপুর। তার কাহিনী উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণে শব্দের যে মাধুর্যময় দ্যোতনার ব্যবহার, তা অতি সহজেই পাঠকদের মুগ্ধ করতে পারে।

প্রবীণ সাহিত্যিক ও গবেষক আবদুল মান্নান তালিবের মূল্যায়ন আরো তীক্ষ্ণ এবং আরো জোরালো। তিনি বলেছেন, 'একজন মুসলিম কথাশিল্পীর জন্য যথার্থ ইসলামী সমাজের চিত্র অংকন দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে মুসলিম


www.nagorikpathagar.org

চিত্র আঁকবেন, তার মধ্যে ইসলাম থেকে বিচ্যুতির প্রতি অংগুলি নির্দেশ করা তার পক্ষে কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। জামেদ আলী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেছেন।'

আর এক প্রবীণ সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ কী চমৎকারভাবেই না বলেছেন, 'আসলে তিনি ছিলেন জীবন-শিল্পী। তিনি তার 'মুনীরা', 'লাল শাড়ী', 'মেঘলামতির দেশ' এবং গল্পের বই 'মধুচন্দ্রিমা'তে সেই জীবনকে এঁকে গেছেন।'

## পাঁচ.

কথাশিল্পী জামেদ আলী ছিলেন যথার্থ জীবন-শিল্পী। সেই কারণে জীবনকে শুদ্ধতম শিল্পালোকে আলোকিত করবার জন্যে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন চিরকালীন আনুগত্যের এক সোনালী সংবিধান। এই আনুগত্যের মধ্যে, দারুণ দুর্দশার ভেতরেও তিনি খুঁজে পেতেন এক ধরনের তৃপ্তি, এই নিয়ে তার হীনমন্যতা ছিলো না, ছিলো আত্মগৌরব এবং যে সংবিধানকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন সে সংবিধানের প্রতিটি বিষয়ই তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। সেই আলোকে নিজেকে সুসজ্জিত করার প্রয়াস পেতেন।

হ্যাঁ, জীবন-শিল্পী জামেদ আলী ক্রমাগত ত্রিশটি বছর ইসলামী জীবন-বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে আপস করেননি কখনো। পিছু হটেননি। তাই তার আদর্শবাদিতার ছাপ পড়ে তার জীবনে, জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে। আগেই উল্লেখ করেছি, এ ব্যাপারে তার কোনো হীনমন্যতা ছিলো না। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি যখন এই [ইসলামী] মহান আন্দোলনের সাথে যুক্ত হই, তখন আমার হাতে একগাদা পাণ্ডুলিপি। কিন্তু এই আন্দোলনের স্বার্থেই সেগুলোকে আমি পরিত্যাগ করি। প্রায় বারো বছর পরে যখন আমি জানতে পারি সাহিত্য চর্চা তো বিপরীতধর্মী নয়ই এবং সহায়ক, তখন আবার কলম তুলে নিই। যে সত্যকে আমি জেনেছি তার উজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাতেই তো আমার এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।'

একদা কথাশিল্পী জামেদ আলীকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'লিখতে গিয়ে কোনটির উপর বেশি গুরুত্ব দেন?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার মনে একটা আদর্শবাদ বাসা বেঁধে আছে, আমার ভাষারও একটা সীমিত সাধ্য আছে, তারপর কাহিনীও তো যে কোনো গল্পের জন্য দরকারী জিনিস।'

সত্যিই জীবন-শিল্পী জামেদ আলীর মধ্যে আদর্শবাদ বাসা বেঁধেছিলো। আর আদর্শবাদ বাসা বেঁধেছিলো বলেই তার গোটা সৃজনশীলতার মধ্যে আছে মানব


www.nagorikpathagar.org

এবং মানবতার প্রতি এক অপরিসীম দরদ। তিনি লিখেছেন, 'আমার তো স্পষ্ট করে বলা উচিত আমি মানুষের একমাত্র বিশ্বজনীন আদর্শের অনুসারী। সমগ্র মানবমণ্ডলীর বেদনায় আমার প্রাণ কাঁদে।'

সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, জামেদ আলীর মতো জীবন-শিল্পীরাই নির্মাণ করে নতুন ধারা, নতুন গতিধারা। আবদুল মান্নান তালিব যথার্থই বলেছেন, 'নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন থেকে নিয়ে কাজী ইমদাদুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শাহেদ আলী, মিন্নাত আলী পর্যন্ত কথা সাহিত্যিকগণ মুসলিম ধারাটিকে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জামেদ আলী এই ধারায় একটি বলিষ্ঠ সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন।'

আবদুল মান্নান তালিব আবারো বলেছেন, 'জামেদ আলী বাংলা কথা-সাহিত্যের মুসলিম ধারায় একটি নতুন ও সার্থক সংযোজন করেছেন।'

এই প্রসঙ্গে মাহমুদ হাফিজ লিখেছিলেন, 'লেখক জামেদ আলী যে নতুন ধারায় নিজের বিশ্বাস ও কর্মের ভিত্তিতে সাহিত্য রচনা শুরু করেছেন এটা ভবিষ্যৎ জামেদ আলীর স্টাইল হিসেবেও পরিচিতি লাভ করতে পারে। কে জানে আজকের জামেদ আলীই ভবিষ্যতে এক নতুন ধারার দিকপাল হবেন না?'

সেই জন্যে জামেদ আলীর মূল্যায়ন আরো ব্যাপকভাবে এবং গভীরভাবে হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন তার সমালোচনাগুলো নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ হওয়া। প্রবীণ এবং তরুণদের প্রকাশিত সমালোচনাগুলো নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং কথাশিল্পী জামেদ আলীর ওপর সেমিনার-আলোচনা অনুষ্ঠান করা এবং তাঁকে নতুনভাবে মূল্যায়নের জন্য সর্বশ্রেণীর সমালোচক-গবেষকদের এগিয়ে আসা। সর্বোপরি তার রচনাবলী [সমগ্র] প্রকাশিত হওয়া। এ ছাড়া নতুন প্রজন্মের কাছে 'নতুন ধারার দিকপাল'কে [কথাশিল্পী জামেদ আলীকে] তুলে ধরা অসম্ভব।

## ছয়.

একজন আলোচক বলেছেন, 'কথা সাহিত্য যিনি বয়ান করেন তিনি 'কথক' নন একজন গল্পকার।' অর্থাৎ কথাসাহিত্যের নির্মাণ বস্তু গল্প, কথামালা নয়। কথামালার কিস্‌সা দায়িত্বহীন স্বাধীনতায় পরিবেশিত হতে পারে। কিন্তু একজন গল্পকারের হাত-পা বাঁধা। তিনি হয়তো অবতারণা করতে পারেন রূপকথা, প্রকৃতি প্রেম প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারের। কিন্তু শর্ত থাকে যে, এই সমস্ত সমাজ-মানুষ-সময়ের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত থাকবে। এর অন্যথা হবার জো নেই।' গল্পকার জামেদ আলী সমাজ- মানুষ-সময়ের ব্যাখ্যায় আন্তরিকভাবেই অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। কথাশিল্পী হিসেবে জামেদ আলীর খ্যাতি এসেছিলো


www.nagorikpathagar.org

প্রচুর। অনেকের মতে, তার গল্পগুলো বরং বেশি মেধাবী এবং শক্তিধর। জামেদ আলীর ক্ষমতা-সামর্থ্যের যথার্থ উদ্বোধন ঘটেছিলো তার গল্পে।

আধুনিক গল্পকার হিসেবে তার অবস্থান জাতীয় পর্যায়ে; অন্তত এই একটি জায়গায় তিনি অবশ্যই অপরাজিত। মনে হয় গল্পের ব্যাপারে তার সাবধানতা ছিলো মজ্জাগত। এ ব্যাপারে তিনি নিজেই বলেছেন, 'একপিট গল্পকে পাঠক মনে নাড়া দেবার মতো শক্তি অর্জন করতেই হবে। উত্তীর্ণ গল্প সেইটিরই হওয়া উচিত যা পাঠককে না পড়িয়ে ছাড়ে না, তার সাসপেন্স এবং আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পাঠক সামনের দিকে এগিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গল্পটি শেষ হলে নতুন অভিজ্ঞতা ও আস্বাদে পাঠক মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। এমন একটি গল্পকেই আমি উত্তীর্ণ গল্প বলি। গল্পে একটি শিল্পকলা ফুটে ওঠা উচিত। তবেই তা রসিক পাঠকের মনোরঞ্জন করবে এবং তাকে আবিষ্ট করে রাখবে। যে রচনার প্রতিটি পঙ্‌ক্তি দূরে থাক, প্রতিটি পৃষ্ঠাতেও পাঠক শিল্পের চমৎকারিত্ব খুঁজে পায় না, তেমন রচনা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ। এ ধরনের শিল্পকর্ম স্রেফ পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু না।' একটি উত্তীর্ণ গল্প সম্পর্কে গল্পকার জামেদ আলীকে সমালোচনা করা যাবে কিন্তু উপেক্ষা করা অসম্ভব।

গল্পকার জামেদ আলী এখনো অনাবিষ্কৃত। তার গল্পের সপ্ত রং এখনো অনেকের চোখে আবর্তিত হয়নি।

## সাত.

কথাশিল্পী জামেদ আলী তার সমগ্র রচনায় জীবনের কথা বলেছিলেন। যে জীবন এ দেশের অধিকাংশ মানুষ উদযাপন করে, যে জীবনের প্রক্রিয়ায় মানুষ অনবরত মার খায়; শোষিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, যে জীবন কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় কিন্তু পুনরায় আলোর উদ্ভাসে পুলকিত হয়, যে জীবন বন্দীদশায় গ্রন্থিত হয় কিন্তু আবারও চিরকালের মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মূলত সার্বত্রিক চিন্তা-ভাবনা স্বচ্ছ না হলে ঠিক ঐভাবে জীবনের কথা বলা যায় না। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, সে জীবন চিন্তা হোক, সে জগৎ-চিন্তা হোক, সে পরলোক চিন্তা হোক, সর্বচিন্তায় জামেদ আলী ছিলেন স্বচ্ছ ও অনাবিল। আপাতত আমাদের আলোচনা তাঁর সাহিত্য চিন্তা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক জামেদ আলী বলেন, 'আমি একজন লেখক, একটি বিশেষ সমাজে আমার জন্ম। পৃথিবীর আলো-বাতাসে চোখ মেলবার পরই আমার চার পাশে আমি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দেখতে পেয়েছি। আমার লেখায় যদি সেই পরিমণ্ডলের কথা থাকে, তার জীবন-দর্শনের লালন-প্রত্যাশা থাকে, আর তা যদি সাম্প্রদায়িকতা হয়, তাহলে আমি বলবো পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্য এই দোষ থেকে মুক্ত নয়।' সাহিত্যে হীনমন্যতা সম্পর্কে জামেদ আলীর বক্তব্য ছিলো তীক্ষ্ণ, সেই সঙ্গে তীব্রও।


www.nagorikpathagar.org

তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর থেকে শুরু করে, হাল জামানার শীর্ষেন্দু-সুনীলের সাহিত্য পাঠের সময় মন্দির, মন্ডপ, পূজা-পার্বন, দেব-দেবী ইত্যাকার শব্দের ছড়াছড়ি দেখেও যাদের শ্রবণেন্দ্রিয় কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে না, তারাই মুসলমান লেখকের নামাজ, রোযা, মসজিদ, জায়নামাজ প্রভৃতি দু-একটি শব্দ শুনে কানে ব্যথা অনুভব করেন। আমার মনে হয়, এটা ঐ শব্দগুলোর দোষ নয়, কানেরই দোষ। দীর্ঘদিন সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যাপারে যারা উঞ্ছবৃত্তির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে স্বকীয়তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন, তাদের আত্মসচেতনতাই গেছে হারিয়ে। সেই সব ময়ূরপুচ্ছধারী কাকদের কটু সম্ভাষণ না পেলে কিভাবে বুঝবো যে, আমি ঠিক পথে আছি?'

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আদর্শনিষ্ঠ জামেদ আলী ছিলেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। এ ব্যাপারেও স্পষ্ট বক্তব্য রেছে গেছেন তিনি। তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রদায়িক তাকেই বলা যায়, যে বলে 'মাই নেশন-রাইট অর রং'। তার ভালোটা তা ভালোই, মন্দটাও ভালো বলে সে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। তার হিংস্র-নেকড়ে সমাজের অধিকারটাই একমাত্র অধিকার বলে স্বীকৃত হতে হবে, অন্যেরটা নয়। আর এটি একটি খোদানুগত নিষ্ঠাবান আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমাদের লেখায় কি কোথাও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর মতো ইঙ্গিত দেখা যায়? হতে পারে লেখার কোথাও কোথাও মানবগোষ্ঠীর কোনো মন্দ আচরণের সমালোচনা এসেছে, সেখানে তো হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান বলে বিদ্বেষপ্রসূত কোনো বিভাগ করা হয়নি। সবারই দোষ-ত্রুটি একই নিরিখে পরখ করা হয়েছে।'

জামেদ আলী এক বিদ্রোহী কথাশিল্পীর নাম। যিনি বিদ্রোহ করেছিলেন ব্যক্তিগত জীবনে, যাবতীয় অনাচার এবং অসংগতির বিরুদ্ধে, অসত্য এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ভয় এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, অবিশ্বাস এবং সংশয়ের বিরুদ্ধে, কুসংস্কার এবং কুশাসনের বিরুদ্ধে, অবক্ষয় এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সাহিত্য জীবনেও এর অন্যথা করেননি।

মানবতার জন্যে, তার সার্বত্রিক উৎকর্ষের জন্যে সংগ্রামী সৈনিকদের মৃত্যু নেই; তাই মানুষ এবং জীবন-শিল্পী জামেদ আলীরও মৃত্যু নেই।

## তথ্য নির্দেশ

১. মাসিক কলম, ১৯৮৭, নভেম্বর সংখ্যা।
২. প্রেক্ষণ, ক্রোড়পত্র, কথাশিল্পী জামেদ আলী সংখ্যা।
৩. কায়েস আহমেদ: নিরাবেগ বোঝাপড়া, সুশান্ত মজুমদার ।
৪. অন্যান্য পত্র পত্রিকা।


www.nagorikpathagar.org

# ঈদুল ফিতরের তাৎপর্য

ঈদের একটি অর্থ হচ্ছে খুশি, কিন্তু আরবি ভাষাবিজ্ঞানীরা 'ঈদ' শব্দের আরো দু'টি মর্মার্থের কথা অনুসন্ধান করেছেন। একটি হচ্ছে 'ফিরে আসা'। প্রতি বছরই অসম্ভব আনন্দের এবং উপঢৌকনের অধিকার নিয়ে ফিরে আসে বলেই ঈদের উৎসব খুশির উৎসব; কল্যাণ এবং পবিত্রতার উৎসব। অন্য আর একটি অর্থের উদ্ভব ঘটবে তখনই, যখন আরবি 'আদত' শব্দটি হবে ঈদ শব্দটির উৎসকেন্দ্র। মানুষ তার চিত্তকে শাসন করলো, রমজানের কৃচ্ছ্রতায়-ত্যাগে-সাধনায় পরিপূর্ণতাকে জয় করলো এবং এভাবেই প্রত্যাবর্তন করলো আপন স্বভাবের সান্নিধ্যে। সুতরাং 'আদত' থেকে [অভ্যাস থেকে] ঈদ শব্দটির উৎপত্তি ঘটলো বলে প্রতীকগত ব্যঞ্জনায় এই শুদ্ধতম উৎসব মানবীয় প্রবণতার সমীপবর্তী হয়ে উঠলো, উল্লাসময় উদযাপনের নিকটবর্তী হয়ে উঠলো।

গ্রহণযোগ্য অর্থে ফিতর হচ্ছে ভাঙ্গা, বিচূর্ণ করা। মূলত ঈদের দিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো সওম ভঙ্গ করা। রাসূলে খোদা (সা.) রোজা ভঙ্গ করতেন সুমিষ্ট খেজুর খেয়ে, অর্থাৎ ঈদের এই দিনটি তিনি উন্মুখর করতেন একটি স্বাদ এবং পরিপক্ক ফল গ্রহণের মধ্য দিয়ে। তাই ঈদুল ফিতর হচ্ছে সওম ভঙ্গ করার ঈদ। আবার ফিতর যদি 'ফিতরত' থেকে নির্গত হয়, তাহলে ঈদুল ফিতরের অর্থ দাঁড়াবে স্বভাব সঙ্গতভাবে ঈদ, প্রকৃতিসম্মত ঈদ। স্বভাবসম্মত কথাটির চমৎকার ব্যবহার করেছেন ইমাম ইবনে তাইমিয়া। তার ব্যবহারের ক্ষেত্র ইসলাম হলেও :

'ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিরোধী নয় বরং স্বভাব-প্রকৃতিকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার জন্যে সে নির্দেশ করে।'

ঐ স্বভাব-প্রকৃতির তাৎপর্য ঈদের তাৎপর্যের পরিবৃত্তিতেও উপযুক্ত। সেই কারণে ঈদুল ফিতরের ভিতর দিয়ে মানুষের স্বভাবের শাশ্বত প্রোৎসাহনই ঘটে গেছে। যে স্বভাব অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও অহংকার অবদমনের উত্তরাধিকার থেকে অর্জিত হয়েছিলো।



www.nagorikpathagar.org

স্বভাবের সাথে আনন্দের সম্পর্ক কিন্তু চিরকালীন। সুতরাং স্বভাব যখন পবিত্র হয় এবং আনন্দের উপাত্তও যখন পবিত্র হয়– তখন আমাদের পরিমণ্ডলও একটি প্রদীপ্ত উত্তেজনায় সাফল্যমণ্ডিত হয়। আমরা অনুভব করি প্রাপ্তি ও পুরস্কারের কোমলাঙ্গ স্পর্শ। ঈদের মহিমা তো এখানেই যে, ঈদ আমাদের আঙিনায় নিয়ে এসেছে স্বভাবের পূর্ণতা এবং আনন্দের পরিপূর্ণতা।

প্রত্যেক জাতির উৎসব আছে, উৎসবের উপঢৌকন আছে, কিন্তু একটি সুসম্পাদিত জাতি হিসেবে মুসলমানের আনন্দের স্বভাবের মধ্যে প্রকীর্তিত ব্যবধান দূরনিরীক্ষ নয়। একটি হাদীসের ব্যাখ্যার মধ্যে আমরা এ বিষয়টিকে উন্মোচিত হতে দেখি:

রাসূলে খোদা (সা.) মাতৃভূমি ত্যাগ করলেন। আল্লাহর নির্দেশের ঔদার্যে মদিনায় উপস্থিত হলেন এবং একদা লক্ষ্য করলেন মদিনার লোকেরা উদ্‌যাপন করে একে একে দু'টি জাতীয় উৎসব। তাঁর কৌতূহল জাগ্রত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এই যে তোমরা দুই-দু'টি জাতীয় উৎসব পালন করে থাকো, এই দু'টি উৎসবের তাৎপর্য কি? কিসের উপর ভিত্তি করে তোমরা এ দিবস দু'টি উদযাপন করো? উত্তর এলো– ঠিক জানি না, কেনো? কিসের জন্যে যে এ উৎসব আমরা পালন করি, তা বলতে পারবো না। তবে পালন করে আসছি বাপ-দাদার আমল থেকে এবং অনিয়ন্ত্রিত আনন্দ-ফূর্তির মধ্য দিয়ে, অবাধ আচরণের মধ্য দিয়ে, অসংগত খেলা-ধূলার মধ্য দিয়ে। রাসূলে খোদা (সা.) বৃত্তান্ত জেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত দিলেন– আল্লাহ তোমাদের জন্য ঐ দুটি উদযাপনের চেয়েও উত্তম অন্য দু'টি উদযাপনের উদ্‌যোগ করেছেন– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এখন থেকে তোমরা এ দু'টি উদ্‌যাপনেরই উদ্‌যোগ করবে। আনন্দ ও স্বভাবের উৎস হিসেবে পালন করবে। নিঃসন্দেহে ঈদুল ফিতর উৎসবের আধিপত্যকে স্বাগত করে। স্বভাব ও আনন্দ অধীতায়নে বিধি-নিষেধকে অধিকতর শ্লথ করে দেয়। কিভাবে? এরও একটি প্রমাণ মিলে যায় অন্য একটি হাদীসের বিশ্লেষণে:

ঈদের দিন। আবু বকর (রা.) বেড়াতে এলেন কন্যা আয়শার (রা.) গৃহে। জামাই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে। আনসারদের দু'টি কিশোরী দফ বাজাচ্ছে। গেয়ে চলেছে বাপ-দাদাদের বীরত্ব গাঁথা। মজা করে উপভোগ করছে কন্যা আয়শা। ক্ষুব্ধ হলেন আবু বকর (রা.)। বললেন– চলবে না এসব। ঠিক নয় এগুলো। জামাই মুহাম্মদ (সা.) জেগে গেলেন। চাদর সরালেন মুখমণ্ডল থেকে। বললেন, ওরা যা করছে করুক, ঈদের দিন আজ, সব জাতিরই উৎসবের দিন আছে, আজকের উৎসবের দিন আমাদেরই উৎসবের দিন।


www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক জাতিরই উৎসবের অনিবার্য দিবস আছে। অথচ ঐ সব দিবসকে তার অসংগতি আর অকল্যাণের পরাক্রমে অগম্য করে তোলে। গ্রিক এবং রোমানরা পালন করে 'বাক্‌সু' নামের একটি জাতীয় উৎসব। এই উৎসবে পুরুষের যৌন-কামনা পূরণের জন্য নারীকে তার সতিত্ব বিসর্জন দিতে হয়। বিবেকবতী কোনো নারী পাশবিক-বাসনা পূরণে অস্বীকৃতি জানালে নেমে আসে মেদিনী কাঁপানো হুংকার যাজকদের, পাদ্রিদের। হুংকার-জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার।

আর সব জাতির জাতীয় উৎসবের দৃশ্যাবলীও কি সুখকর? সুখকর নয় এ জন্য যে, সেই সব উৎসবে শেষাবধি প্রাধান্য পায় অমার্জিত স্বভাব এবং অশ্লীল আনন্দ। মূলত ঐ সব উৎসবের উপঢৌকন সর্বপ্রকারের অন্যায়, অকল্যাণ এবং বিকৃত বাসনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে আসে না বলে মানুষের অন্তরে কোনো স্থায়ী সৌন্দর্যবোধ ও মঙ্গলবৃত্তির উন্মোচন ঘটায় না। ঘটায় নগ্নতা এবং স্বার্থপরতার কদাকার উল্লম্ফন। ঈদুল ফিতর আসে দীর্ঘ এক মাসের আত্মত্যাগের পবিত্রতম প্রবণতার মধ্য দিয়ে, আত্মরক্ষার নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। একটি মানুষের অবিসংবাদিত এ ঘোষণা ছিলো– গোটা রমজানকে সে ব্যবহার করবে একটি প্রতীকগত ব্যঞ্জনায় 'ঢালের মতো'। প্রতিটি রিপুর বিরুদ্ধে তার জিহাদ, তার যুদ্ধ। মিথ্যা সে বলবেই না, কুৎসা সে করবেই না, হিংসায় সে জ্বলবেই না, বিক্ষোভে সে উত্তপ্ত হবেই না, বিদ্বেষে সে উন্মুক্ত হবেই না; সে সংগ্রাম করবে আলস্যের বিরুদ্ধে, অপনিদ্রার বিরুদ্ধে, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে; সর্বোপরি মানুষেরই হাতে তৈরি বিধি-নিষেধের সমস্ত অচলায়তনের বিরুদ্ধে; তার বিদ্রোহ খোদাহীনতার বিপ্রতীপে, দরিদ্রতার বিপ্রতীপে, অমানবতার বিপরীতে, অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে, অনৈতিকতার বিরুদ্ধে, সর্বোপরি পরাধীনতার সর্বপ্রকারের গ্লানি ও গঞ্জনার বিপ্রতীপে। সুতরাং দীর্ঘ একমাসের সিয়াম-সাধনার ঘাম ও অশ্রুর মধ্য দিয়ে যে ঈদের দিনটি আমাদের সমীপবর্তী হয়, তার তাৎপর্য কোনো পরীক্ষার ফল প্রার্থীর ফলাফল–দিবসের আনন্দ-উত্তজনার মতো।

ঈদুল ফিতরের আনন্দের মধ্যে আছে কর্তব্যের দায়গ্রস্ততা, সুকঠিন দার্ঢ্য। এই কর্তব্যের জ্বালানি সংগৃহীত রয়েছে রাসূলে খোদার (সা.) ঈদের দিনের স্বভাব ও আনন্দের মধ্যে। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, নবী (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যেতেন। সেখানে সর্বপ্রথম তিনি নামাজ আদায় করতেন। তারপর সমাবেশের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়তেন। লোকেরা যার যার কাতারে বসে থাকতো। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতেন দ্বীনের নির্দেশনাবলী সম্পর্কে। কোথাও সৈন্যবাহিনী পাঠাবার দরকার হলে সে ব্যাপারেও নির্দেশ করতেন। অথবা কোনো বিশেষ ব্যাপারে পথ-নির্দেশনার প্রয়োজন হলেও করতেন। তারপর ঘরে ফিরে যেতেন। [তিরমিযী, আবু দাউদ]।


www.nagorikpathagar.org

ঈদের সময়ের কর্তব্যগুলোর মধ্যে একটি বড় কর্তব্য হলো-গরিব এবং অসহায় মানুষের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকায় থাকা। এ ব্যাপারে রাসূলে খোদার সরাসরি নির্দেশ হচ্ছে 'তাদেরকে আজ ধনী করে দাও।' অর্থাৎ সর্বহারা মানুষের অভাব পূরণের বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখতে চাননি, কর্তব্য শেষের নামান্তর দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেননি বরং অসহায় মানুষ যেনো সচ্ছলতার পরিধি স্পর্শ করতে পারে- তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ঈদের আনন্দের পরিসমাপ্তির সাথে সাথেই আমরা আমাদের অধীত সমস্ত অর্জনই নিঃশেষ করি। অভ্যস্ত প্রশিক্ষণগুলোকে অপরিণামদ্রষ্টার মতোই পরিত্যাগ করি। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) কতোনা চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো-

> 'যারা রমজান আসলে উপাসনা-প্রবৃত্ত হয়, কষ্ট-ক্লেশের সাথে যুক্ত হয় অথচ রমজান চলে গেলে হয়ে যায় গাফেল। তাদের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? 'আবদুল্লাহ বিন আব্বাস উত্তরে বললেন- 'তারা কতোই বদ-নসিব যারা শুধু রমজানেই আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারে।'

বস্তুত রমজান আসে শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার প্রকৃত প্রক্রিয়ার অনুশীলনের জন্যে এবং বেহেশতের দরজায় ধাক্কা দেবার জন্যে। এ ব্যাপারে দু'টি হাদীসের অভিজ্ঞান আমাদেরকে অভিভূত না করে পারে না।

১. রাসূল (সা.) বলেন- আবশ্যই শয়তান মানুষের রক্তকণিকায় প্রবেশ করে তাঁকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। এখন, এই শয়তানকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রোজা রাখো।
২. রাসূল (সা.) আয়েশা (রা.) কে বললেন- আয়েশা! বেহেশতের দরজায় ধাক্কা দাও। আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন- তা কি করে? কেমন করে? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন- রোজা রেখে।

ঈদের অতিক্রান্তির পরও শয়তান তাড়িয়ে দেবার এবং বেহেশতের দরজায় ধাক্কা দেবার প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখবার একটি পরামর্শ হাদীস দু'টির অন্তরালেই রয়ে গেছে।

ঈদের আগের রাত্রিটিকে কিভাবে উদযাপন করতে হবে? করতে হবে ঐ হাদীসটির আলোকে, যেখানে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দুটি রাত্রি জাগ্রত থাকে, তার অন্তর সেদিনও জাগ্রত [মরবে না] থাকবে। যেদিন সবার অন্তরই মরে যাবে।

সুতরাং ঈদের দিনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বোঝার জন্য ঈদের আগের রাত্রির যথার্থতাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি, ক্ষণস্থায়ী


www.nagorikpathagar.org

জীবনের সুখভোগ এবং ইন্দ্রীয় বাসনার চরিতার্থতাই অন্যান্য জাতিগুলোর স্বভাব, আনন্দ ও উদযাপনের লক্ষ্যমাত্র। কিন্তু মুসলমানের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর শুভেচ্ছা পরমপ্রাপ্তি। যেখানে অন্যান্য জাতিগুলো উচ্ছৃঙ্খলতাকে দিয়েছে প্রশ্রয়, সেখানে একমাত্র মুসলমানই আনুগত্যের শির অবনত করে দিয়েছে, প্রণত করছে তার সকল প্রগলভতা কেবল আল্লাহর খোশ্‌নোদি হাসিলের অভিপ্রায়ে। এই প্রণতিই তার সুখের কার্যকারণ। আর চরমতম যন্ত্রণার কার্যকারণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া দায়িত্ব থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার মধ্যে।

মূলত আনুগত্যের আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে মুসলমানদেরকে প্রদান করা হয়েছে দুটি দিবস। এই দিবস দুটির একটি হচ্ছে ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতরের সর্বাধিক গুরুত্ব এই জন্যে যে, এই দিনটি আসে সেই মাসটির পরিসমাপ্তিতে, যে মাসটির শেষ দশদিনেই সর্বপ্রথম একটি সত্যের আলোকবর্তিকা এবং একটি সুস্পষ্ট মহাগ্রন্থ দান করা হয়েছে। যে গ্রন্থ সন্ধান দিয়েছে প্রকৃত মুক্তির, প্রকৃত স্বাধীনতার তথা শান্তি ও কল্যাণের। সুতরাং এ-কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, রমজানের গুরুত্ব বেড়েছে মহাগ্রন্থের কারণেই। আর যেহেতু ঐ মহাগ্রন্থের যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন ও প্রতিষ্ঠার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাসই হচ্ছে মাহে রমজান– তাই ঐ মাসের পরিসমাপ্তিতে, উজ্জ্বল উপস্থিত হওয়া দিবসটির গুরুত্ব এতো বেশি।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বার্তাবাহকই ঘোষণা দিয়েছেন : তাদেরকে [অর্থাৎ আজকের ঈদের দিনে অসহায়দেরকে] ধনী বানিয়ে দাও। আবার তিনিই ঈদের দিনের বক্তৃতায় নির্দেশ করতেন– কোথায় কোথায় সৈন্য পাঠাতে হবে। মাত্র এই দু'টি বিষয়কেই তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবো– একটি অখণ্ড আনন্দের মধ্যেও রাসূলে খোদা অসহায় মানুষদের কথা ভুলে যান্‌নি, নির্যাতিত বনী-আদমদের কথা বিস্মৃত হন্‌নি।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের কারণেই মাহে রমজানের এতো মর্যাদা, ঈদুল ফিতরের এতো দাম– সেই গ্রন্থ নির্দেশিত জীবনবিধান আজ সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত নেই; যে ঈদুল ফিতরের দিনে দরিদ্রদের ধনী করবার জন্যে রাসূলের (সা.) এতো সুস্পষ্ট নির্দেশ– সেই দরিদ্ররা ক্রমাগতভাবে যখন আরো দরিদ্র; যে মজলুম মানুষদের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাবার জন্য ঈদের মাঠেও রাসূলে খোদার এতো তাকিদ– সেই মজলুম মানুষেরা দিনের পর দিন যখন আরো জুলুমের শিকার হচ্ছে, তখন ঈদ কিম্বা ঈদুল ফিতরের নিহিত তাৎপর্য উদ্ধার কষ্টসাধ্য কোনো বিষয়ই নয়।


www.nagorikpathagar.org

# সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

শিরোনামের আওতায় এসেছে– সাহিত্য, সংস্কৃতি, আন্দোলন, দায়িত্বশীল এবং ভূমিকা– এই ক'টি শব্দ। আমরা প্রথমেই এই ক'টি শব্দের একটি তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ করতে চাই।

'সাহিত্য' শব্দটির একেবারে শব্দগত অর্থ হচ্ছে– কাব্যশাস্ত্র; চিত্তাকর্ষক রচনা belles-letters [কাব্য-নাটক, উপন্যাসাদি, রসসাহিত্য] রচনা গ্রন্থ Literature [সাহিত্য রচনা বা রচিত সাহিত্য] সংসর্গ, সহযোগ। কোনো কোনো সাহিত্য বেত্তা বলেছেন, 'সাহিত্য' শব্দটি এসেছে 'সহিত' থেকে; কোনো কোনো অভিধানেরও এই বিশ্লেষণ। আরবি ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দটির অনুবাদ হবে 'আল আদিবু'– আদিব। একটি উর্দু অভিধান 'আদাব' শব্দটির অর্থ করেছে– সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, সম্মান, সম্ভাষণ। আর 'আদিব' শব্দটির অর্থ করেছে– সাহিত্যিক, আচার, ব্যবহারের শিক্ষাদাতা।

'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ কি হবে? সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ হবে– শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-কলা-রুচি-নীতি। উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture, তমদ্দুন। মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন। সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা। সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা, সংশোধন। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোনো জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস-সমাজনীতি ইত্যাদি।

'আন্দোলন' শব্দটির অর্থ হচ্ছে– প্রচার বা বহুল আলোচনা দ্বারা উত্তেজনা সঞ্চার, আলোড়ন, দোলানো। পর্যায়ক্রমে দুই দিকে সঞ্চালন। দোল।



www.nagorikpathagar.org

'দায়িত্বশীল' শব্দের অর্থ হবে– দায়ী, যে দেয়, দায়ক। 'যাহার উপর কর্তব্যের ভার আছে। যাহাকে কোনো কর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়; দায়গ্রস্ত, কর্তব্যভারাক্রান্ত। আর 'ভূমিকা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো– বক্তব্য বিষয়ের সূচনা, গ্রন্থের পূর্বাভাস, মুখবন্ধ, পত্তন। Role, part, ক্ষেত্র।

উল্লিখিত শব্দার্থগুলো– মূল আলোচনার শুরুতে এই জন্য পেশ করলাম যে, ঐ শব্দগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে যে তাৎপর্য লুকিয়ে আছে শুধু তাই যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুর যথার্থ দাবি ও দায় সম্পূরণে দ্রুততম পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবো।

আলোচনার অনুষঙ্গে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা কয়েকজন গবেষক-সাহিত্যিক-চিন্তাবিদের বক্তব্য তুলে ধরবো।

আমরা জানি, চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যাস্ত এবং পরিকল্পিত রূপই শব্দগত অর্থে– সাহিত্য। তবু এ সম্পর্কে মনীষীদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তাৎপর্যপূর্ণ।

ইতালীয় রসতাত্ত্বিক ক্রেচে বলেছেন, 'সাহিত্য হলো রূপায়ণ [Expression]। তবে রূপায়ণ সার্থক হওয়া চাই। রুশীয় দার্শনিক-সাহিত্যিক টলস্টয় বলেছেন, সাহিত্যের কাজ হচ্ছে জ্ঞাপন [Communication] ... কোন ভাবানুভূতি যখন মনকে করে ভারাক্রান্ত তখন সে তা প্রকাশের ভাবনায় পীড়িত হয়। সেই ভাবানুভূতি অপরকে সাগ্রহে জানাবার তাগিদে মানুষ লেখে, গান গায়, ছবি আঁকে।

এই পথে মানুষ যখন কলার কারবারী, তখনই সে কবি ও সাহিত্যিক। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের [Mathew Arnold] মতে, Literature is the criticism of life– সাহিত্য হচ্ছে জীবনের আলোচনা আর কীটস কাব্যোক্তি করতে গিয়ে সাহিত্য সম্পর্কেই একটি পূর্ণ ধারণা দিয়েছেন- Truth is beauty, beauty is truth- সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য। ... A thing of beauty is a joy forever- সুন্দর চিরদিনই আনন্দ দেয়।

সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত গবেষক আবদুল মান্নান তালিবের একটি চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করা যায়–

> 'যে জীবনাচরণ মানুষের আত্মিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম– সেটিই হবে মানুষের সাহিত্যের বিষয়বস্তু। সেই সাহিত্যেই মানুষের সভ্যতা, সমাজ ও সংস্কৃতির অগ্রগতি এবং বিকাশের চিহ্ন বিধৃত।'

মূলত সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সংজ্ঞা এমনও দেয়া যায়–

> 'মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের [বৃত্তি, মনের– ধর্ম, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, স্বভাব] উৎকর্ষসাধন এবং তাহার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই হইতেছে সংস্কৃতি।'


www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতি সম্পর্কে বৃটিশবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর [E.B.Tylor] তার Primitive Culture গ্রন্থে লিখেছেন– Culture in that complex whole which includes knowledge, belief art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acuired by man as a member of society.

সমাজের সদস্যরূপে অর্জিত আচার, আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি। ডিউক বলেছেন– 'সংস্কৃতি বলতে বুঝায় এমন কিছু যার অনুশীলন করা হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হচ্ছে অপরিণত ও অমার্জিতের পরিপন্থী।' সংস্কৃতির সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন এইচ.জে.লাস্কি। তিনি বলেন– Culture is the what we are.

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য কী? এ ব্যাপারে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী (রহ:)–

> 'ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হলো, মানুষকে সাফল্যের চূড়ান্ত লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে প্রস্তুত করা। এ সংস্কৃতি একটি ব্যাপক জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের চিন্তা, কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার পারিবারিক ও সামাজিক কাজকর্ম, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত।'

সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথার্থ দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীতা অনুধাবনের জন্যেই উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবী জীবনাদর্শেরই ঐ দু'টি ক্ষেত্রের জন্যে দিক নির্দেশনা রয়েছে, কর্মসূচি রয়েছে, পরিকল্পনা রয়েছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থা যেহেতু পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– সেই জন্যে তার রয়েছে আরো ব্যাপক দিক-নির্দেশনা, আরো পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি, আরো সমন্বিত পরিকল্পনা। কিন্তু ঐগুলো তালিকাভুক্ত করবে কে? বাস্তবায়িত করবার জন্যে সামগ্রিক উদ্যোগই বা নেবে কে? দায়িত্বশীলই। অতএব সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা কি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পূর্ণাঙ্গ কোনো দিক–নির্দেশনা, কোনো কর্মসূচি, কোনো পরিকল্পনা পেশ করার সুযোগ এখানে নেই। তবুও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে একটি খসড়া প্রস্তাবনা আমরা সেই সব ক্ষেত্রের জন্যে রাখতে চাচ্ছি, যে সব ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা এখনই অনুভূত হচ্ছে।

## ব্যক্তিগত দায়িত্ব

দায়িত্বশীলদের ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেইগুলো সম্পর্কে, যেগুলো একেবারেই ব্যক্তিগত।


www.nagorikpathagar.org

## পরিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

এ বিষয়টি এমন যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এক সময় ব্যক্তিকেও যেমন ক্ষতিগ্রস্ত করে, তেমনিভাবে আন্দোলনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এক ব্যক্তি সে আন্দোলনের কোন ক্ষেত্রে কাজ করবে– সেটা সে সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইজিন আনিননায়িম– এই আয়াতের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক করে নেবে। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে মেধাগত দিক থেকে, স্বভাবগত দিক থেকে কোন নেয়ামতটি বেশি দান করেছেন– সেটি সে নিজেই আবিষ্কার করবে। আবিষ্কার করার পর যদি সে দেখে মূল আন্দোলনেই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে তাহলে তার সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনের চেয়ে মূল আন্দোলনের দিকেই ঝুঁকে পড়তে হবে, ঝুঁকে পড়তে হবে বেশি করে, আর যদি সে বুঝতে পারে যে, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সে উত্তম ভূমিকা রেখে আল্লাহর খোশনুদি হাসিল করতে সমর্থ হবে [ইনশাআল্লাহ] তাহলে তাঁকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালনের জন্য আগ্রহী হতে হবে। জনশক্তির ব্যবহারও করতে হবে এই নিয়মে। জনশক্তির সঠিক মূল্যায়ন ও ব্যবহার একটি পবিত্র আমানত। এই আমানতের খেয়ানতের কারণেই প্রতিটি ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যথার্থ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে না।

বিখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুজিবুর রহমান খাঁ তার একটি প্রবন্ধে আফসোস করে বলেছেন–

> 'বিষয় ভূমিকা নির্বাচনের ভুলের জন্য আমাদের জাতীয় জীবনে আজ ক্ষতির অন্ত নেই। এ কারণে আমাদের দেশের বহু প্রতিভার দুর্গতি ও অপমৃত্যু দেখে আমরা পীড়িত হয়েছি। তারা নিজেদের ভূমিকা নির্বাচনে ভুল করেই দেশ ও জাতির পরোক্ষভাবে বিপুল ক্ষতি করেছেন। যিনি যে কাজের কাজি নন, তিনি সে কাজ করতে গিয়েই এ অনর্থ ঘটিয়েছেন। রাজনীতি যার পেশা তিনি কবিতা লেখার জন্য কলম ধরেছেন এবং কবি হওয়াই যার কাজ তিনি হতে চাচ্ছেন রাজনীতিক। কেউ অসিকে করেছেন মসি এবং কেউ বাঁশিকে করেছেন বাঁশ। আরো সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেয়েছি, ভাষাতাত্ত্বিক– কবিতা লিখেছেন এবং কবি– পদার্থবিজ্ঞানের দার্শনিক দিক নিয়ে প্রবন্ধ ফেঁদে বসেছেন। সর্বতোমুখী প্রতিভা সারা দুনিয়াতেও খুব বেশি আসেনি। সুতরাং সঠিক... বিষয় ও ভূমিকা নির্ধারণের উপর... সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। এখানে ভুল করলে ক্ষয়-ক্ষতির মাশুল দিতে হয় অনেক।'


www.nagorikpathagar.org

## সিদ্ধান্ত-গৃহীত-বিষয়ের দখল প্রতিষ্ঠিত করা

অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত যদি এই হয় যে, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই আমি আমার ভূমিকা অব্যাহত রাখবো, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার যথাযথ দায়িত্ব আমি এই ক্ষেত্রেই পালন করবো- তাহলে ঐ বিষয়ের ওপর দখল নেয়ার জন্যে আমাকে যেমন আধুনিক বই-পত্র পড়তে হবে, তেমনি পড়তে হবে কোরআন-হাদীস-সাহিত্য-ইতিহাস। পড়তে হবে ইসলামের আলোকে বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধারের জন্যে, অন্যের সামনেও পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্যে।

## মূল আদর্শের আলোকে চরিত্র গঠন করা

একজন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দায়িত্বশীলকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে মূল আদর্শের আলোকে সে তার মন-মানসিকতা এবং নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি মজবুত করতে পারছে কি না। তার মৌলিক আদর্শ ইসলাম, কিন্তু যদি সাংস্কৃতিক আদর্শ আর সাহিত্যের আদর্শ হয় সেক্যুলার- তাহলে তাঁকে দিয়ে উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনাই বেশি থাকবে।

## অব্যাহতভাবে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করা

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একজন দায়িত্বশীলকে একেবারে একজন দক্ষ শিল্পী হতে হবে এমন নয়, একেবারে একজন দক্ষ সাহিত্যিক হতে হবে- এমনও নয়। কিন্তু তাঁকে অবশ্যই সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে। সেই সাথে নেতৃত্বের যোগ্যতা, সাংগঠনিক মেধার অধিকারী হতে হবে এবং কোনো না কোনো একটি দিকে- যেটি তার পক্ষে সম্ভব চর্চাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

## বিশেষজ্ঞদের সাথে এবং সম্ভাবনাময় তরুণদের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলা

একজন দায়িত্বশীলের চোখ-কান-মন-মনন থাকবে সদা সতর্ক। সে যেখানেই যাবে বিশেষজ্ঞ-মুরব্বী, বয়সে বড় হলেও- খুঁজবে। সে সন্ধানে থাকবে সম্ভাবনাময় সমবয়সী কিংবা তারো চেয়ে কমবয়সী কোনো মেধাবীর। সন্ধান করবে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে যথার্থ অর্থে কাজে লাগানোর জন্য। সত্যিকারের দাওয়াতি কাজ সে করতে থাকবে এভাবেই।

## পরামর্শের স্বভাবকে আয়ত্ত করা

অর্থাৎ একজন দায়িত্বশীল স্বাভাবিকভাবেই পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবে। কর্তৃত্বের পরিবর্তে একান্ত আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব প্রদানেরই সে প্রয়াস চালাবে। মূলত কর্তৃত্বের স্বভাবই হচ্ছে- জুলুম করা, জোর করে কাজ চাপিয়ে দেয়া।


www.nagorikpathagar.org

আর নেতৃত্বের প্রকৃতি হচ্ছে– একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে প্রতিটি জনশক্তির নিজস্ব কাজে রূপান্তরিত করা।

**সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করা**

দায়ত্বশীলকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সে যে কাজ করছে তা একটি জাতির মুক্তির জন্যে, গোটা মানবতার মুক্তি জন্যে। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের পরিবেশে, অনৈতিক ব্যবসায়ের পরিবেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঐক্য নামের পবিত্র মাধ্যমটি।

**সর্বদা আল্লাহর সাহায্য কামনা এবং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে উন্মুখর করা**

দায়িত্বশীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, চূড়ান্তভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই, প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাওয়াই তার কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে একটি তৎপরতার পরিমণ্ডল তৈরি করতে হলে তাঁকে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টিতে যত্নবান হতে হবে। নিজে যেমন অন্যের চেয়ে বেশি উদ্যমী থাকতে হবে, তেমনি অন্যকেও এমনভাবে উদ্যমী করে তুলতে হবে– যেনো প্রতিযোগিতাই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের কার্যকর হাতিয়ারে পরিণত হয়। রাসূল (সা.)-এর নির্দেশে যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাই যেনো জনশক্তিকে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে।

হাজারো যোগ্যতা দিয়েও সাফল্য আয়ত্ত্ব করা যায় না, আল্লাহর সাহায্য না এলে। সেই কারণে সূরা-ই-ফোরকানের শেষ রুকুর শিক্ষাকে সব সময়ের জন্যই সম্মুখে রাখার প্রয়াস চালানো উচিত।

**সাংগঠনিক দায়িত্ব**

সাংগঠনিক মজবুতি না থাকলে, এক দল আত্মোৎসর্গিত কর্মীবাহিনী না থাকলে কোনো সংগঠনকেই বেশি দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব না। আবার সংগঠনের জনশক্তির মধ্যে একটি জাগরিত স্বপ্নের যাতায়াত না থাকলে, কর্মচাঞ্চল্যও থাকে না। সেই কারণে কয়েকটি বিশেষ দিকে একজন দায়িত্বশীলকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

**সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা**

অর্থাৎ পুরো জনশক্তিকে কোরআনের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই কেবল এই ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি সুসম্পন্ন হতে পারে। কোনো একজন সাহিত্যকর্মী কিংবা সংস্কৃতিসেবী সে যতোবড় প্রতিভাবানই হোক না কেনো শেষ পর্যন্ত সে যদি কোরআনের কর্মী না হয়, তাহলে সহযোদ্ধা হিসেবে খুব বেশি দিন সঙ্গ দিতে সক্ষম হবে না।


www.nagorikpathagar.org

**আত্মনির্ভরশীল সংগঠনে পরিণত করা**

মূল সংগঠনের ওপর থেকে চাপ কমানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। এ-জন্য অর্থ সংগ্রহের নিজস্ব দিগন্ত আবিষ্কার করতে হবে। অর্থাৎ ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি-প্রেমিকদের মধ্যে যারা ধনী ও বিগলিতচিত্ত রয়েছেন, তাদেরকে আরো বেশি আপনার করে নিতে হবে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকেও এ-ভাবে কাছে টেনে আনতে হবে এবং সেই সাথে নিজেদের উৎপাদন-সামগ্রী কিভাবে বাজারজাত করা যায়– একান্তভাবে ভাবতে হবে। আসলে বিশাল কোনো কর্মসূচি হাতে নিতে গেলে তো এগিয়ে আসবে মূল সংগঠনই, সন্দেহ নেই। তবুও.... আল্লাজিনা ইউন ফিকুনা ফিসসাররাই ওয়াদদাররাই– এই আয়াতের আলোকে গঠিত মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের সাহায্য সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে।

**প্রাক্তনদের কাজে লাগানো ও নতুনদের জায়গা করে দেয়া**

অনেক ত্যাগ এবং তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যারা গড়ে উঠেছিলো তাদের অভিজ্ঞতাকে কেবল অনুদার লোকেরাই উপেক্ষা করে, কেবল স্বার্থান্ধ লোকেরাই উপেক্ষা করে। মূলত পুরনো শক্তি একটি সংহত শক্তি, যেভাবেই হোক সে-শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। সেই সাথে নতুনদেরও জায়গা করে দিতে হবে। সত্যি বলতে কি– পুরনোর অভিজ্ঞতা, বর্তমানের যোগ্যতা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন অথবা পরিকল্পনা-ই কেবল আকাঙ্ক্ষিত বিজয়ের সূর্য ছিনিয়ে আনতে পারে।

**সৃষ্টিশীল কাজের দিকে গুরুত্ব নিবদ্ধ করা**

আমাদের এ দেশের মানুষ একটি অনুষ্ঠানের পেছনে যতোটা পয়সা ঢালতে রাজী, একটি প্রকাশনার পেছনে অতোটা ঢালতে রাজী নয়। একটি বার্ষিক সম্মেলনের জন্যে যতোটা দরদী, একটি বার্ষিক সংকলনের জন্যে অতোটা দরদী নয়। অথচ একটি প্রকাশনা দীর্ঘস্থায়ী, একটি সংকলন দীর্ঘমেয়াদী। সেই জন্য দায়িত্বশীলদের উচিত নানান ধরনের প্রকাশনা কার্যক্রমের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এ-ক্ষেত্রে ঘরোয়াভাবে দেয়ালিকা, আঞ্চলিকভাবে ফোল্ডার-সংকলন প্রকাশ করা খুবই জরুরি এবং একটি বার্ষিকী প্রকাশ করা আরো জরুরি কিংবা কোনো সম্ভাবনাময় প্রতিভার একটি গ্রন্থ। কেবল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়, সিরাতুন্নবী, একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, বরং সারা বছরের বিভিন্ন দিবস, বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রকাশনার ঐ কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে, আজকের একটি দেয়ালিকা, একটি ফোল্ডার, একটি সংকলন, একটি গ্রন্থ আগামী দিনের একজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক-লেখক-গবেষক-চিন্তাবিদ-বুদ্ধিজীবীর বেড়ে ওঠার প্রাথমিক বিচরণক্ষেত্র। একটি সফল দাওয়াতি কাজেরও মাধ্যম এগুলো। এই মাধ্যমগুলোকে বাতিলপন্থীরা পাড়ায়-পাড়ায় মহল্লায়-মহল্লায় প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে আজো প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।


www.nagorikpathagar.org

**মাঝে মধ্যেই সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা**

সাম্প্রতিক বিষয়গুলোও যেমন এতে প্রাধান্য পাবে, তেমনিভাবে প্রাধান্য পাবে সেই বিষয়গুলো, যেগুলো জনশক্তির মানসিক প্রবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি, যে বিষয়গুলোর ওপর কোনো পুস্তক-পুস্তিকা নেই। এখানে কাজে লাগাতে হবে অভিজ্ঞ লোকদের– তারা বাইরেরও হতে পারে, ভেতরেরও হতে পারে। বাইরের যারা, তারা এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচিত হবেন মূল স্রোতধারার সঙ্গে আর ভেতরের যারা তারা তাদের যোগ্যতা বিকশিত করার সুযোগ পাবেন, এক সময় গৃহীত হবেন অন্যদের কাছেও।

**সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে আন্দোলনমুখী সংগঠনে পরিণত করা**

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে শুধুই সৃজনশীল সংগঠনে পরিণত করলে চলবে না, আন্দোলনমুখী সংগঠনে পরিণত করতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সব অসংগতি প্রত্যয় ও প্রবৃদ্ধির মূলে আঘাত হানছে তার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে, অপসংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মূল আন্দোলনের সংগ্রামী ভূমিকাকে শুধু স্বাগত জানালেই চলবে না, হাসসান বিন সাবিত ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) দের জীবনাদর্শের অনুসরণ করতে হবে।

**সমন্বয় সাধন করা**

ক. সহযাত্রীদের সাথে খ. সমমনা সংগঠন ও সংগঠকদের সাথে গ. মূল সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সাথে ঘ. স্থানীয় দায়িত্বশীলদের সাথে ঙ. জাতীয় পর্যায়ের [জেলা পর্যায়ের, থানা পর্যায়েরও] দায়িত্বশীলদের সাথে চ. জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বশীলদের সাথে [দায়িত্বশীল বলতে বুঝিয়েছি শুধু নিজেদের দায়িত্বশীলদেরকে নয়; বরং অন্যান্য দায়িত্বশীলদেরকেও]।

**নিয়মিত প্রোগ্রাম চালিয়ে যাওয়া**

দাওয়াতি কাজের জন্য এই নিয়মিত প্রোগ্রামগুলো সবচেয়ে বেশি ফায়দা দেয়। ফায়দা দেয় সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে, ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য-দিয়ে। নিয়মিত প্রোগ্রামের মধ্যে কোরআনের ক্লাস, কবিতার ক্লাস, গানের ক্লাস, সাহিত্য সভা, আর্টের ক্লাস, গীতি কবিতা পাঠের আসর, আবৃত্তির ক্লাস, বিতর্কের ক্লাস, সাধারণ জ্ঞানের আসর এবং এই ধরনের আরো কিছু ক্লাসের, আরো কিছু আসরের আয়োজন করতে পারলে এক পর্যায়ে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের যে শূন্যতা তা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যাবে।


www.nagorikpathagar.org

## অধিকতর উদারতার পরিবেশ গড়ে তোলা

নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হতে হবে, অধিকতর উদারতার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সত্যিকার অর্থে যে যোগ্য, তাঁকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এ-ক্ষেত্রে যে-কোনো অশুভ মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শুধু নিজে নেতা হবার কৌশল অবলম্বন করার অর্থই হলো ভবিষ্যতের নেতৃত্বের যথার্থতাকে অস্বীকার করা। একজন নেতার কৃতিত্বই হলো সর্বক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্ব পরিবেশন করা। তা যদি করতে হয় তাহলে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকেই উজ্জ্বল করতে পারে– এমন এক দল যোগ্য লোক তৈরির পরিকল্পনাকে দ্রুততার সাথে যথার্থ করতে হবে। নইলে ধ্বংসাত্মক সাহিত্য আর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

## একত্রিত হওয়া যায়– এমন একটি জায়গার ব্যবস্থা করা

নিয়মিত চর্চা করা যায়, লেখা-পড়া করা যায়, একত্রিত হওয়া যায়- এমন একটি জায়গার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে-জায়গার নাম কার্যালয় হোক কিংবা একাডেমি হোক– আপত্তি নেই। কিন্তু তার পরিবেশ যেন এমন হয়, যাতে বাইরের লোকও আসবে, নতুন লোকও আসতে আকর্ষণ বোধ করে। দূর-দূরান্ত থেকে কোনো সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মী এলে দু-এক দিনের জন্যে আশ্রয়ও পেয়ে যায় সে ব্যবস্থা থাকবে।

## বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা

জনশক্তিকে বিকশিত করবার জন্যে, তাদের নিজেদের ওপর নিজেদের আস্থা আনয়নের জন্যে, নিজেদের যোগ্যতার যাচাই-বাছাইয়ের জন্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাতে হবে। সেই সাথে কখনো কখনো প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা অন্যরা করুক বা প্রতিযোগিতা নিজেদের ব্যবস্থায় সংগঠিত হোক– উভয় অবস্থায় প্রতিভাবানদের ঠিকানা সংগ্রহের জন্য দায়িত্বশীলদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে হবে। যাতে করে সংগৃহীত ঠিকানাগুলোকে দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্র হিসেবে কাজে লাগানো যায়।

## মূল সংগঠনের সাথে যুক্ত করা

একদল ত্যাগী কর্মী যদি সত্যিকার অর্থেই পেতে চাই তাহলে জনশক্তিকে মূল সংগঠনের সাথে যুক্ত না করার অর্থ হলো নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। সাহিত্য কর্মী, সংস্কৃতি কর্মী হারিয়ে যায় মূলত এই একটি কারণে। আর মূল সংগঠনের সাথে যুক্ত করার তাৎপর্য এ নয় যে, কেবল ক্যাডারই বানাতে হবে, সমর্থকই বানাতে হবে বরং তার মানে হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক যেনো- 'কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারছুছ' পর্যায়ের হয়।


www.nagorikpathagar.org

### সংগঠনের অভ্যন্তরে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা

সংগঠনের অভ্যন্তরে রুহামাও বাইনাহুম-এর পরিবেশ তৈরির জন্য সামগ্রিক দিক থেকে ইনসাফের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সবাই সমান, এ প্রবোধকে কাজে লাগাতে হবে। এই আয়াতের আলোকেই প্রত্যেকটি মানুষের মূল্য দেয়া শিখতে হবে। নেতা নেতা একটা ভাব উপস্থাপনার চেয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করানোর চেষ্টাই যদি অব্যাহত রাখা যায়– তাহলে ফায়দা বেশি। সাধারণত বড় মাপের মানুষ না হলে বড় মাপের নেতা হওয়া সম্ভব না। সুতরাং সর্বাবস্থায় যারা পদের কথাটি ভুলে যেতে পারেন এবং তার পরিবর্তে নিজেদেরকে মানুষ ভাবতে পারেন, আল্লাহর খলিফা ভাবতে পারেন, মানুষের খাদেম ভাবতে পারেন– তারাই প্রকৃত অর্থে কল্যাণ বয়ে আনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে যোগ্য।

### সংগঠনের অভ্যন্তরভাগে সুকৃতির লালন করা

একটি সংগঠনকে, সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনকে পরিপূর্ণতা দান করতে হলে, তার অভ্যন্তরভাগে অবশ্যই সুকৃতির লালন করতে হবে, দুষ্কৃতির দমন করতে হবে। কেননা, কোনো অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ হলো– একটি কলুষিত পরিস্থিতিকে স্বাগত জানানো। একটি ন্যায়কে উপেক্ষা করার অর্থ হলো– নিজেদের সামগ্রিক সম্ভাবনাকে নিজেদেরই উদ্যোগে বিতাড়িত করা।

### অকপটে কথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি করা

দায়িত্বশীলদের সত্যিই যত্নবান হবার দরকার– প্রত্যেকের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শোনার ব্যাপারে। অর্থাৎ জনশক্তি যেনো অকপটে সব কথা বলতে পারে, সব পরামর্শ দিতে পারে এবং এই পরিবেশের সৃষ্টি দায়িত্বশীলদের করতে হবে। এই পরিবেশ তৈরি করতে পারলে, ময়দান থেকেই এমন এমন পরামর্শ আসতে থাকবে– যার উপর ভিত্তি করে একটি সঠিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা সহজতর হয়ে উঠবে।

### পরিশ্রমী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনশক্তি গড়ে তোলা

স্বাস্থ্যগত দিক থেকে জনশক্তিকে এমন এক স্তরে পৌঁছে দিতে হবে, যেনো তারা কঠোর পরিশ্রম করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে যায়। যে দায়িত্বশীল কর্মীদের স্বাস্থ্যের খবর রাখে না, সে দায়িত্বশীল কর্মীদের ঘাম এবং শ্রম চাইবার অধিকার থেকে নীতিগতভাবে বিতাড়িত। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্র হচ্ছে এমন এক ক্ষেত্র, যেখানে দিনভর কাজ আর কাজ এবং যেখানে রাত্রিজাগরণ একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার উপাত্ত। এই জন্যে সাহিত্য-সংস্কৃতির একজন সচেতন কর্মীর পক্ষে আল্লাহর খোশনুদী হাসিলের সুযোগ খুব বেশি।


www.nagorikpathagar.org

### গোটা জনশক্তিকে জ্ঞানের তিনটি উৎস সম্পর্কে সচেতন করা

তাদেরকে একথা পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে যে, আমাদের ইলম হাসিল করতে হবে তিনটি ক্ষেত্র থেকে এবং প্রতিনিয়ত।

ক. আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে, মানসিক জ্বালা -যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

খ. প্রকৃতির কাছ থেকে অর্থাৎ বাহ্যজগতের কাছ থেকে, পৃথিবীর স্বভাবের কাছ থেকে, নিসর্গের কাছ থেকে।

গ. ইতিহাসের কাছ থেকে। কেননা ইতিহাস সব সময় গৌরবময় সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করে।

ড. ইকবাল বলেছেন–

> '...আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে জ্ঞান লাভের মাত্র একটা উপায়। কোরআনে আরো দুটি উপায়ের নির্দেশ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং আর একটা হচ্ছে ইতিহাস। জ্ঞান লাভের এ দু'টি উপায়কে ব্যবহার করার মধ্যে ইসলামের মর্মরূপ সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।'

### প্রশিক্ষণের কাজকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া

এক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিতেই হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে একটি নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় না আনলে সব কিছুই মাঠে মারা যাবে। যে সমস্ত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় নেই, নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই তাদের মতো হতভাগ্য আর কেউ নেই, অভিভাবকহীনও আর কেউ নেই। অনেক সময় দেখা যায়, প্রোগ্রামের জন্যেই কেবল প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। যেখানে প্রশিক্ষণের দরকার ছিলো তিন মাসের, সেখানে মাত্র তিন দিনের প্রশিক্ষণ দিয়েই মাঠে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এতে করে শেষ হয়ে যাচ্ছে ইমেজ, জন্ম নিচ্ছে আত্মগ্লানি ও হতাশার। অবশ্যই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য থাকবে আন্দোলনের চাহিদা, জনগণের চাহিদা, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা, জাতীয় পত্র-পত্রিকার চাহিদা, রেডিও-টিভির চাহিদা তথা জাতীয় প্রচার-সম্প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় চাহিদা, সারাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের চাহিদা পূরণের।

### জনগণের আস্থা অর্জন করা যায়– এমন অনুষ্ঠানের আঞ্জাম দেয়া

জনগণের আস্থা অর্জন করা যায়– এমন অনুষ্ঠানের আঞ্জাম দিতে হবে। সেই জন্যে যে সব উপাদান সংগ্রহ করা প্রয়োজন তা অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। এই উপাদান সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে আদর্শের, মাটি ও মানুষের মৌলিক প্রবণতার, দেশীয় ও লোকজ মৌলিকতার এবং গ্রহণযোগ্য অন্যসব উপায়ের।


www.nagorikpathagar.org

### অনুষ্ঠানগুলোতে মাটি-মানুষ-আদর্শ-সত্য ও সুন্দরের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটানো

খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের সাহিত্য, আমাদের সংস্কৃতি যেনো একটি স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়। সেই জন্যে আমাদের অনুষ্ঠানগুলো যেনো এমনই হয় যাতে মাটি-মানুষ-আদর্শ-সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটে। সেক্যুলার অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্যবাদী অনুষ্ঠান কিংবা সমাজতান্ত্রিক অনুষ্ঠান আর আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে যদি কোনো পার্থক্যই না থাকে– তাহলে তা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অনুষ্ঠানগুলো হতে হবে সব দিক থেকেই সুন্দর, কিন্তু একটি আলাদা ইমেজের উত্তাপে উৎপন্ন।

### চোখ-কান খোলা রেখেই কাজ করতে হবে

বাতিল সংস্কৃতিবাদীদের সমস্ত উদ্যোগ সম্পর্কে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। রাজনীতি করতে হলে, আন্দোলন করতে হলে যেমন প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের রণকৌশল সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়, অর্থাৎ তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল থাকতে হয়, তেমনি সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কেও পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর রাখতে হবে। খোঁজ-খবর রাখতে হবে অপসংস্কৃতিবাদীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোন কোন হাতিয়ার কোন কোন কায়দায় ব্যবহার করে যাচ্ছে এই সব ব্যাপারে। এই সব অপতৎপরতার প্রতিরোধে কি কি করণীয় আছে- আমাদের সেসব নিয়েও ভাবতে হবে।

### অর্জিত সবকিছু সংরক্ষণ করা

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে আমাদের যা কিছুই অর্জিত সব কিছুরই সংরক্ষণ করতে হবে। এ-পর্যন্ত আমাদের যে-ক্ষতি হয়েছে তা আর কোনোকালেই সম্পূরণ হবে কি-না সন্দেহ। উচিত হচ্ছে যখন যে অনুষ্ঠান হয়, যখন যে কাজ হয় তার সবকিছুই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। সংরক্ষণ করা উচিত একেবারে একটি স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে কোনো মেহমানের অভিভাষণ পর্যন্ত এবং এগুলো নিয়েই এক সময় একটি সংকলন প্রকাশ করতে পারলে প্রামাণ্য কিছুর আঞ্জাম দেয়া হবে নিঃসন্দেহে।

### মাঝে মাঝে ওয়ার্কশপ করা

ওয়ার্কশপ করা উচিত সেসব বিষয়ে যেসব বিষয়ে জনশক্তিকে ধারণা দেয়া, হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে, সাথে সাথে সেই সব বিষয়েও যেসব বিষয়ে দায়িত্বশীলদেরও ধারণা নেওয়া দরকার আছে। কখনো কখনো উভয়পক্ষকেই একটি সিদ্ধান্তে আসবার জন্যেও ওয়ার্কশপ করা যায়।


www.nagorikpathagar.org

অন্যদের ওয়ার্কশপে বিশেষ করে যেগুলোর আয়োজন করে থাকে সরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান-জনশক্তিকে সুযোগ-সুবিধামত সেসব ওয়ার্কশপেও অংশগ্রহণ করাতে হবে।

**সংগ্রহশালা গড়ে তোলা**

সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে না পারলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নতুন নতুন উদ্ভাবন সম্ভব নয়।

**সংগ্রহশালায় অবশ্যই সংগ্রহ থাকতে হবে যে সব বিষয়ের–**

ক. ইসলামী খ. দেশী গ. উপমহাদেশীয় ঘ. আঞ্চলিক [দেশীয়-বিদেশীয়], ঙ.আন্তর্জাতিক ও চ. ঐতিহাসিক ইত্যাদি। এ-ছাড়াও সংগ্রহশালায় সংগ্রহ করতে হবে ঐতিহাসিক ও জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বদের নানা ধরনের স্মরণ-সামগ্রী।

**বিপ্লবী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা**

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক একটি সংগঠনকে মূল আন্দোলনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্য থেকে যেমন একজন দায়িত্বশীলকে বিচ্যুত হলে চলবে না, তেমনি সেই দায়িত্বশীলকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিয়োজিত জনশক্তি যেন যথার্থ অর্থেই দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে *ওঠে*। গড়ে ওঠে একটি বিপ্লবী জনশক্তি হিসেবে। যে জনশক্তি একটি সফল সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনে সবচেয়ে যোগ্য বলে সর্বমহল কর্তৃক সম্বর্ধিত হবে। সেই জন্যে জনশক্তি যেনো–

ক. সময়নিষ্ঠ হয় খ. স্বতস্ফূর্ত হয়

গ. কর্মঠ হয় ঘ. ধৈর্যশীল হয়

ঙ. উদার হয় চ. আত্মপ্রত্যয়ী হয়

ছ. অধ্যবসায়ী হয় জ. দূরদর্শী হয়

ঝ. ভদ্র- বিনয়ী হয় ঞ. অতিথিপরায়ণ হয়

ট. অদাম্ভিক হয় ঠ. মিষ্টভাষী হয়–

অর্থাৎ মানুষের মতো মানুষ হবার জন্যে একটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার জন্যে যেসব গুণে গুণান্বিত হতে হয়, সেই সব গুণে যেনো জনশক্তি অবশ্যই গুণান্বিত হয় সে ব্যাপারে দায়িত্বশীলকে তার মেধা, শ্রম, সেবা ও যত্ন যথার্থভাবে আরোপ করতে হবে। দায়িত্বশীলকে সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে, দায়িত্বশীল হচ্ছে সে-ই, যে অন্তত পক্ষে তিনটি 'দ'- এর মালিক–


www.nagorikpathagar.org

এক. 'দায়'-এর 'দ'
দুই. 'দূরদর্শিতা'-এর 'দ'
তিন. 'দর্পকূন্যতা'-এর 'দ'।

**আন্দোলন বিষয়ক দায়িত্ব**

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, শুধু অনুষ্ঠানসর্বস্ব কার্যক্রম পরিচালনা করাই একটি যথার্থ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজ নয়; কাজ নয়, জীবনের যাবতীয় দুর্যোগ ও দুর্ভাবনা থেকে পরিত্রাণের সমস্ত উদ্যোগকে এড়িয়ে গিয়ে, স্বার্থপরের মতো কেবল বিনোদনের বিষয়টিকেই প্রাধান্য দেয়া। সম্পূর্ণ পরিবেশ থাকবে মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত অথচ একজন বিবেকাপন্ন ব্যক্তিত্ব শুধু সাহিত্য আর সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করবে ভীরু ও কাপুরুষদের অপকর্মের মধ্যে তা হতেই পারে না, হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব একটি সংগঠনের, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের অবশ্যই আন্দোলন সংক্রান্ত কর্মসূচি থাকতে হবে। কর্মসূচি থাকতে হবে পারতপক্ষে কয়েকটি বিষয়ে:

**অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করা**

অপসংস্কৃতির মোকাবেলাতো অবশ্যই করতে হবে। অপসংস্কৃতির মোকাবেলা না করার অর্থই হলো জনশক্তিকে সুবিধাবাদী শ্রেণীতে পরিণত করা, সমস্ত সৃজনশীলতাকে একদল অর্ধনগ্ন ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেয়া, যাবতীয় উৎপাদনের অভ্যন্তরে সর্বভুক বিষকীটের অনুপ্রবেশ ঘটানো। শুধু তা-ই নয়, একটি জাতিকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অস্তিত্ব বিধ্বংসী কোনো দুশমনদের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেবার জন্য এতোটুকু যথেষ্ট যে, সে-জাতি অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করবে। এ ব্যাপারে কিছু কথা আগেও বলা হয়েছে। তবুও বিষয়টিকে গুরত্ববহ করার জন্য আবারও আলোচনা করা হলো।

**সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলা করা**

অপসংস্কৃতির মোকাবেলা করার বিষয়টিকে যেমন আমরা একেবারেই হালকাভাবে দেখতে পারি না, তেমনি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকেও আমরা মোটেই এড়িয়ে যেতে পারি না। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে কেবল সে-ই মেনে নিতে পারে, যে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখেয়াল, যে স্বাধীনতার মর্মার্থ উদ্ধার করতে পারেনি, যে আত্মমর্যাদার আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষা করার চূড়ান্ত চৈতন্য নিয়েই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করতে হবে। কেননা, আমাদেরকে সার্বিকভাবে আগ্রাসনের জন্যে বহু আগেই ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন কংগ্রেস নেতা বালগঙ্গাধর তিলক [১৮৯৫] এবং পণ্ডিত নেহেরুরা।


www.nagorikpathagar.org

বালগঙ্গাধর তিলক বলেছিলেন–

'এই উপমহাদেশে মুসলমান অধিবাসীরা হলো বিদেশী দখলদার। কাজেই তাদের শারীরিকভাবে নির্মূল করতে হবে।'

পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন–

'প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত সমস্ত এলাকা একদিন ভারতের একচ্ছত্র দখলে চলে আসবে। তখন স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা নিয়ে কোনো সংখ্যালঘু জাতি টিকে থাকবে না।'

দ্বিতীয় একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আবারও আমরা এ বিষয়টির আলোচনা করলাম- এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতা বলতে গেলে শূন্যের কোঠায়।

**বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা**

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহর, এমনকি থানা পর্যায়েও। সিরাতুন্নবী (সা.) উদযাপন করতে হবে এমনভাবে যেনো সমাজের সর্বত্রই একটি বিপ্লবী উপলব্ধি জাগ্রত হয়। এই উপলব্ধি জাগ্রত করার জন্য সংস্কৃতির যতোগুলো বাহন আছে, প্রত্যেকটি বাহনকেই কাজে লাগাতে হবে। একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস এবং নববর্ষের অনুষ্ঠান আমাদেরকে এমনভাবে পালন করতে হবে– যেনো আধিপত্যবাদের সেবক-দোসররা ষড়যন্ত্রের সমস্ত কলাকৌশল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই সব দিবসকে কেন্দ্র করেই হবে সাংস্কৃতিক উৎসব, নাট্য উৎসব। উৎসবের যাবতীয় আনন্দ আবর্তিত হবে কবিতা পাঠের আসর, আবৃত্তির আসর, সুস্থ কৌতুকের আসর, হামদ-নাত, দেশাত্মবোধক গান, ইসলামী গান, জারী-পল্লীগীতি-গম্ভীরার আসর, গীতিকবিতা পাঠের আসর, ভিডিও প্রদর্শনী, আর্ট এক্সিবিশন, বক্তৃতা প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান, ওয়াজ মাহফিল – এক কথায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। আমাদের ধারণা, যেহেতু দু'টি উৎসবই হচ্ছে প্রধান উৎসব, অর্থাৎ ঈদাঈন। এই দু'টি উৎসবকে কেন্দ্র করে কিরাত ও হামদ-না'ত সম্মেলন করতে পারলে প্রকৃত সুর এবং শিল্পের কদর করা হবে।

এইসব দিবসকে দীর্ঘমেয়াদী করার জন্য প্রকাশ করতে হবে দেয়ালিকা, ফোল্ডার, সংকলন, ক্যাসেট, বিশেষ সংখ্যা ইত্যাদি। শুধু নিজেরা প্রকাশ করা নয়, অন্যদেরও প্রকাশ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

**পথসভা এবং ভ্রাম্যমাণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা**

প্রধান প্রধান শহর এবং এলাকাগুলোতে পথ-অনুষ্ঠান এবং ভ্রাম্যমান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে। এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে হলে দীর্ঘ এবং মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণের একান্ত প্রয়োজন। এবড়ো-থেবড়ো প্রশিক্ষণ এসব ক্ষেত্রে


www.nagorikpathagar.org

আত্মহত্যার শামিল। বিশেষ করে পথনাটকের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণগত অসতর্কতা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

## মানুষের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা

মানুষ এবং মানুষের প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে আমাদের একটি প্রধান বিষয়। সেই কারণে কোথাও কোনো অনুষ্ঠান করার সুযোগ এলে লুফে নিতে হবে। বিশেষ করে সে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা যদি হয় আমাদের পরিচিত-পরিধির বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান তাহলে অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের মূল সংগঠনের প্রোগ্রামগুলোকে অবহেলা করতে হবে; বরং নিজস্ব পরিমণ্ডলের প্রোগ্রামগুলোকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই একটি অংশ হিসেবে গুরুত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে ঘরের দাবি পূরণ করতে পারে না, সে বাইরের দাবিও পূরণ করতে পারে না। এই সব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে নিজেদের কিছু লোকসান হলেও সংগঠনের ইমেজ ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো লেন-দেনের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আগে থেকেই সতর্ক থাকলে, ইমেজ ক্ষুণ্ন হতে পারে– এমন ধরনের পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচা যায়। অসতর্কতার কারণে ক্রমাগতভাবে লোকসান করতে থাকলে, এক সময় প্রোগ্রাম করার প্রবৃত্তিই হারিয়ে যাবে, দারুণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে আগ্রহ এবং উদ্দীপনা। সেই জন্য অনুষ্ঠান করতে হবে অবশ্যই পূর্ব সতর্কতা সহকারে। তারপরেও মনে রাখতে হবে, কাঁসার বাটি যতোই ঘষতে থাকবে ততোই ঔজ্জ্বল্য ধারণ করবে।

## কোন ইস্যুকেই হাতছাড়া না করা

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কোনো জাতীয় ইস্যুকেই হাতছাড়া করা ঠিক নয়। প্রতিবাদ করার মতো কোনো বিষয় সামনে এলে প্রতিবাদের ভেতর দিয়ে নিজেদের বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করা উচিত। প্রতিবাদ শুধু নিজেরা করা নয়, অন্যদেরকেও প্রতিবাদী হবার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে, সহযোগিতা করতে হবে। মূলত প্রতিবাদ হচ্ছে এমনই একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সংগ্রামী মানসিকতারই প্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ তার যা খুশি তা-ই করার মনোভাবকে খানিকটা হলেও সংযত করে। এ ধরনের কাজে নিরুৎসাহিত করে তারাই– যারা জাগ্রত জনশক্তিকে সত্যিই ভয় করে। অথবা যারা জৈনধর্মের প্রবর্তকের আদর্শ গ্রহণ করেছে। জৈনধর্মের প্রবর্তক মনে করতেন জীব হত্যা মহাপাপ এবং সেই জন্যে তিনি সর্বদা একটি ঝাটা সঙ্গে নিয়ে পথ চলতেন। যতোটুকু এগুতেন ঝাটা দিতে দিতে এগুতেন। যাতে করে একটি পতঙ্গও পায়ের তলে পড়ে নিহত না হয়। এই আদর্শ কি একজন সত্যিকারের সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবী মুসলমানের হতে পারে?


www.nagorikpathagar.org

## নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তোলা

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা খুবই জরুরি। একটি প্রধান সংগঠনকে কেন্দ্র করে একশ'টি সংগঠনও যদি গড়ে ওঠে তাহলে ভয়ের তো কিছু নেই। আসলে মসজিদ যতোই বাড়ে মুসল্লিও ততো বাড়ে। সতর্ক থাকা দরকার একজন-একজন করে যোগ্যতর ইমাম যেনো সব মসজিদেই নিয়োগ করা যায়।

## সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ঘোষণা করা

নানা প্রয়োজনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ঘোষণা করা যায়। এই সপ্তাহ উপলক্ষে সংগঠনকে মজবুত করার পরিকল্পনা, সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা, তহবিল গঠনের পরিকল্পনা, নিজস্ব উৎপাদন সামগ্রী বাজারজাতকরণের পরিকল্পনা ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনা হাতে নেয়া যেতে পারে।

## পুরস্কার প্রদানের নিয়ম চালু করা

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদানের নিয়ম চালু করা উচিত। যে পর্যায়ের যে সংগঠন-পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে সে পর্যায়েরই গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ শুধু জাতীয় পর্যায়ের ব্যক্তিত্বকেই পুরস্কার দিতে হবে এমন নয়, স্থানীয় পর্যায়েও দিতে হবে। এ-এমন একটি মহান উদ্যোগ যে, এ উদ্যোগকে প্রতিপক্ষ-শক্তিও নানা কারণে স্বাগত জানায় অথবা হিংসাকাতর হয়ে নিজেদের লোকদেরই পুরস্কার প্রদান করা শুরু করে দেয়। সে যা-ই হোক, তবুও ভালো যে, তারা তাদের নিজেদেরকে অন্তত সম্মানিত করে। একটি সংগঠনকে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য পুরস্কার প্রদানের বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, যোগ্য ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করাটা একটি নৈতিক দায়িত্বও বটে।

## সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশ করা

ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পত্রিকাও প্রকাশ করা যেতে পারে। নিজস্ব জনশক্তির মেধা কাজে লাগানোর মাধ্যম হিসেবে, প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হিসেবে এটি একটি অনন্য প্রয়াস। এ ধরনের একটি চমৎকার মাধ্যম হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে টানার এক অসাধারণ প্রক্রিয়া যা আন্দোলনকে সর্বপর্যায়ে গ্রহণীয় করে তুলতে সাহায্য করে।

## উপশাখা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করা

সত্যিকার অর্থেই যদি আমরা সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, তাহলে প্রথমতই সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে হবে।


www.nagorikpathagar.org

আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন– 'জগতকেও একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলিম জনসাধারণের তরফ থেকে সাংস্কৃতিক সমস্যা... মুসলিমদের পক্ষে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কোনোক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।' সেই কারণে, অন্তত কাঠামোগত গুরুত্ব আরোপের জন্য মূল সংগঠনের উপশাখা থেকে শুরু করে একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ সৃষ্টি করতে হবে, দায়িত্বশীলও নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য দায়িত্বশীল নিয়োগের ব্যাপারটা যেনো এমন না হয় যে, আরো চার-পাঁচটি দায়িত্ব তার আছে, সেই সঙ্গে আরো একটি বাড়তি দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হল আর সে দায়িত্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক দায়িত্ব। হ্যাঁ, এ রকম ঘটনাটি ঘটতে পারে কেবল সেখানে– যেখানে দায়িত্ব অর্পণের মতো লোকই নাই।

## ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া

জনশক্তিকে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে না পারলে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি মজবুত হবে না। সুতরাং সংস্কৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট দিবসগুলোকে অবশ্যই পালন করতে হবে। এই সব দিবসের সাথে ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান জড়িত। একটি দিবস পালনের মধ্য দিয়ে খুব সহজে আমরা তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, তাদেরকে কাজে লাগাতে পারি।

## যুবশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা

তরুণদের গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে যত্নবান না হলে আমরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হবো। কেননা যুবশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে জনগণের যথার্থ দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না, জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না, আন্দোলনকেও সুসংহত করা যায় না। মনে রাখতে হবে, তারুণ্যকে অবহেলা করে অবজ্ঞা করে, তাদের বেড়ে ওঠা শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চায় ষড়যন্ত্রকারীরাই।

## প্রচার সংক্রান্ত কাজকে এগিয়ে নেয়া

প্রচার সংক্রান্ত কাজকে পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় কোনো প্রোগ্রাম হোক অথবা স্থানীয় কোনো প্রোগ্রাম হোক, সবাই যাতে সেই প্রোগ্রামটির খবর সময়মত জানতে পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। পোস্টার লাগানোর কাজ, মাইকিং অথবা লিফলেট বিলির কাজটি অসময়ের বিষফোঁড়ার মতো হওয়াটা একেবারেই আপত্তিকর। বিশেষ করে, প্রেসরিলিজের ব্যাপারটিকে কোনোভাবেই হালকা করে দেখার উপায় নেই। একটি প্রোগ্রাম সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে অথচ তার খবরটা সুন্দরভাবে পরিবেশিত হবে না, তার অর্থ একটি গোলাব প্রস্ফুটিত


www.nagorikpathagar.org

হবে, কিন্তু তার শোভা ও সুগন্ধ একটি কালো রুমাল দিয়ে বেঁধে রাখা হবে। একটি অনুষ্ঠান করতে অর্থ, ঘাম, রক্তের যে ক্ষয় হয় তা যারা অনুভব করতে পারে তারা যেমন একটি প্রেসরিলিজ তৈরি করতে এবং তা পৌঁছে দিতে কার্পণ্য করে না, তেমনি তা প্রকাশ করতেও কোনো সহানুভূতিশীল কর্তৃপক্ষ ইতস্তত করে না।

## প্রতিষ্ঠিত ও পুরনো শিল্পীদের কাজে লাগানো

রেডিও-টেলিভিশনের এবং নিজেদের পুরনো শিল্পীদের কাজে লাগানোর জন্যে আমাদের আরো ব্যাপক পরিকল্পনা নিতে হবে। সারা বছরই তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্যে একটি পরিকল্পনা থাকতেই হবে। রাসূলে খোদা (সা.) কতো চমৎকারভাবেই না কাজে লাগিয়েছিলেন আকসম বিন সয়ফিকে। আকসম বিন সয়ফি ছিলেন আরব উপদ্বীপের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বাগ্মীদের মধ্যে অন্যতম। সে সময়ের পারস্য সম্রাট এই আকসম বিন সায়ফির অসাধারণ বক্তৃতা শুনে বলেছিলেন– 'আরবদের মধ্যে তুমি ছাড়া আর যদি কোনো বাগ্মী না থাকতো তাহলে তুমি একাই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিলে।' এই পণ্ডিত এবং বাগ্মী সম্ভবত ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবুও তার সঙ্গে রাসূল (সা.)-এর এতোটা গভীর সম্পর্ক ছিলো যে, কখনো কখনো তিনি তাঁকে ইসলাম প্রচারের কাজে লাগাতেন।

সারাদেশের সমস্ত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিভা কিন্তু এই উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখেই কাজে লাগাতে হবে। অন্ততপক্ষে তাদের জন্যে তো অনুষ্ঠান, উৎসব, সেমিনার, আলোচনা, জনসভা ইত্যাদির প্রথম পর্ব অর্থাৎ উদ্বোধনী পর্বকে কাজে লাগানো যায়। এই পর্বে তাদেরকে দিয়ে হামদ-না'ত পরিবেশন করাতে পারলে সার্বিকভাবেই লাভবান হওয়া যাবে।

## একটি শক্তিশালী তহবিল গঠন করা

সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই তহবিল যদি না থাকে তাহলে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। কিন্তু কিভাবে এই তহবিল সুসংহত হবে? এ ব্যাপারে কয়েকটি পরামর্শ:

- ক. জনশক্তি ও সুধীজনদের এয়ানত
- খ. উৎপাদন সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য
- গ. উৎসব ও অনুষ্ঠানের আয়
- ঘ. বিজ্ঞাপনের উপার্জন
- ঙ. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্য
- চ. প্রশাসনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সাহায্য।

মনে রাখতে হবে, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম হচ্ছে এমন এক ধরনের কার্যক্রম, যে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অঢেল অর্থানুকূল্যের একান্ত প্রয়োজন।


www.nagorikpathagar.org

এই কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া অথবা ফলাফল একেবারে সামনা-সামনি গোচরীভূত হয় না বলে খুব কম ব্যক্তিত্ব এর জন্যে, খুব কম প্রতিষ্ঠান এর জন্যে, খুব কম সংগঠন এর জন্য দরাজহস্ত হয়; কেউ কেউ একটি হাতি পুষতে চাইলেও বিস্তীর্ণ কোনো কলার খামারের জন্যে জমি বরাদ্দ করতে রাজি নয়। এমতাবস্থায় আল্লাহর দ্বীনের জন্যে নিবেদিতপ্রাণ মানুষদের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই একটি শক্তিশালী তহবিল গঠনের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। আসলে, উদ্দেশ্যে উপনীত হবার আকাঙ্ক্ষা যদি দুর্দমনীয় হয়, কর্ম-প্রচেষ্টা যদি প্রাণান্ত হয় তাহলে কোনো না কোনো উপায় ঠিকই বেরিয়ে যায়। অফুরন্ত ভান্ডারের মালিক তো আল্লাহ, বান্দার ক্রমাগত অশ্রুসিক্ত অনুনয়ে এক সময় আল্লাহ মালিকই তার ভাণ্ডারের মুখ খুলে দেন।

## কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

দায়িত্বশীলদের উচিত আরো কতিপয় বিষয় সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা এবং অন্যদেরকেও সচেতন করে তোলা। এই সব ব্যাপারে অধিকতর জাগরিত চৈতন্যের প্রয়োজন হচ্ছে–

## সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতা সম্পাদনের জন্যে, পরিপূর্ণ তৎপরতা বিনিয়োগের জন্যে, একটি সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সত্যিই প্রয়োজন রয়ে গেছে। এই সন্দেহাতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্যই সর্বাধিক সহযোগিতা করতে পারে।

একদা কবি কা'ব ইবনে মালেক (রা.) জিজ্ঞেস করলেন– হে আল্লাহর রাসূল, কবিতা সম্পর্কে আপনি কি আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন? রাসূল (সা.) উত্তর করলেন– সত্যি সত্যিই বিশ্বাসী মানুষেরা তরবারি দিয়েও যুদ্ধ করে, জিহ্বা দিয়েও যুদ্ধ করে।

সেকালেও আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার দুটি প্রখ্যাত পদ্ধতিই চালু ছিলো। সমন্বিত এই দুটি পদ্ধতি হচ্ছে:

ক. অস্ত্র চালনার মাধ্যমে জিহাদ।
খ. জিহ্বা পরিচালনার মাধ্যমে জিহাদ।

মনে রাখতে হবে, প্রশ্ন করা হলো কবিতা সম্পর্কে, কিন্তু উত্তর দেয়া হলো যুদ্ধ সম্পর্কে, যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে কতোটা প্রসারিত এবং বিস্তারিতভাবে। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাতিয়ারের নানাবিধ কৌশল প্রয়োগও যেমন জিহাদ, ঠিক তেমনি জিহবার নানা কৌশল প্রয়োগও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।


www.nagorikpathagar.org

এই কবিতার শক্তি যে তীরের চেয়েও কখনো কখনো তীক্ষ্ণ তা আমরা রাসূল (সা.) এর মুখ থেকে শুনেছি।

আনাস (রা.) বলেছেন– রাসূলে খোদা যেদিন 'কাজা ওমরা' সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করলেন, কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেদিন তার আপন কাঁধের ওপর আপন তরবারি বিন্যস্ত করে এবং বাম হাতে রাসূলে খোদার উটের নাকের দড়ি ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে আবৃত্তি করতে লাগলেন–

খললু বালি কুফ্‌ফারি আন সাবিলিহী-
আল্ ইয়াজিলুল হামা আন্ মাকবালিহী-
দরবার ইয়াজিলুল হামা আন্ মাকবালিহী-
ওয়াইয়াল/ওয়াইয়াজ হালুল খালিলু আন খালিলিহী।

হে কাফেরের বাচ্চারা! সরে দাঁড়া, রাসূলের আগমন-পথ থেকে দূর হয়ে যা, আজ যদি তার আগমন-পথে আবার বাধা হয়ে দাঁড়াস তাহলে এমন আঘাত হানবো যে, মাথা আর ঘাড়ের ওপর থাকবে না; বন্ধুও [চিরদিনের জন্য] বন্ধুর কাছ থেকে আলাদ হয়ে যাবে।

হযরত ওমর রা. বললেন–

ইবনে রাওয়াহা, তুমি রাসূলের সামনে এবং হেরেম শরিফের মধ্যেই এ ধরনের কবিতা আবৃত্তি করছো?

ওমর (রা.)-এর কথা শুনে রাসূলে খোদা উত্তর করলেন:

ওমর, বাধা দিও না, এ কবিতা তো তীরের চেয়েও সবেগে শত্রুদের কলিজার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে।

ঐ দৃঢ়চিত্ত ওমর (রা.)-ই তার খেলাফতের আমলে বসরা শাসনকর্তা আবু মুসা আশয়ারি (রা.) কে নির্দেশ দিয়েছিলেন–

লোকদের কবিতা শিক্ষার নির্দেশ দিন। কারণ, কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং বংশ [ইতিবৃত্ত] সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। বস্তুত আরবি সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে ওমরকে (রা.) সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এ কথা কে না জানে যে, রাসূলে খোদা যখন একটি নব জীবনের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তখন তা প্রতিহত করার জন্য একশ্রেণীর বিভ্রান্ত কবিও উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলো। এদের কাজই ছিলো কবিতার মাধ্যমে রাসূলের নিন্দাবাদ করা, রাসূলের (সা.) অনুসারীদের নিন্দাবাদ করা, সর্বোপরি আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থার নিন্দাবাদ করা।


www.nagorikpathagar.org

এই নিন্দুকদের দাঁতভাঙা জবাব দেয়ার জন্যই রাসূলে খোদা ঘোষণা করলেন- 'মামাজা ইয়ামনাউল্লাজিনা নাছারুল্লাহা ওয়া রাসূলাহু বিআসলিহাতিহিন আইয়ানছুরুহু বিআলসনাতিহিম?'

যারা অস্ত্রশাস্ত্র দিয়ে আল্লাহ আর আল্লাহর রাসূলের সাহায্য করেছ, তাদেরকে কে নিষেধ করেছে কথার [কবিতা] মাধ্যমে সাহায্য করতে?

শেষ পর্যন্ত হাসসান বিন সাবিত (রা.) ই তার কাব্য প্রতিভার সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন ঐ নিন্দুক কবিদের কুৎসিত কবিতার জবাব দেবার জন্য। অন্যান্য সাহাবী কবিরাও সাধ্যমতো জবাব দিয়েছিলেন অবশ্য। তারপর সম্মিলিত জবাবই নিস্তব্ধ করে দিয়েছিলো কাফের কবিদের সমস্ত অপচেষ্টা।

সেকালের হাতিয়ারের যুদ্ধেও যেমন বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি বিবর্তন ঘটেছে মুখের যুদ্ধেরও, কবিতার যুদ্ধেরও। সে সময় কবিতা এবং বক্তৃতাই ছিলো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন; আজ যা নানান প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেই সমাজ-বিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু তা মনে হয় নতুন করে তুলে ধরার দরকার নেই। আজকে যারা কোরআন সংশোধনের কথা বলছে কিংবা ইসলামের অনুসারীদের সবচেয়ে মূর্খ বলে অকথ্য ভাষা ব্যবহার করছে এই অকথ্য ভাষা তারা যেমন বলে বেড়াচ্ছে, তেমনিভাবে লিখেও যাচ্ছে- এদের যথার্থ মোকাবেলা করার জন্যে কি ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা উচিত তা ভুক্তভোগীদেরই সবচেয়ে বেশি জানা থাকার কথা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ফরজ না-কি ওয়াজিব? সে ব্যাপারে সময়ক্ষেপণ করার মতো আদৌ কোনো কারণ আছে কি?

**চিহ্নিত করা এবং সেই সব প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্যে যথার্থ ব্যবস্থা নেয়া**

সোজা কথায়, তাদের বেড়ে ওঠার পথের সমস্ত বাধা বিদূরিত করা, বিশেষ করে, অর্থনৈতিক বিপত্তিগুলোকে অপসারিত করার জন্যে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সেই সাথে তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে কিভাবে পুনর্বাসিত করা যায় সে ব্যাপারে সুদূর-প্রসারী পরিকল্পনা হাতে নেয়া।

**মননশীল উৎপাদনগুলোকে সংরক্ষণ করা**

দেশের ইসলামী আন্দোলন দিনানুদিন যেভাবে জোরদার হচ্ছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নানান কর্মকাণ্ডও সূচিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ বিষয়। এখন এই সব মননশীল উৎপাদনকে সংগ্রহ করা, সংরক্ষণ করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এ কাজগুলো এখনই শুরু করতে না পারলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।


www.nagorikpathagar.org

## সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য পদ অর্জন করা

অপসংস্কৃতির মোকাবেলায় আজকে যদি সত্যিই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হয় তাহলে সর্বোচ্চ প্রচার মাধ্যমগুলোতে যথাযোগ্য জনশক্তি সরবরাহ করতে হবে এবং সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর, চাই সরকারী হোক কি বেসরকারী, সদস্য পদ অর্জন করার মধ্য দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোর নিঃস্বার্থ সেবা করে যেতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকার অর্থ হলো– সাংস্কৃতিক অসুস্থতাকে দীর্ঘায়িত করার সুবিধাপত্র প্রদান করা।

## উপস্থাপন করতে হবে অবশ্যই মানসম্পন্ন করে

আমরা এমনি সময় অতিক্রম করছি যখন অপসংস্কৃতির রূপরেখা আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই কারণে অডিও-ভিডিও এবং শর্টফিল্মের কাজকে অধিক দ্রুততার সাথে যথার্থ করতে হবে; জারি, পল্লী কবিতা, গম্ভীরা, গীতিনকশা, একাংকিকা এবং নাটকের মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলোকে উপস্থাপন করতে হবে, উপস্থাপন করতে হবে অবশ্যই মানসম্পন্ন করে, রুচিসম্পন্ন করে। এইসব বিষয়ের পরিপক্ক প্রতিভাগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে, কজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে তারপরই প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, অডিও-ভিডিও, ক্যাসেট 'অন্তত কী পয়েন্ট'গুলোতে যাতে পৌঁছে যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

## শিশু সংগঠনকে অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না

শিশুকার্যক্রমকে অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন করতে হবে। আমরা যদি বিশ্বাস করে থাকি-

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা/সব শিশুরই অন্তরে...

তাহলে শিশু সংগঠনকে অবহেলার চোখে দেখলে চলবে না। মূলত সবপর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি, বিশেষ করে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিভা বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম ক্ষেত্র এটিই।

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ খুররম জাহ মুরাদ বলেছেন–

> 'যথার্থ বিশ্বাসী মানুষের গড়ে উঠবার সময়ই হচ্ছে পাঁচ থেকে এগার বছরের মধ্যবর্তী সময়কাল। এ সময়কালের মধ্যে গড়ে ওঠা মানসিকতাই, স্বাভাবিকভাবে আমৃত্যু একটি মানুষকে পরিচালিত করে।'

## কেন্দ্রীয় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা

আমাদের জনশক্তিকে পাঠবিমুখতা থেকে মুক্তি দিতে হবে। এর জন্যে প্রয়োজন নানা পর্যায়ের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার। একটি বিশাল আকারের কেন্দ্রীয় পাঠাগার


www.nagorikpathagar.org

প্রতিষ্ঠার আশু প্রয়োজন– আমাদের বেড়ে ওঠা তারুণ্যের পথ-নির্দেশিত হবার জন্যে প্রথমতো, পথ-নির্দেশ করার জন্যে দ্বিতীয়ত।

যারা বলে থাকেন, চতুর্দিকেই তো পাঠাগার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, নতুন করে আরেকটির দরকার নেই। তাদের উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মতো যাকে প্রশ্ন করা হলো– শিরনি খাবি? সে বললো– খাবো। আবার প্রশ্ন করা হলো– পয়সা দিবি? সে বললো– উহ-হু [না]। আসলেই আমরা যদি, তস্তুরি ভরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট শিরনী পেতে চাই– তাহলে তার জন্যে হাজি মহসীনের স্বভাবের বিকল্প নেই।

## পাঠ্য তালিকা তৈরি করা

ইসলামী সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জনশক্তিকে পরিপূর্ণ ধারণা দিতে না পারলে জনশক্তি একটি অবিন্যস্ত মানসিকতায় আক্রান্ত হতে বাধ্য হবে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে এমন কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যা ঐ অবিন্যস্ত মানসিকতা দূর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্যকারী হতে পারে। এই সব গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি করা যায়। অর্থাৎ একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করার মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে দিক-নির্দেশনার যে কাজ, সে কাজের আঞ্জাম দেয়া যায়। তালিকাভুক্ত কিছু বাছাই গ্রন্থ অবশ্য সুধীমণ্ডলীর মধ্যেও, উপঢৌকনের আনন্দে বিতরণ করা গেলে, অতিরিক্ত ফলাফল পাওয়া যাবে। এ কথা মনে রাখা ভালো যে, অনেকেই পড়তে জানে, কিন্তু কি কি পড়তে হবে তা জানে না।

সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অঙ্গনের জন্যে এক দল নিবেদিত প্রাণ কর্মী তৈরির জন্যে এমন একটি সিলেবাস তৈরি করা উচিত, যে সিলেবাস সাহিত্য- সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুরোপুরিভাবে বুঝে উঠতে সাহায্য করবে। আসলে সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্যে আদৌ কোনো সিলেবাস নেই বলে জনশক্তির ধারণায় সব সময়ই একটা খলত-মলত ভাব থেকেই যাচ্ছে।

## কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি। যাদের কাজ হবে সারাদেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করা, দিক-নির্দেশ করা এবং সমন্বয় সাধন করা। অনুরূপভাবে আঞ্চলিক ভিত্তিতেও ঐ পরিষদ গঠিত হতে পারে। প্রস্তাবিত পরিষদে থাকবেন– বর্তমান দায়িত্বশীলদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, প্রাক্তনদের ভেতর থেকে একটি অংশ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের ভেতর থেকে একটি অংশ। সেই সঙ্গে প্রয়োজন একটি সম্পাদনা পরিষদেরও।


www.nagorikpathagar.org

## কালচারাল কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা

সত্যিকথা বলতে কি, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্য আমাদের কেবল শুরু হয়েছে। একে পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে নেবার জন্য কয়েক গুণ অধিক গতিনির্ভর গবেষণা, পরিচর্যা ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং একটি বহুতল বিশিষ্ট সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভবন প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে সর্বাগ্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে অনুধাবন করতে হবে। আমরা যতো কথাই বলি না কেনো, এমন ধরণের একটি ভবন প্রতিষ্ঠা ছাড়া সারাদেশের কাজকে সমন্বিত করা অসম্ভব।

## দুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের জন্য সাহায্য তহবিল গঠন করা

দুস্থ লেখক-শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীদের জন্য একটি মজবুত তহবিল কায়েম করা দরকার। প্রয়োজনের সময় যাতে এ-তহবিল সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে। ইতিবাচক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ- দেশে অনেক আগে, কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবকদের জন্য একটি সাহায্য তহবিল কোথাও গঠিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ফলে, সেবকদের কেউ একজন অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলে, অবস্থা তার করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে, করুণার পাত্র হচ্ছে সে ফকিরের চেয়েও। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আশু একটি স্থায়ী উপ-কমিটি গঠিত হয়ে যাওয়া উচিত।

## বিভিন্ন গবেষণার জন্যে উপ-কমিটি গঠন করা

আজ বড় বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করার। পারতপক্ষে আকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এই সব উপ-কমিটি এখনই গঠিত হোক এবং এই উপ-কমিটি এখনই উদ্যোগী হোক। সম্ভবত এক সময় এইভাবে আমরা সন্দেহাতীত ভালো ফলাফল পেয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ।

সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে সামনে রেখেই এক একটি উপ-কমিটি হতে হবে। কোন এক ক্ষেত্রে হয়তো একজনকেই পাওয়া গেল-ঐ একজনকে দিয়েই শুরু করে দিতে হবে তাৎপর্যবহ কার্যক্রম।

## আন্দোলনমুখী কর্মসূচি উপস্থাপন করা

সত্যি বলতে কি, আমরা এখনও পর্যন্ত কোন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারিনি; গড়ে তুলতে পারিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিপ্লবী কোন গণ-সংগঠন। যখন আমাদের ইতিবাচক রাজনীতি পর্যন্ত দুঃখজনকভাবে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে গণ-দুশমন এবং দেশদ্রোহীদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন, কেবল


www.nagorikpathagar.org

তখনও কিন্তু আমাদের এমন কোন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠলো না, যা শুধু বিজাতীয় রাজনীতি অর্থনীতি তো অনেক দূরের কথা বিজাতীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখতে পারে, আগ্রাসনকে রোখার ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।

**কেন পারে না?**

১. পারে না- ঐক্যবদ্ধ কোন পরিকল্পনা কখনো ছিলো না, এখনও নেই বলে;
২. পারে না- বহুদর্শী কোন পৃষ্ঠপোষকতা কখনো ছিলো না, এখনও নেই বলে;
৩. পারে না- বিস্তারিত কোন উদারতা কখনো ছিলো না, এখনো নেই বলে;
৪. পারে না- মুক্তহস্ত কোন অর্থানুকূল্য কখনো ছিলো না, এখনও নেই বলে।

হ্যাঁ এটা ঠিক, আলহামদুলিল্লাহ, বহু সংখ্যক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠন দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে অর্থাৎ গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক শিল্পীগোষ্ঠী-নাট্যগোষ্ঠী-সাহিত্যগোষ্ঠী। এখন প্রয়োজন হচ্ছে এ-গুলোর জন্যে ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনার, বহুদর্শী পৃষ্ঠপোষকতার, বিস্তারিত উদারতার, মুক্তহস্ত অর্থানুকূল্যের; সেই সঙ্গে প্রয়োজন সংগঠনগুলোর সামনে একটি আন্দোলনমুখী কর্মসূচি উপস্থাপনার এবং যথার্থ একটি কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধানের।

মহাকবি ইকবাল- ড. মুহাম্মদ ইকবাল- ১৯৩২ সাল, ২১শে মার্চ 'ঐক্য-সংহতি-সংগঠন' শিরোনামের একটি বক্তৃতায়, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পাঁচটি প্রস্তাবের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ঐ পাঁচটি প্রস্তাবের মধ্যে চতুর্থ প্রস্তাবটি ছিলো খুবই তাৎপর্যবহ। চতুর্থ এই প্রস্তাবটিতে তিনি বলেছিলেন- 'আমি ভারতের সবগুলো বড়ো বড়ো শহরে পুরুষ ও মহিলাদের সাংস্কৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।'

এই চতুর্থ প্রস্তাবে তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন- 'মানব জাতির ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলাম ইতোমধ্যে কি কি কৃতিত্ব অর্জন করেছে এবং এখনো তার কি কি কৃতিত্ব অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট অনুভূতি সঞ্চার করে আমাদের তরুণ সমাজের অন্তরের ঘুমন্ত উদ্যমকে সুসংহত করাই হবে তাদের প্রধান কাজ। একটি জাতিকে বিচ্ছিন্ন- খণ্ড জীবনের সমষ্টি হিসেবে নয়; বরং অভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতিসম্পন্ন সুনির্দিষ্ট- সমগ্র-হিসেবে উপলব্ধি করার এবং তার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করার মতো ব্যক্তিমনের বিশালতা আনয়ন করার উপযোগী নতুন কর্তব্য পেশ করেই কেবলমাত্র একটি জাতির প্রগতিশীল দলসমূহকে জাগ্রত করে তোলা যায়। একবার এই শক্তিকে জাগ্রত করা গেলে তারা আনয়ন করে নতুন সংঘাতের নব নব উদ্যম এবং সেই অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতার অনুভূতি যা- ভোগ করে প্রতিরোধ ক্ষমতাও বয়ে আনে নতুন সত্তার প্রতিশ্রুতি।


www.nagorikpathagar.org

## আন্তর্জাতিক দায়িত্ব

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জনশক্তিকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত করাতে হবে। তাহলেই কেবল নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে জনশক্তি একটি যুক্তিসঙ্গত ধারণা অর্জন করতে পারবে। ফলে যাবতীয় সৃষ্টি ও প্রস্তুতির মান স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে তা-ই নয়, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে, নির্যাতিত মানুষের জন্যেও যে কিছু করণীয় আছে সেই অনুভূতি এ ব্যাপারে জাগরিত হবে। সুতরাং কয়েকটি উদ্যোগ এখনই নেয়া প্রয়োজন।

## মুসলিম দুনিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাবতীয় সৃষ্টি সংগ্রহ করা

সারা দুনিয়ার-বিশেষ করে মুসলিম দুনিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক যাবতীয় সৃষ্টি সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলোর সযত্ন অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু গানের ব্যাপারে একটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করা যায়- বৈচিত্র্যপূর্ণ সুরগুলো অবিকৃত রেখে কথাগুলোই শুধু অনুবাদ করা এবং গেয়ে যাওয়ার মধ্যে এক অসম্ভব অর্জনের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। প্রায় একযুগ আগেই এখওয়ানুল মুসলেমীনের কবি ও শিল্পীরা 'ড. ইকবালের চীন ও আরব হামারা/হিন্দুস্তাঁ হামারা/মুসলিম হ্যাঁয় হাম/ ওয়াতন হ্যাঁয় সারা জাহাঁ হামারা'র আরবি অনুবাদ করেছেন, সুর আরোপ করেছেন, গেয়েছেন; যে-গানটি 'আদ্দ্বীনু লানা ওয়াল হাককু লানা ওয়াল আদলু লানা ওয়াল কুল্লু লানা' এই আরবি পরিচয়ে বিশ্বময় যে ছড়িয়ে গেছে, ক'জনই বা তার খবর রাখে। সমাজবাদী সুরসাধক হেমাঙ্গ বিশ্বাস চীন-রাশিয়া তথা গোটা দুনিয়ার গণসঙ্গীত নিয়ে যে কাজটি করে গেছেন তা সবার জন্যেই একটি চমৎকার উদাহরণ হয়ে রইলো।

## অনুবাদ করা

এ-পর্যন্ত আমাদের যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তারও অনুবাদ করা-আরবি, ফারসী, উর্দু এবং ইংরেজীতে। 'যা কিছু' বলতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সব কিছুকেই বুঝিয়েছি। আজ যদি নজরুলের গান, ফররুখের গান এবং অন্যান্য ইসলামী গানের সুর অবিকৃত রেখে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সরবরাহ করা যেতো, তাহলে সন্দেহ নেই, তার প্রভাব সারা দুনিয়াতেই পড়তো। অন্যান্য আর যা কিছু তারও অনুবাদ করতে পারলে, কী যে হতো, তা সবারই অনুধাবনের সীমানার মধ্যে আছে বলে মনে করি। এ-প্রসঙ্গে একটি কথা না বলে পারছি না। সেই কথাটি হলো আমাদের এখানে আন্তর্জাতিক ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখার খুব যে অভাব আছে তা তো নয়, কিন্তু তাদের অর্থানুকূল্যে কোন আন্তর্জাতিক পাঠকেন্দ্র অথবা কোন আন্তর্জাতিক গবেষণাকেন্দ্র আজো গড়ে উঠেছে বলে আমাদের জানাই নেই। যদি গড়ে উঠতো তাহলে গোটা জাতিই যারপরনাই উপকৃত হতো।


www.nagorikpathagar.org

### সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক বিনিময়

সারা দুনিয়াতেই আজ ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে, সেই জন্যে : বিভিন্ন উপলক্ষে, বিশেষ করে সীরাতুন্নবী উপলক্ষে বিদেশের ইসলামী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে, শিল্পীগোষ্ঠীকে, নাট্যদলকে আনা যায়, তেমনি আমাদের দেশ থেকেও পাঠানো যায়। এতে করে ইসলামী সংস্কৃতির একটা পরিচিতি সারা দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমরা সুসমৃদ্ধ হবো।

### দেশে দেশে সাহিত্য- সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা

আমাদের দেশের বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব বিদেশে অবস্থান করছেন। উচিত হচ্ছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সংগঠন-সীমিত আকারের হলেও গড়ে তোলার জন্য ঐ সব ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করা এবং যারা যে দেশে আছেন, তাদেরকে সে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়, গান ও সুর সংগ্রহের ব্যাপারে উৎসাহিত করা; সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি এবং ইসলামী আন্দোলনের ওপর বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ রচনার জন্য দায়িত্ব বন্টন করা, সর্বোপরি সে দেশের সাহিত্য এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিবিধ লেখা তৈরির জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হবার ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া। পরামর্শ দেয়া উচিত সে দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য; এমনকি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহের জন্যেও পরামর্শ দেয়া যায়। বিদেশে অবস্থানরত ভাইয়েরা যাতে উন্নতমানের সংকলন প্রকাশ করেন, সে ব্যাপারেও তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা উচিত।

### সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বৃত্তি প্রচলন করা

দেশের মত বিদেশে অবস্থানরত ভাইয়েরাও যেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন দিবস পালন, বিবিধ ওয়ার্কশপ-সেমিনার- সিম্পোজিয়াম-সম্মেলনের আয়োজন করতে পারেন- সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সার্বিকভাবে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। সহযোগিতা করতে হবে পরামর্শ দিয়ে, অনুপ্রেরণা দিয়ে, পরিকল্পনা দিয়ে, কর্মসূচি দিয়ে, পারতপক্ষে উদার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভাবন ঘটিয়ে। একটি কথা মনে রাখতে হবে, অপেক্ষাকৃত ভালো মান ও মেধার অধিকারীদেরই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ বিদেশে যায়, যাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক থাকেন সাহিত্যের মেধা ও সাংস্কৃতিক প্রতিভার অধিকারী। উচিত হচ্ছে- বাইরে থেকে এরা যেন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরো যোগ্য হয়ে ফিরে আসতে পারে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করা যায়।


www.nagorikpathagar.org

## উপসংহার

যে-সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে, সে-সময়ে আমাদের এই জাতির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের মূল ভিত্তিভূমি তছনছ করে দেয়াই হচ্ছে শত্রুদের প্রধান লক্ষ্য। কারণ তারা জানে, এই জাতির ঐক্যের সর্বোত্তম হাতিয়ার যে-ঈমান, সেই ঈমানকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে এই জাতিকেও পর্যুদস্ত করা যাবে না, সেই জন্যেই তারা চায় আমাদের ঈমান যেন আমাদের রাজনীতির সাথে জড়িত না থাকে, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-ভাবনা, সংস্কৃতি-চিন্তা, দেশপ্রেম, মানব প্রীতির সাথে সংযুক্ত না থাকে; সেই কারণেই আমাদেরকে কেবল বিচ্ছিন্ন রাখতে চায়, বিভক্ত রাখতে চায়, নিরপেক্ষ রাখতে চায়, অন্ধ রাখতে চায়। তারা জানে যে, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের দর্পণ আর সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির শুদ্ধতম পরিচয়, কিন্তু সেই দর্পণ যদি ঈমানের পারদে অভিষিক্ত হয়, সেই পরিচিতি যদি ঈমানের আলোয় আলোকিত থাকে তাহলে ঐ ঈমানদীপ্ত জাতিকে পদানত করা সম্ভব নয়।

তারা এও জানে, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ব্যূহ ভেদ করতে হলে সর্বপ্রথম সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ওপরই হামলা করতে হবে। হামলা করতে হবে সূক্ষ্মভাবে-অপসাহিত্য ছড়িয়ে দিয়ে, অপসংস্কৃতির পাচার করে। তাইতো তারা নানা কলা-কৌশলের মধ্য দিয়ে করছে, দেদার করে যাচ্ছে। আর তা করতে গিয়ে তারা লক্ষ-লক্ষ-কোটি টাকা ব্যয় করে যাচ্ছে। বিষয়টি বুঝতে হবে বিপ্লবী অভিভাবকদের। অন্তত আর কেউ না বুঝুক জাগ্রত তারুণ্যকে তা বুঝতে হবে, তা বুঝতে হবে অরুণপ্রাতের তরুণ দলকে-যারা 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল' হলেও 'চলরে চলরে চল' গাইতে গাইতে 'হেরার রাজতোরণ'-এর দিকে ধাবিত হয়। প্রধাবিত হয় বিপুল বন্যাবেগ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, উল্লাসে।


www.nagorikpathagar.org

# সংস্কৃতি

[অগ্রন্থিত]

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# সংস্কৃতি

মতিউর রহমান মল্লিক

www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ কথা

'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থে 'ইসলামী সংস্কৃতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছিলো। পরবর্তীকালে একটি তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনে কবি ওই প্রবন্ধের শুরুতে সংস্কৃতি প্রসঙ্গের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধি তুলে ধরেন এবং নতুন শিরোনাম দেন 'সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতি'। সাংস্কৃতিক সম্মেলন স্মারক ২০০২-এ এটি প্রকাশ পায়। কবির অভিপ্রায় ছিলো এই লেখাটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার। সেই আলোকে আমরা এটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছি। পাণ্ডুলিপিটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন হাশেম আলী।

www.nagorikpathagar.org

# সংস্কৃতি

'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থ-শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা-রুচি নীতি, উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture, তমদ্দুন, মার্জনা, পরিশীলন, অনুশীলন, সভ্যতা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন, পরিষ্কার বা নির্মল করা অথবা সংশোধন। মানব সমাজের মানসিক বিকাশের প্রমাণ। একটি জাতির মানসিক বিকাশের অবস্থা। কোন জাতির বৈশিষ্ট্যসূচক শিল্প-সাহিত্য, বিশ্বাস, সমাজনীতি ইত্যাদি।

"Culture is that what we are."- H. J. Laski অর্থাৎ সংস্কার করে যা পাওয়া যায় তা-ই সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্যে একবার সংস্কৃতি সম্পর্কিত একটি বক্তব্য দারুণ রকমের বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলো। ঐ বক্তব্য সম্পর্কে A Dictionary of Literary terms by J. A. Coddon বলেছে : In 1959 C. P. Snow delivered a lecture in Cambridge which tells that the linkage between humanity and technology is a kind of culture.

Here humanity means Arts, and technology means science. This lecture caused a great deal of controversy.

১৯৫৯ সালে অধ্যাপক C. P. Snow ক্যামব্রিজে প্রদত্ত এক লেকচারে বলেছিলেন: মানবতাবাদ এবং প্রযুক্তিবাদ এই দুয়ের মধ্যবর্তী যোগসূত্রই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি।

এখানে মানবতাবাদ অর্থ সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তিবাদ অর্থ বিজ্ঞান। পরবর্তীতে তার ঐ বক্তব্য ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো।



www.nagorikpathagar.org

A. S. Hornby- Gi Oxford Advanced Learners English Dictionary সংস্কৃতি সম্পর্কে একাধিক তথ্য পরিবেশন করেছে :

ক. Refined understanding and appreciation of arts, Literature etc. (সাহিত্য, কলা ইত্যাদির পরিশোধিত অনুধাবন এবং চিন্তাধারাই হলো কালচার বা সংস্কৃতি।)

খ. State of intellectual development of a society. (কোন সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির নামই সংস্কৃতি।)

গ. Particular form of intellectual expression specially in art and literature. (বিশেষত সাহিত্য এবং কলার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রকাশই হচ্ছে সংস্কৃতি।)

ঘ. Customs, arts, Social institutions etc. of a particular group of people.... কোন একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-কলা ইত্যাদিই হলো ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ কানাডীয় ইউনেস্কো কমিশন (Canadian National Commisson for UNESCO) সংস্কৃতির সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি সভা আহ্বান করে। দীর্ঘ আলোচনা ও মত-বিনিময়ের পর উক্ত বিশেষজ্ঞরা যে সংজ্ঞা স্থির করেন তাকে তারাই working definition বলে উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে এই সংজ্ঞাটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের পরে, কেননা সংজ্ঞাটি পরীক্ষামূলক ও সংশোধনমূলক ও সংশোধন সাপেক্ষ। স্থিরকৃত সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ :

Culture is a dynamic value system of learned elements, with assumptions, conventions, beliefs and rules permitting members of a group to relate to each other and to the world to communicate and to develop their creative potential.

সমাজবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকেরা সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কারো মতে সংস্কৃতি হলো অতীতের ঐতিহ্য ও আগামীর স্বপ্নের প্রেক্ষিতে নির্মিত মানুষের ভাবধারা, নান্দনিক রূপ ও মূল্যবোধের সমন্বিত প্রকাশ। আবার অভিধানে সংস্কৃতির সংজ্ঞার্থ সন্ধান করলে হয়তো এই রকমের একটি বাক্য পাওয়া যাবে :

Cultivation, improvement of refinement by education and training. The training and refinement of mind, tastes and manners, the condition of being thus trained and refined. The intellectual side of civilization.


www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য সত্ত্বেও আধুনিক জ্ঞানচর্চার ধারায় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হয়েছে মানুষের সৃজনশীলতার সমুদয় ফসল-রূপে, মানুষ যা এই পৃথিবীতে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। এ সমস্ত কৃতি ও সৃষ্টি প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে এবং পরে মানুষের জীবনযাপনকে করেছে উন্নততর। বলা যায়, মানুষের জীবনযাত্রার সকল উপাদান এবং সমুদয় উপলব্ধি নিয়েই মানব-সংস্কৃতি।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তাঁর 'ইসলামী সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধে বলেছেন– 'কালচার' কি? উৎকর্ষ বা অনুশীলন। আজকাল সাধারণত একটা বিশেষ অর্থে এর ব্যবহার করা হচ্ছে, যার অর্থ হচ্ছে মানব-মনের উৎকর্ষ সাধন-পদ্ধতি বা রূপায়ণ। অনেকে Refinement অর্থেও কথাটার ব্যবহার করে থাকেন। আবার কারো কারো মতে মানবকল্যাণমুখীতারই নাম 'কালচার', কেউ কেউ আবার Civilization-এর কোন তফাৎ খুঁজে পান না। এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে- অক্সফোর্ড ডিকশনারী বলে : Trained and refined state of understanding and manners and tastes, phase of these prevalent at a time or place, instilling of it by training, artificial rearing of bees, fish, bacteria etc. অর্থাৎ সংস্কৃতি হল বোধ, আচরণ ও আস্বাদনের প্রশিক্ষিত রূপ। একই সময় ও স্থানের প্রেক্ষিতে যে সবের ক্রমোন্নয়ন, বলা যেতে পারে, মৌমাছি, মাছ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির প্রজননের ধরনে ধীরে ধীরে সেসব পরিশীলিত রূপের চর্চা। সংস্কৃতির একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলীয়া ইজেতবেগভিচ, সংস্কৃতি হলো অনবরত নিজেকে সৃষ্টি করা।

আমাদের সংস্কৃতি প্রবন্ধে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন– তাহযীব ও তমুদ্দুন দু'টো আরবি শব্দ। তমুদ্দুন শব্দটা এসেছে 'মুদন' থেকে। তা থেকে 'মাদানিয়াত' অর্থাৎ নাগরিক বোধ। অন্য কথায় নগর জীবন ভিত্তিতে যে পরিশীলিত সভ্যতা গড়ে ওঠে তাকে তমুদ্দুন বলা যায়। তাই তমুদ্দুন সভ্যতার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'তাহযীব' শব্দটা এসেছে 'হযব' থেকে। হাযাবা, হাযযবা, তাহযীব মানে কেটে সমান করা। যেমন বাগানের চারদিকে যে গাছের বেড়া দেয়া হয় মালি কাঁচি দিয়ে কেটে তার মাথাগুলো তাহযীব করে। অর্থাৎ মাথা ও দু'পাশ কাঁচি দিয়ে কেটে সমান করে। কোনো একটা ডাল বা পাতা সমান করে কাটা-সীমানা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলে মালির কাঁচি সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা কেটে সমান করে দেন। এভাবে পরিশীলিত পরিমার্জিত করাকে তাহযীব বলে। এই তাহযীব অর্থ দাঁড়ায় মানুষের পরিশীলিত জীবনধারা।

অবশ্যি 'কালচার'-এর ধারণা বিস্তার লাভ করার পরই আমাদের দেশে তাহযীব-তমদ্দুন এবং পরবর্তী কালে সংস্কৃতি শব্দটার প্রচলন শুরু হয়।


www.nagorikpathagar.org

কালচার সম্পর্কে মজার কথা বলছেন, আবুল মনসুর আহমদ তার 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থের 'কালচার কী?' নামের প্রবন্ধে :

> "কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরো এক'শ বছরের দীর্ঘ কাল প্রবাহে ইউরোপ, আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই। তাহার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলেজেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যাটাকে আরও জোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে কালচারকে ডিফাইন করার আর কোনও উপায় নাই। বিশেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে। ইংরাজি সাহিত্যে কালচার শব্দ প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষ দিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড এবং ওয়াল্ট ইমার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি। কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁহারা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশি দিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই।
>
> বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাস্কি প্রভৃতি ইংরাজি পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক গভীর অর্থে ব্যবহার হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাতে সমস্যা মেটে নাই। বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীরতর মানে গ্রহণ করার ফলে সমস্যার জটিলতাও ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে।"

সেই জটিলতা কতটা ভয়াবহ ও মানবতাবিরোধী হয়েছিল তার একটি চিত্র এঁকেছেন মাউমিউক পিকথল। পরের একটি উপ-অধ্যায়ে সে বিষয়টিকে তুলে ধরতে চাই। সংস্কৃতিকে বুঝবার জন্যে সভ্যতাকে অনুধাবন করার একটি তাৎপর্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

আবুল মনসুর আহমদ এই ব্যাপারে চমৎকার উদাহরণ পেশ করেছেন :

> মাছ-গোস্ত-তরকারী রাঁধিয়া খাইবে না কাঁচা খাইবে এটা হইবে সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোনটা খাইবে, আর কোনটা খাইবে না, কোনটা হালাল, কোনটা হারাম কি ধরনের পাক-প্রণালী পছন্দের, পেষ্ট্রি-প্যাটিস ভালো না রসগোল্লা-সন্দেশ ভালো, এসব কালচারের প্রশ্ন। খেলাধুলাকে মানুষের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ স্বীকার করা সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপ: ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাংগুলি, এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র।


www.nagorikpathagar.org

প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত আবুল হাশিম তার 'ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ' প্রবন্ধে সংস্কৃতি এবং সংস্কৃতির বাহন প্রসঙ্গে বলেন : সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, কারুকার্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলা-ই সংস্কৃতি। ইহা সত্য নহে। অর্থাৎ শিল্পকলা-ই সংস্কৃতি নহে-উহারা সংস্কৃতির বাহন।

তবে সংস্কৃতি কাহাকে বলে? মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধন এবং তাহার ব্যবহারিক জীবন ও প্রত্যক্ষ জড়-পরিবেশে সেগুলির ফলিত রূপই হইতেছে সংস্কৃতি।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অনেকেই সংস্কৃতিকে একটি Complex, জটিল এবং মনোবিকৃতির বিষয় বলে মনে করেন। তাদের একজন E. B. Tylor। তিনি তার primitive culture গ্রন্থে লিখেছেন: আমরা যেমন তেমনি করে যা আমাদের গড়ে তুলেছি তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি আমাদের বর্তমান ও অতীতের মাঝে যোগসূত্রের রূপরেখা। এটি একটি জনসমষ্টির স্বকীয় পরিচয় দেয় এবং একই সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom and any other capabilities and habits aquired by man as a member of society.

অর্থাৎ সমাজের সদস্যরূপে অর্জিত আচার, আচরণ, ব্যবহার, জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতি, প্রথা, আইন ইত্যাদির জটিল সমাবেশই হলো সংস্কৃতি।

কোন একটা জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সামাজিক প্রথা, আচার-ব্যবহার, সাহিত্য-কলা ইত্যাদিই হলো ঐ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। সত্যি কথা বলতে কি, সংস্কৃতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ঐ মারাত্মক অনৈক্য, পশ্চিমা সমাজকে এমন মানবতাবিধ্বংসী মানবগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। পাশ্চাত্য জগৎ সার্বিকভাবে গ্রহণ করেছিল এরিস্টটলের সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বিচ্ছিন্ন দর্শনকে। যদিও প্লেটোর দর্শন ছিল সমাজ সম্পৃক্ত। তিনি বিশ্বকে দেখেছিলেন শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে, যে শিক্ষা আবার রাষ্ট্রব্যবস্থার শক্তি ও স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ প্লেটোর লক্ষ্য ব্যবহারিক। কিন্তু এরিস্টটল শিল্পকে স্বাধীন ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। শিল্পের মৌলিক বিষয়ে এরিস্টটলের উক্তি : শিল্প স্বভাবের অনুসরণ করে। স্বভাব যা করতে ইচ্ছা করবে শিল্পও তাই করবে।

কিন্তু প্লেটো তা চাইতে পারেননি বলে ট্রাজেডির রচয়িতাদের ধিক্কার দিয়েছেন: "The tragic poet is an imitator and therefore, like all other imitators, he is thrice removed from the throne of truth."

অর্থাৎ ট্রাজিক কবি হলেন নকলবাজ, সুতরাং সকল নকলবাজের মতই, তিনি সত্যের সিংহাসন থেকে তিনগুণ অপসারিত হলেন।



www.nagorikpathagar.org

এরিস্টটলের শিল্পের ক্ষেত্রে যা ইচ্ছে তাই করবার দর্শন যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তা আজ গোটা দুনিয়ার সচেতন মানুষ টের পাচ্ছে। সুতরাং এরিস্টটলের শিল্প-দর্শনকে স্বাধীন-শিল্প দর্শন না বলে বলা উচিত লাগামহীন শিল্প-দর্শন।

লাগামহীন শিল্প-দর্শনের নমুনা পেশ করেছেন মার্মেডিউক পিকথল তার 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' নামে প্রকাশিত একটি বক্তৃতায় :

কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সংবাদপত্র-মহলের একটি আলোচনার কথা আপনাদের কারো নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রশ্নটি ছিল এই:

'মনে করুন একটি কক্ষে একটি জীবন্ত শিশুর সঙ্গে একটি সুবিখ্যাত ও অনুপম সুন্দর গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তি রয়েছে, সমপর্যায়ের মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি অসাধারণ ও অতুলনীয়, সুতরাং এর স্থান পূরণ অসম্ভব। এখন ধরুন, কক্ষটিতে আগুন লেগেছে, আর মূর্তি ও শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই বাঁচানো সম্ভব। এ অবস্থায় কাকে বাঁচাতে হবে?

আমার মনে আছে, প্রায় অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ ব্যক্তি হতভাগ্য শিশুটির সামনে মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর্য মূর্তিটি রক্ষার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাদের যুক্তি ছিল, প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়, পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য শিল্পের সেই শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব হবে না।'

কোন মুসলমান কখনো এই অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত অভিমত গ্রহণ করতে পারে না। কিংবা এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপোষক হতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমা পূজার সর্বশেষ মার্জিত রূপ।

শিল্প-সংস্কৃতির ঐ প্রতীক-পূজারী ইউরোপকে যথার্থভাবে জেনেছিলেন মহাকবি ইকবাল। তাই তিনি খোলাখুলিভাবে ইউরোপ সম্পর্কে মনোভাব ব্যক্ত করে ছিলেন তাঁর 'প্রাচ্যের জ্ঞান' কবিতায় :

'জ্ঞানীরা নিরাশ হলো ইউরোপ থেকে
কেননা এ জাতির অন্তর পবিত্র নয়।'

আর শিল্পের গোলামদেরকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর 'শিল্পীদের' প্রতি কবিতায় উচ্চারণ করেছিলেন :

'তোমার আত্মা যদি দাসত্ব
দুঃখে পীড়িত হয়ে থাকে
তাহলে শিল্পের জাহানও তোমার
মন্দির প্রদক্ষিণ ও সিজদার সমাবেশ।'

প্রকৃত শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কেও কবি ইকবাল চিরদিনের বাণী উপস্থাপন করেছেন 'মিসরের পিরামিড' কবিতায় :

'প্রকৃতির দাসত্ব হতে শিল্পকে আজাদ করো
শিল্পীরা শিকারী, শিকার কখনো নয়।'


www.nagorikpathagar.org

## সংস্কৃতি বিভাজ্য কোন বিষয় নয়

এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মনে করেন, শিল্প ও সংস্কৃতির কর্মতৎপরতা এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কর্মক্ষমতা একসাথে চলতে পারে না। অর্থাৎ সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আর শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলন আদৌ এক নয় এবং এই দুটি বিষয়কে একই ধরনের কর্মসূচির আওতায়ও আনা সম্ভব নয়। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ যদিও তিনি ইতিবাচক বিশ্বাসের ঘোরতর বিরোধী- বলেছেন অন্য কথা সংস্কৃতির বিষয়ে। শিল্প, সাহিত্যের সম্পর্ক দৃঢ়। বলেছেন, লেখার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোককে উজ্জীবিত করে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষায় : মানবতাবাদী লেখকের উদ্দিষ্ট পাঠক মধ্য ও উচ্চবিত্তের শিক্ষিত জনগণ। তাদের কিছুসংখ্যককে লেখার মাধ্যমে সংবেদনশীল ও সংগ্রামী করে গড়ে তুলতে পারলে তাদের মাধ্যমেই গণ-সংযোগ ও গণ-আন্দোলন সম্ভবপর হয়। দুনিয়া জুড়ে সৈন্যরা ছড়িয়ে রয়েছে, কেবল সেনাপতিরই অভাব। দুর্যোগ-দুর্দিনে শিক্ষিত সংবেদনশীল দৃঢ়চিত্ত সাহসী ও ত্যাগপ্রবণ কর্মীর নেতৃত্বই সংগ্রামে সাফল্য আনে।

শিল্পীর কমিটমেন্ট কথাটি অপেক্ষাকৃত হাল আমলের। কিন্তু এর মূল বিষয়টি সৃজনশীল শিল্পকর্মের শুরু থেকেই লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী স্বেচ্ছাচারী হবেন না, মানবতাবিরোধী হবেন না। পরিপার্শ্ব ভুলে গিয়ে আত্মকেন্দ্রিক ও জীবনবিমুখ হবেন না, অস্তিত্বহীন হবেন না। অশুভ, অকল্যাণ, কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। তিনি 'কমিটেড' থাকবেন অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন, নিবেদিত প্রাণ থাকবেন শুভ কল্যাণ ও মানবতার প্রতি। এ নিয়ে কোন তর্ক নেই। .. শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে অবশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডিবদ্ধ করা যায় না। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। একটির অভাবে আরেকটির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা যখন কারারুদ্ধ হয় তখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধীরে ধীরে হীনবল হয়ে পড়ে। তারপর একসময় পরাধীনতার অন্ধকারে হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য।

মরিয়ম জামিলা ঐ বিষয়টির গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন একটি ইতিবাচক উপস্থাপনার মাধ্যমে। তিনি তার 'সংস্কৃতির দাসত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়' প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :

বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক অধীনতা অনেক বেশি ক্ষতিকর।.. বাস্তবে সাংস্কৃতিক দাসত্ব রাজনৈতিক দাসত্বের সঙ্গে শুধুমাত্র সম্পৃক্তই নয় বরং সকল ইচ্ছা ও কাজে তা অবিভাজ্য।... কার্যকর মোকাবেলার জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে রাজনৈতিক দাসত্ব আর সাংস্কৃতিক দাসত্ব কেন অবিচ্ছেদ্য, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে হবে যে, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বিরোধী এবং বিদেশী শাসনের অধীনে ইসলামের উৎকর্ষ অসম্ভব।


www.nagorikpathagar.org

সুতরাং রাজনৈতিক আন্দোলনকে এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বিভক্ত করা আত্মহত্যারই শামিল। একটি জাতিকে যখন মুখোমুখি লড়াইয়ে পরাজিত করা যায় না তখন নানাভাবে সেই জাতির মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত 'ইসলামে রাজনীতি নেই' বলে এবং 'হারাম' বলে বিপুল সংখ্যক বীর্যবান মানুষকে নপুংসক করে ফেলা হয়েছে এবং কৌশলে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে কাবু করা হয়েছে। অপর দিকে 'শিল্পের জন্য শিল্প' এই শ্লোগান দিয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উর্বর জীবন থেকেও অসংখ্য মেধাবীকে বানানো হয়েছে নির্ভেজাল নাস্তিক, না হয় নারী উপাসক, প্রকৃত স্থায়ী কাপুরুষ।

টলস্টয় জীবনবাদী শিল্পী ছিলেন। বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্ক কামনা করেছিলেন।

Science and art are closely connected as the heart and the lungs, so if one organ is diseased the other cannot function properly.

অর্থাৎ বিজ্ঞান এবং শিল্প হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের মতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং একটাকে রোগে ধরলে অন্যটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। টলস্টয় বিজ্ঞানকে সামাজিক উদ্দেশ্যে সুদীপ্ত দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন :

বিজ্ঞানকেও সামাজিক উদ্দেশ্যমুখী হতে হবে। উদ্দেশ্যহীন গবেষণা সমাজের অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে না। তাই প্রকৃত বিজ্ঞান হচ্ছে এটা জানা- আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত কি বিশ্বাস করা উচিত নয়, মানুষের সম্মিলিত জীবন কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত কিভাবে উচিত নয়।

আল্লামা ইকবাল কেন সমাজমনস্ক এবং রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন :

যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যেভাবে ভারতে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে তার কর্মকাণ্ড ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। তারই জন্যে আমি রাজনীতির ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছি।

সুতরাং সমাজ সংগঠনের আন্দোলন এবং শিল্প-সংস্কৃতির আন্দোলনের মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে দেয়ার অর্থ হলো, একটি সুস্থ-সবল দেহ থেকে একটি চিরজাগ্রত চিত্ত প্রবাহকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।


www.nagorikpathagar.org

# ইসলামী সংস্কৃতি

একজন মনীষী ইসলামী সংস্কৃতির একটি তৎপর্যগত দিকের উল্লেখ করে বলেছেন: 'ইসলাম সমষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতির স্থুল-সূক্ষ্ম সবগুলো বৃত্তিরই সুসামঞ্জস্য ও কল্যাণমুখী পরিচর্যা এবং ব্যবহারিক জীবনে ও বাস্তব পরিবেশে তার প্রকাশ সমর্থন করে। আর এই হলো ইসলামী সংস্কৃতির অর্থ...!'

আর একজন মনীষী ইসলামী দর্শনকে ইসলামী সংস্কৃতির নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে বলেছেন:

ইসলাম একটি জীবন দর্শন। এই জীবন দর্শন মানুষের বৃত্তিসমূহ পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহার ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাহাই ইসলামী সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামী সংস্কৃতিতে ইসলামী মূল্যবোধগুলি সক্রিয় থাকিবে; অর্থাৎ ইসলামী সমাজে সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি শিল্পকলা ইসলামী মূল্যবোধের বাহন হইবে।

ড. কাজী দীন মুহম্মদ তার 'ইসলামী সংস্কৃতির রূপ' প্রবন্ধে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিশ্লেষণধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

সাহিত্য, সংগীত... কারুকার্য, স্থাপত্য... ইত্যাদি শিল্পকলা, পেনিসিলিন, রকেট, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি বিজ্ঞান-কলা যাকে বলা হয় সংস্কৃতির বাহন। মানুষের দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ সাধনে এবং তার ব্যবহারিক জীবনে ও প্রত্যক্ষ জড় পরিবেশে সেগুলোর ফলিত রূপ। জীবন ও জগতের প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এই বৃত্তিসমূহের পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে আর সেই জন্য ওইগুলোতে মানুষের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের প্রতিফলনও হয় আলাদা রকমের। এদের উপর এই জীবনানুভূতির ও জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, গভীর ও মৌল। এই জীবন-দর্শন যখন মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিয়ামক হয় তখন সেটা শিল্প পরিচর্যার ধারা ও পদ্ধতিকে



www.nagorikpathagar.org

যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সেভাবেই তারা বিকাশিত হয়ে উঠে। ইসলাম এমনি একটি জীবন-দর্শন। তাই তার সংস্কৃতি প্রকাশের বাহনগুলো-শিল্প-বিজ্ঞানের ধারা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হয় সাহিত্যে, সংগীতে... স্থাপত্যে, চিত্রে... ফুটে উঠবে ইসলামী মননশীলতা। আর সেই শিল্পকলা যে সংস্কৃতির বাহন তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতি। আর এক কথায় মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ... আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে তাঁকে দিন-রাত করতে হচ্ছে সাধনা আর অনুশীলন... এই সাধনার সামগ্রিক রূপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যে সংস্কৃতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করে এবং যে সংস্কৃতিবোধকে প্রভাবান্বিত করে, সে জীবনবোধকেই বলা হয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ; আর এই আকিদারই বহিঃপ্রকাশ ইসলামী তমদ্দুন। সে তমদ্দুনের বাহনে অর্থাৎ শিল্প-সাহিত্যে তাই ইসলামী জীবনবোধের নব মূল্যায়নের বিকাশ চলমান।

ইসলামী সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সবচেয়ে অর্থবহ বক্তব্য রেখেছেন সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র.):

> সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। ...এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সব কিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন বিধান খোদা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন-ইসলাম' বা ইসলামী সংস্কৃতি।

মাওলানা মওদূদী (র.) এ বক্তব্যে ইসলামী সংস্কৃতির একটি বিপ্লবী এবং ব্যাপকতর সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং দ্বীন ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতিকে অবিভাজ্য রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী জীবনব্যবস্থার লক্ষ্য আর ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য একই।

## ইসলামী সংস্কৃতি ও উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ড. কাজী দ্বীন মুহম্মদ ঐ সংস্কৃতির উপাদান নিয়ে একটি জটিলতর অথচ প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন:

তমদ্দুনের বিকাশ আসলে দু'টি পরোক্ষ ও একটি প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তির ওপর নির্ভর-সাপেক্ষ:

এক. ভৌগোলিক পরিবেশ, যার সংস্থাপনা আবার প্রাকৃতিক গঠন-তাৎপর্য, সংস্থাপনা ও আবহাওয়ার ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল।


www.nagorikpathagar.org

দুই. বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিছক বাইরের প্রচেষ্টা ও অনুশীলনী: কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে অবস্থান্তর ঘটানোর- যাকে বলা হয় ব্যষ্টি এবং সমষ্টিগত উন্নতি- সেদিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দাম স্পৃহাজাত অভিব্যক্তির এক বিশিষ্ট সহায়ক পদ্ধতির মারফতে রূপায়ণ।

তিন. এই প্রথম ও দ্বিতীয় দফার বাইরের কিছু নয় বরং দু'য়ের সমন্বিত অভিব্যক্তির প্রেরণা ও তজ্জাত আত্মবিকাশের প্রচেষ্টার মৌল ধারা- যার নাম দেয়া যায় ধর্ম।

আবদুল মান্নান তালিব তাঁর 'বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব' প্রবন্ধে সংস্কৃতির মূল উপাদান সরবরাহকারী এবং 'ধর্মকে অস্বীকার করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে তার উন্নততর হবার কোনো প্রমাণ নেই' বলে উল্লেখ করেছেন এবং ইসলামী সংস্কৃতির তিনটি উপাদানের প্রসঙ্গে তিনি তার 'বাংলাদেশের সংস্কৃতি' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন এই রকম:

১. তওহিদ ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও মৌলিক উপাদান।
২. রিসালাত ও নবুওয়াত এর দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।
৩. ইসলামী সংস্কৃতির আর একটা মৌলিক উপাদান হচ্ছে আখেরাতে বিশ্বাস।

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক-চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) তার ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান পাঁচটি বলে উল্লেখ করেছেন এবং ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদানের যথার্থ ব্যাখ্যা দানের পর ইসলামী সংস্কৃতিরও মৌলিক পাঁচটি উপাদান সংক্রান্ত একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এই ধরনের:

১. জীবন সম্পর্কে তার ধারণা
২. জীবনের চরম লক্ষ্য
৩. মৌলিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারা
৪. ব্যক্তি প্রশিক্ষণ
৫. সমাজব্যবস্থা।

প্রথমটি সম্পর্কে তিনি বলেন:

দুনিয়াবি জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে? তার [অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির] দৃষ্টিতে দুনিয়া বস্তুটা কি? এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে? বস্তুত জীবনদর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে মানবজীবনের


www.nagorikpathagar.org

তামাম ক্রিয়া-কান্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশালী হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপ মূলগতভাবে বদলে যায়।

এই জীবনদর্শন সম্পর্কে 'পাক ভারতে ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা' প্রবন্ধে প্রবীণ দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন:

> ইসলাম গোড়াতে মানব-জীবনের সবগুলো দিককে স্বীকার করে নিয়েছে বলে ইসলামকে বলা হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির অনুকূলেই তার ভিত্তি গড়ে উঠেছে বলে মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন: সদ্যজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়। তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, ক্রিশ্চিয়ান বা সেবিয়ান করে তোলে।

জীবন- দর্শন সম্পর্কে আবদুল মান্নান তালিব বলেছেন খোলাখুলি কথা:

> জীবন-চর্চাই সংস্কৃতি এ কথা ঠিক। তবে এই জীবন-চর্চার পেছনে যে চিন্তা ও জীবন-দর্শন অলক্ষে কলকাঠি নেড়ে চলেছে- সেটিই হচ্ছে সংস্কৃতির আসল নিয়ন্ত্রক ও পরিকল্পক... মানুষের সংস্কৃতি শুধুমাত্র জীবন-চর্চা নয়, পরিকল্পিত চিন্তা ও জীবন-দর্শনের ভিত্তিই জীবন-চর্চার নাম।

জীবন-দর্শনের সাথে সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত যে দ্বিতীয় [সংস্কৃতির মৌলিক] উপাদানটি, সে সম্পর্কেও আবুল আ'লা মওদূদীর সুস্পষ্ট বক্তব্য:

জীবন-দর্শনের সাথে যে প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত তা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি? মানুষের এতো ব্যস্ততা, এতো প্রয়াস-প্রচেষ্টা, এতো শ্রম-মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্য? কোন্ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত? কোন্ পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত, বস্তুত এই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবনের গতির ধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর দৃষ্টিতে সংস্কৃতির তৃতীয় উপাদান হচ্ছে মৌলিক বিশ্বাস এবং ধ্যান-ধারণা। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন:

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতিতে কোন্ বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মন মানসকে কোন্ ছাঁচে ঢালাই করে? মানুষের মন ও মস্তিষ্কে কি ধরনের চিন্তা সৃষ্টি করে? এবং তার ভেতরে এমন কি কার্যকর শক্তি রয়েছে যা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবনধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে? এ ব্যাপারে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মানুষের কর্মশক্তি তার চিন্তাশক্তিরই প্রভাবাধীন। ...তার মন মানস যে ছাঁচে গড়ে উঠবে, তার ভেতর আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা-স্পৃহাও ঠিক তেমনি পয়দা হবে এবং তারই আজ্ঞাধীনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করে থাকবে।


www.nagorikpathagar.org

বিষয়টিকে বুঝবার জন্য আমরা ঘোরতর এক বাঙালী সংস্কৃতির ধারক-বাহকের একটি প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি:

> 'আমরা বর্তমানে সংস্কৃতি বলতে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী প্রভাবিত ব্যাপক অর্থেই তাকে গ্রহণ করি। কোনো একটি জনগোষ্ঠির আচার-ব্যবহার, থাকা-খাওয়া, রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি, তাদের সংস্কার-কুসংস্কারসহ জীবনের হাজারো উপকরণ ও উপাচার, তার ভাষা, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য সব মিলেই তার সংস্কৃতি।'

একটি কুসংস্কারকেও ঐ প্রবন্ধকার সংস্কৃতি বলে স্বাগত জানিয়েছেন তার বুনিয়াদী আকিদা ও ধ্যান-ধারণার দিক থেকে।

আর এক পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন:
'মনে হয় মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক: কোনো বিশেষ প্রতিমা, বিশেষ তত্ত্ব বিশেষ আচার বা বিশেষ ধরণ-ধারণ এ না হলে যেনো তার চলতে চায় না।'

'মানুষ স্বভাবত পৌত্তলিক' এই তত্ত্বটি হয়তো পণ্ডিত প্রবন্ধকার নিজের মধ্যেই লক্ষ্য করেছেন, তারপর তিনি তা গোটা মানবজাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং ধ্যান-ধারণাগত বিভ্রান্তি শুধু একটি অপরাধ নয়, রীতিমত অত্যাচারও।

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের চতুর্থটি হচ্ছে মূলত:
সংস্কৃতি মানুষকে একজন মানুষ হিসেবে কি ধরনের মানুষরূপে গড়ে তোলে অর্থাৎ কি ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর সাহায্যে সে মানুষকে তার নিজস্ব আদর্শ মোতাবেক সার্থক জীবন যাপনের জন্য তৈরি করে? কোন্ ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণরাজি ও মন-মানস সে মানুষের মধ্যে পয়দা করে এবং তার বিকাশ-বৃদ্ধির চেষ্টা করে? তার বিশেষ নৈতিক তালিম-এর মানুষ কি ধরনের মানুষে পরিণত হয়? তার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

সত্যিকার অর্থে সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য যদিও সমাজব্যবস্থার পুনর্গঠন কিন্তু ব্যক্তির উপাদান দিয়েই সে সমাজ-সৌধ নির্মিত হয়। আর সে সৌধটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার প্রতিটি পাথরের সঠিকরূপে কাটা, প্রতিটি ইটের পাকা-পোক্ত হওয়া, প্রতিটি কড়ি কাঠের মজবুত হওয়া, কোথাও ঘুণ কাঠ না লাগানো এবং কোথাও অপক্ক, নিকৃষ্ট ও দুর্বল উপকরণ ব্যবহার না করার ওপর।

ব্যক্তি প্রশিক্ষণের এই সাংস্কৃতিক উপাদানটি ইসলামের গৌরবময় দিনগুলোতে পরিপূর্ণভাবেই বিকশিত হয়েছিলো, যার সম্পর্কে মার্মেডিউক পিকথল একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন:


www.nagorikpathagar.org

> 'ইসলামে কোনো অজ্ঞ মুসলমানের অস্তিত্বের কথা পবিত্র কোরআনে কখনো ধারণা করাও হয়নি এবং মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.) ও তা কখনো কল্পনা করতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ মুসলমান কথাটি মুসলমান পদবাচক সংজ্ঞার পরিপন্থী বা বিপরীতার্থক। ইসলামের গৌরবময় দিনে একজন 'দরিদ্র মুসলমানের' মতো একজন অজ্ঞ মুসলমানকেও খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হতো।'

সাংস্কৃতির মৌলিক উপাদানের পঞ্চমটি হচ্ছে:
সে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়? তার আপন খান্দানের সঙ্গে, অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে, তার উপরস্থ লোকদের সঙ্গে তার নিজ সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে এবং সংস্কৃতিবহির্ভূত লোকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখা হয়েছে? অন্যান্য লোকদের ওপর তার কি অধিকার এবং তার ওপর অন্যান্য লোকদের কি অধিকার নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে? তাকে আজাদি দেয়া হলে কতোখানি আজাদি দেয়া হয়েছে আর বন্দী করা হলে কতোদূর বন্দী করা হয়েছে? বস্তুত এ প্রশ্নগুলোর ভেতর নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল বিষয়ই এসে যায়। আর আলোচ্য সংস্কৃতি কি ধরনের খানদান, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে তা এ থেকেই জানা যেতে পারে। দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি ঐ পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই।
'ইসলামী [জীবনবোধ] সভ্যতা' কবিতায় আল্লামা ইকবাল সাংস্কৃতিক উপাদানের একটি যুক্তিগ্রাহ্য এবং কাব্যকুশল বর্ণনা দিয়েছেন:

> উপাদান তার জিব্রিলের সৌন্দর্য্যবোধ
> আজমের শুভ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, সে ব্যাপারে ঐ পাঁচটি বিষয়ের কোনো বিকল্প নেই। কেননা অন্য কোনো প্রত্যয়ের ভেতরে ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হবার মতো কোনো ধরনের উৎস: বিশ্ববাসীর হৃদয় অর্থাৎ যে বিশ্ববাসীর হৃদয় বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত প্রথমেই তার থেকে ইসলামী সাহিত্য আশা করা যায়। দ্বিতীয় উৎস: Innate Character বা মানুষের স্বভাব। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে এই ফিতরাতের উপরই সৃষ্টি করেছেন- যা খুব বিরল এবং দুর্লভ। কোরআনের ভাষায় তাঁকে [অর্থাৎ মানুষকে] উভয় [অর্থাৎ ভালো-মন্দ] পথ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে... তবু মানুষ আবিলতায় যতোই হাবুডুবু খাক না কেনো, কখনো প্রকৃতি প্রদত্ত বিবেক তাকে জাগিয়ে তোলে। যেমন


www.nagorikpathagar.org

কবি আবু নুওয়াসের জীবন। তিনি নগ্নতা-বেহায়াপনায় ছিলেন প্রসিদ্ধ। পাপাচার ছিলো তার প্রতিদিনের কাজ। কিন্তু কখনো কখনো তিনি বিবেকের স্পর্শে চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন, শিশুর মতো কেঁদেছেন, লিখেছেন, চেতনা জাগানিয়া কোনো পবিত্র লেখা। এই লেখা তো আমরা খারিজ করতে পারি না।

সুতরাং কোনো এক মানুষ সে যে-ই হোক না কেনো, কখনো কখনো তার জীবনাচারের মধ্যে যদি ইসলামী সংস্কৃতির কোনো রূপ ফুটে ওঠে, তাহলে তার সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করার অধিকার কারোর নেই। ইসলামী সংস্কৃতির উৎস এবং সার্বজনীনতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবেচনা করেছেন সুদানের খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের শিক্ষক প্রফেসর ইযযুদ্‌দীন আল আমিন। তার বিবেচনাটি হচ্ছে:

আমাদের ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির মূল শেকড় আমাদের ইসলামী সমাজে প্রোথিত। সাহিত্যেও সে-সব দিকগুলো আনার সময় ইসলামের দর্শন ও শিক্ষাকে সামনে রেখে আনতে হবে। বরং উচিৎ হবে ইসলামের উদ্ভাস যেনো সাহিত্যের খাঁজে খাঁজে মূর্ত থাকে। অন্যের মূল্যবোধ, রীতি-নীতি যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাবো, সেখানে কিছু কিছু দিক আছে যা ইসলাম প্রদত্ত না হলেও ইসলাম তাকে অসমর্থন করে না। ক্লাসিক সাহিত্যের এসব দিক আমাদের গ্রহণ করতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এসব দিক আমাদের অযথা এড়িয়ে যাওয়াও ঠিক নয়। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক এমন কাজ যদি অন্য কেউ আঞ্জাম দেয় পৃথিবীতে আমাদের আগমন এ জন্য হয়নি যে, সেগুলোরও আমাদের বিরোধিতা করতে হবে।

## ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য

জীবনকে মহৎ করে গড়ে তোলাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। এই যে বক্তব্য, এই বক্তব্যের মধ্যে একজন প্রত্যয়বাদীর জন্য কোনো ফাঁক নেই: কিন্তু একজন সংশয়বাদীর জন্য বিভ্রান্তি ছড়ানোর সুযোগ একটা থেকেই যায়। সে সুযোগ জীবনের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নিয়ে। কেননা, একজন সংশয়বাদী অখণ্ড জীবনে বিশ্বাসী নয়, অন্যদিকে একজন প্রত্যয়বাদী একটি খণ্ডিত জীবনকে মেনে নিতে পারে না।

মূলত ইসলামী সংস্কৃতি তার লক্ষ্য সম্পর্কে কখনোই কিন্তু গোজামিলের আশ্রয় নেয়নি; সুস্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষায়:

'আনন্দেই জন্ম, আনন্দেই জীবন, আনন্দেই মৃত্যু' এই আনন্দই মুসলিম জীবনের পাথেয়, সে আনন্দে আছে সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টির সঙ্গেই আপন সন্তুষ্টি মিলিয়ে এক চরম আনন্দে পরিপূর্ণ হলে সে মহানন্দে ধেয়ে চলায় কোনো বিরোধ নেই, নেই কোনো দ্বন্দ্ব। না পাওয়ার অতৃপ্তির মাঝখানেও সন্তুষ্টি আর


www.nagorikpathagar.org

আনন্দ মিলে এক মহাতৃপ্তির আস্বাদন করে মুসলিম। তাই তার কাছে ইহজগৎ যতো সত্য, পরজগৎ তেমনি সত্য, বরং তার চাইতেও সত্য। ইহজগতের বস্তু অবয়ব কেবলই পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সেখানে পরিবর্তন নাই, ধ্বংস নাই। সমগ্র বিশ্বের প্রাকৃতিক ও জাগতিক শৃংখলা মেনে নিয়ে বিশ্বনিয়ন্তার সংবিধানের ধারা অনুযায়ী চলার পথকে আনন্দময়, সুখের করে তোলা, সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরতর, মহত্তর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য; কেবলমাত্র শিল্প-কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান মানবজীবনের এ বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলনই তার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কাজেই শিল্পানুরাগ যখন এমন পর্যায়ে পৌছে, যার সামনে জীবনের প্রধান লক্ষ্য গৌণ হয়ে পড়ে, তখন তা ইসলামবিরোধী।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য প্রসঙ্গে মার্মেডিউক পিকথল খোলাসা যে বয়ান দিয়েছেন তা যথার্থ গুরুত্বের দাবি রাখেঃ

অন্যান্য সংস্কৃতি হতে ইসলামী সংস্কৃতির সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কেননা ইসলামী সংস্কৃতি কখনো কেবলমাত্র কোনো সংস্কৃতিবান ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপূরক হতে পারে না। আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, ইসলামী সংস্কৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অগ্রসর ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণের বাহন হতে পারে না এবং এখানেই বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে তার পার্থক্য। এটা সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত সত্য যে, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সীমিত পর্যায়ে কোনো ব্যক্তিবিশেষ কিংবা ব্যক্তি-সমষ্টির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

প্রকৃতপক্ষে সার্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য, ইসলামের বিরামহীন অভিযাত্রা এই আদর্শের লক্ষ্যভূমির পথে অগ্রসরমান। ...যতো বিরাট কীর্তিময় হোক না কেনো, কোনো যুদ্ধ কিংবা সন্ধি-চুক্তির সাফল্যকে ইসলামের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাফল্যের ফলশ্রুতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে না।

'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' গ্রন্থে সম্ভবত আলাদাভাবে ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়নি। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করা হয়েছেঃ এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের [অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্বপ্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার] জন্য প্রস্তুত করা, আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয় বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী খোদাই তা


www.nagorikpathagar.org

উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে খোদার নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্মস্বাধীনতাকে খোদায়ি শরিয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবি জানায়।

## ইসলামী সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

'মুসলিম তমদ্দুনর মর্মমথা' প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ ইকবাল সৃষ্টিধর্মী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তমদ্দুনের বিকাশধারার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। বলেছেন- 'নবীর প্রত্যাবর্তন কিন্তু সৃষ্টিধর্মী। তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কালের প্রগতির সাথে যোগদান করতে। ইতিহাসের ঘটনাবর্ত নিয়ন্ত্রণ করে নব আদর্শের পৃথিবী সৃষ্টি করতে। সুফির কাছে অখণ্ড অভিজ্ঞতার প্রশান্তিই শেষ কথা; নবীর পক্ষে এ হচ্ছে যুগান্তর আনয়নকারী মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তি দিয়ে তিনি মানব-জগতের রূপান্তর সাধন করেন।

নবীর চরম আকাঙ্ক্ষা তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে একটি জীবন্ত জাগতিক শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করা। এই রূপে তাঁর প্রত্যাবর্তন তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের একটা প্রায়োগিক মানদণ্ড। সৃষ্টিধর্মী কর্মের মধ্যে নবী নিজের সংকল্পকে এবং যে সকল মূর্ত ঘটনার মধ্যদিয়ে তিনি একে রূপ দেবেন; সেগুলিকে যাচাই করে দেখেন। সামনের দুর্লভ্য বাধা জয় করার মধ্য দিয়ে নবী নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং ইতিহাসের সম্মুখে প্রকাশিত করেন। অতএব তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপণের আরেকটা মানদণ্ড হবে কি ধরনের মানুষ তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন এবং তাঁর বাণীর প্রেরণায় কি ধরনের তমদ্দুন বিকাশ লাভ করেছে।'

শুদ্ধতম সংস্কৃতির বিকাশে প্রেরিত মানুষের ভূমিকার দিকে দৃষ্টিপাত করলে অন্তত এ কথা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সংস্কৃতি এমনই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি যার অখণ্ড দেহাবয়বে লেগে গেছে সুদীর্ঘ ইতিহাসজাত স্পর্শের বৈভব।

ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের অন্যতম তরজমা দিয়েছেন এক প্রাজ্ঞ-দার্শনিক। তিনি ইসলামী সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশধারাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন 'আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও' এই আদর্শের সঙ্গে এবং বলেছেন:

ইসলামের সত্যিকার নৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক আদর্শের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলামের নৈতিক আদর্শ: সৃষ্টির জীবনের সবগুলো বৃত্তির সম্যক বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি। এতে ব্যক্তিগত জীবনে শৃংখলার সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়। সে উন্নতির


www.nagorikpathagar.org

আদর্শ আল্লাহর গুণাবলী জীবনে বিকশিত করে তোলা। আল্লাহর রাসূল (সা.) আদেশ করেছেন- তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ... আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।

ড. আবদুল বাসেত বদর ইসলামী সাহিত্যের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যর যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সে সিদ্ধান্ত ইসলামী সংস্কৃতিরও কোন কোন দিককে প্রভাবিত করে এবং সেগুলো যথাযথ বলে আমরা মনে করি। ড. বাসেত বদর বলেছেন:

ইসলামী সাহিত্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্তমান। যার অন্যতম দিকগুলো হলো:

প্রথমত: বিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্য: এই বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল অর্থাৎ যে সাহিত্য-কর্মের ভেতর ইসলামের এবং ঈমানের সৌন্দর্য বিকশিত হয় তা-ই ইসলামী সাহিত্য।

দ্বিতীয়ত: শিল্পগত বৈশিষ্ট্য। জীবন, জগৎ এবং মানুষ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞান এবং অনুভূতিকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সুসমন্বতভাবে এবং শিল্পসমৃদ্ধভাবে প্রকাশ করার নামই ইসলামী সাহিত্য। শিল্পগত না হলে তার নাম অন্য কিছু হবে। ইসলামী সাহিত্য হবে না।

তৃতীয়: পরিব্যাপ্তিগত বৈশিষ্ট্য। ইসলামী সাহিত্য কোনো নির্দিষ্ট সময় বা স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত নয়। তার চর্চার মাধ্যম শুধু আরবি হতে হবে তা নয়।

মূলত জীবন-চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি চায় পরিশীলিত জীবন-চর্চা। এই পরিশীলিত জীবন-চর্চায় যখন বিশ্বাসের আলো ফুটে উঠবে, শিল্পসঙ্গত সৌন্দর্য ফুঠে উঠবে, ফুটে উঠবে বিশ্বজনীনতা- বুঝতে হবে সে জীবন-চর্চায় ইসলামী সংস্কৃতিই বিকশিত হয়েছে।

মার্মেডিউক পিকথল বলেছেন:

> ‘ধর্ম হিসেবে ইসলাম নিজস্ব পরিসরে ও নিজের শ্রেণীগত অগ্রগতির পর অন্য যে-কোনো ধর্মের চেয়ে অধিকতর ও ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। শক্তি হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পর ইসলাম যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম সভ্যতা ও দর্শনের সম্মিলিত সাফল্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। মানে ইসলামের সাংস্কৃতির অবদানকে বিশ্বের সমস্ত ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার সামগ্রিক অবদানের সঙ্গে একপাল্লায় ওজন করা যেতে পারে। ...ইসলামী সংস্কৃতি এক বিশেষ সংস্কৃতি যার মধ্যে বিশ্বের সকল সংস্কৃতি খুঁজে পাবে তার আধার অথচ তা নিজ বৈশিষ্ট্যে একক। ইসলামী সংস্কৃতির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য : তার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপটে দেদীপ্যমান। সেই ইতিহাসের দিকে যতই দৃষ্টিক্ষেপ করা যাবে, সেই


www.nagorikpathagar.org

ঐতিহ্যের দিকে যতোই ফিরে তাকানো যাবে, ততোই ইসলামী সংস্কৃতির একটি চিরকালের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হবে।'

সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র.) বলেন-

একথা যদিও সত্য যে, মানুষের বর্তমানকাল চিরদিনই অতীতকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সেহেতু প্রত্যেক নব রূপায়ণেই পূর্ববর্তী গঠন উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আপন প্রাণ-সত্তা ও মৌলিক উপাদানের দিক থেকেই সম্পূর্ণ রূপেই ইসলামী এবং এর উপর কোনো অনৈসলামী সংস্কৃতির অণুমাত্রও প্রভাব নেই। অবশ্য এর বাইরের বিষয়ে আরবিয় মনন, আরবিয় ঐতিহ্য এবং পূর্ববর্তী সংস্কৃতিগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। ...আসল ও মূল জিনিসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি... সম্পূর্ণত ইসলামেরই গঠন-প্রক্রিয়ার ফল। ..... ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমনকি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশির ভাগই ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস...

## ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি

একবার এক রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন :

Feel free in your mind. Act freely in your expression and react freely to the environments around you. Let not the edge of your sensitivity be blunted by any sense of fear or expediency. On my behalf I can not do better than assure you in the spirit of Voltair, that I may differ, even protest, against what you say but I will defend your right to say it unless it is directed against the very existence of our homeland.

অর্থাৎ স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন এবং স্বাধীনভাবে কাজ করুন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগে কোনোভাবেই আপনার অনুভূতিকে অন্ধ-উত্তেজনার শিকার হতে দেবেন না। আমি তো ভলটেয়ারকে আপনার চাইতে ভালোভাবে বুঝতে পারি না... যাতে মতদ্বৈততা এমনকি বিরোধিতা করতে পারি। আমি বরং পারি আপনার বলার অধিকারকে প্রতিহত করতে যেটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মাতৃভূমির অস্তিত্ব নড়বড়ে করে দিতে সক্ষম।

অন্তত তিনটি  গুরুত্বপূর্ণ দিক ঐ বক্তব্যের মধ্যে রয়ে গেছে।


www.nagorikpathagar.org

একটি হচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারে। একটি হচ্ছে, বিরোধিতা করার ব্যাপারে। অন্যটি হচ্ছে মাতৃভূমির অস্তিত্ব রক্ষার ব্যাপারে। উল্লেখিত তিনটি বিষয়কে সামনে রাখলে এবং ইসলামী সংস্কৃতির বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিলে আল-কোরাআনের ছোট একটি বাক্য তার উত্তরের জন্য যথেষ্ট:

'দ্বীনের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের কোন সুযোগ নেই।'

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির আন্তর্জাতিকতার মানদণ্ড তৈরি হয়েছে কোরআনের ঐ চিরন্তন বর্ণনার আলোকেই। ঐ আন্তর্জাতিকতা অন্য কোনো সংস্কৃতিতে নেই; থাকতে পারে না। চিন্তাবিদ আবুল হাশিম বলেন:

চিন্তা-বিবেক-মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরমত সহিষ্ণুতা ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতির অন্যতম আদর্শ। এই কারণেই খিলাফত যুগে বিরুদ্ধ মত পোষণের দায়ে কাউকেই হ্যামলক বিষপানে, অগ্নি-কুণ্ডে অথবা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ হারাতে হয়নি।

ইসলামী সংস্কৃতি কপটতাকে অনুমোদন করে না এবং কপটতা উৎপাদনের কোনো প্রক্রিয়াকেই সে উদ্বোধন করে না। যেমন করে না ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও [ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতিরই একটি অংশ]। ড. আবদুল বাসেত বদর বলেছেন:

লেখক মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো স্বাধীন। তাঁকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করা সংগত নয়। আমরা ইসলামী সাহিত্যসেবিকে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। মূলত আমাদের বক্তব্য হলো, যদি আমরা কোনো লেখককে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেই, তাহলে আমাদের মধ্য থেকেই কপট সাহিত্যিকের উদ্ভব হবে... আমরা ঈমানের প্রভাবমণ্ডিত হৃদয়-কন্দর হতে যার সাহিত্য উৎসারিত হয় সেই স্বেচ্ছাসেবক চাই। আপনিই বলুন, আপনাকে কি কেউ রোজা রাখতে বাধ্য করতে পারে? কিংবা আপনার অনিচ্ছায় দান-সদকা করতে বলপ্রয়োগ করতে পারে? আমরা কি আপনাকে স্বৈরাচারীর মতো আদেশ করতে পারবো... আপনাকে সদকা করতেই হবে। না বরং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তা করবেন। মুসলিম সাহিত্যিক তেমনি। আসলে তিনি তার মুক্ত পাখায় ভর করে উড়ে চলবেন ঐতিহ্য-পারিত্রিক হাজারো রাজ্যে। নাস্তিকতার জন্যে সে-সব রাজ্যে বিচরণের দ্বার রুদ্ধ। আমাদের সাহিত্যিকরা উড়ে চলেন; আকাশ ও ধরণীর খাঁজে খাঁজে চরে বেড়ান। নানান রাজ্যের চিত্র ফুটে ওঠে তার সাহিত্যে। অন্যদের চোখে সে-সব সুদূর-দিগন্তের ছবি তমসাবৃত। সুতরাং তাদের চেয়ে প্রশস্ত পৃথিবীতে আমাদের অধিবাস এবং সবই আমাদের: তারপরও চাপিয়ে দিতে হবে?


www.nagorikpathagar.org

ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি এক সার্বত্রিক চরাচর এবং নিকষ নীলিমারই সন্ধান দিয়েছে। তবু সে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে লাগামহীন করে দেয়নি। বিষয়টি অর্থাৎ স্বাধীনতার 'স্ব' এবং 'অধীনতার' মতো ঔদার্যকে বুঝবার জন্য লিও টলস্টয়ের একটি শিল্পভাবনার সহযোগিতা নেয়া যায়। টলস্টয় বলেছেন-

সব শিল্পকে নিষেধ করা অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো উদ্ভট পরিকল্পনা। শিল্পের অনুপস্থিতিতে মানব-জীবন দুর্বিষহ। তবে ইউরোপের মতো যে কোনো আর্টকে মেনে নেয়া যায় না।

আরো খানিক এগিয়ে গিয়ে একজন প্রতীচ্য-সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ বলেছেন:

প্রতীচ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চাকে যাকে সংস্কৃতির একটি প্রাসঙ্গিক অথবা একটি গৌণ দিক বলা যেতে পারে- প্রায় উপাসনার মতো যে- অপরিসীম গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে, একজন মুসলমান তাতে অবাক না হয়ে পারে না।

## ইসলামী সংস্কৃতির রূপ

রূপ অর্থ- আকৃতি, চেহারা, সৌন্দর্য, নেত্রগ্রাহ্য বিষয়, প্রকার, রকম, স্বরূপ ইত্যাদি। আবার স্বরূপ অর্থ- স্বভাব, প্রকৃতি, নিজের রূপ, প্রকৃত অবস্থা ইত্যাদি। আমরা এখানে ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

ইসলামী সংস্কৃতি জীবনের সার্বত্রিয় সাফল্যই কামনা করে। সুতরাং সে কামনা করে সাহিত্যিক শৈল্পিক-বৈজ্ঞানিক সাফল্যও। তার চোখে এগুলো হচ্ছে সহায়ক উপকরণ অথবা পথযাত্রীর শ্রান্তি অপনোদনের মত। পূজা কিংবা প্রতীক আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত করে না সে এটাকে আদৌ।

প্রতীচ্যের এক সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ বলেন:

ইসলামী সংস্কৃতি বলতে... তা যে কোনো সূত্র হতেই উদগত হোক না কেনো... আমি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতি বোঝাতে চাইনি। আর যে কোনো উৎস থেকেই বিকাশ হোক না কেনো, তা-ও বড় কথা নয়। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমি এমনি একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত কথা বলতে চাইছি, যাতে মানবিক অগ্রগতিই একটা নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য। যে সব মানুষ কোরআনের পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে এবং তার বিধানসমূহ মেনে চলে, তাদের প্রতি মহাগ্রন্থ এ জগতে ও পরলোকে সাফল্যের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছে আল-কোরআনে শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত কোনো ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারে না। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির


www.nagorikpathagar.org

জন্য সাফল্য অর্জন। আর মানুষের সৃজনধর্মী অবদান এবং মৌলিক গুণগুলোর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের ওপরই এর সাফল্য নির্ভরশীল। উন্মেষশীল মুসলিম সমাজের কোন প্রসারণ ব্যবস্থা আল কোরআন কিংবা মহানবী (সা.) এর কোনো নির্দেশে বা আল হাদীসের অনুমোদিত না হলে বুঝতে হবে, তা ইসলামবহির্ভূত এবং ইসলামী বিধিব্যবস্থার বাইরে তার অনৈসলামিক মূলানুসন্ধান করতে হবে।

সাফল্যের পরিপন্থী হওয়ার কোনো কারণ না ঘটলেও মুসলমানরা তাদের সমাজ জীবনে এগুলোর সংযোজন বা ফলগ্রহণ দ্বারা কোনোরূপ সুফল আশা করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, কোনো কর্মপন্থা আল-কোরআনের সুস্পষ্ট কোনো বিধির পরিপন্থী হলে বুঝতে হবে তা ইসলামবিরোধী আর এটা নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও অগ্রগতিরও পরিপন্থী এবং একে গ্রহণ করলে মুসলমানেরা নিঃসন্দেহে এক অনিবার্য ধ্বংসের স্বীকার হবে। গোড়ার দিকে পৌত্তলিক আরবদের প্রতীক-পূজা এবং এর পংকিলতা ও মত্ততাময় রূপ বৈচিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো বলে কতিপয় শিল্পকলাকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে।

কারণ, সমাজের এই প্রতীকবাদিতা ও এর পাপসর্বস্ব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনের প্রয়োজন অনিবার্য ছিলো। তবে সুকুমার বৃত্তিজাত কাজগুলোর অনুরূপ একজাতীয় শিল্প পদ্ধতির অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নিরুৎসাহিত ও অন্যবিধ শিল্প পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা উভয়েরই গুরুত্ব অধস্তন বা গৌণধর্মী ছিলো।

কেননা, ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য মানবজীবনের বাড়তি উপকরণগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন, পরিমার্জন ও পরিশীলন নয়, বস্তুত সামগ্রিক মানবজীবনকে সুন্দরতর, মহত্ত্বর, মহিমাময় করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

ইসলামী সংস্কৃতির ন্যূনতম একটি প্রতিবাদী রূপ ফুটে উঠেছে আরবি ভাষাভাষী কবি আহমদ শাওকির বেশ কিছু কবিতায়। মেয়েদের পর্দা প্রথার সাথে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের দিকে সংঘর্ষ বাধে নগ্নতা ও বেহায়াপনার। শাওকি এই সংঘাতের চিত্র তার কিছু কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি যদিও এখানে একান্তভাবে সমাজকেন্দ্রিক। ইসলামের প্রচারের বিষয়টি নেই। তবুও ইসলাম অসমর্থিত নয়:

'সুন্দরী! ...ডাক শুনেই হলো প্রতারিত
স্তুতিই সব সুন্দরীকে ধোঁকায় ফেলে।
শুনে দেখ, আমার নামও ভুলেছে, যখন
ঘিরেছে তাঁকে প্রেমপিপাসু নটের দলে।
দেখলে আমায় অমনি ঘোরায় মুখটা, যেনো
দুই হৃদয়ে প্রেম ছিলো না কোনো কালে।


www.nagorikpathagar.org

এই কবিতায় কবি শাওকি পাশ্চাত্য নগ্নতার যে অস্থিরচিত্র এঁকেছেন তা পাশ্চাত্য নগ্ন-সংস্কৃতিরই স্বরূপ। কবি আহমদ শাওকির আর একটি কবিতায় রয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার জন্য তার অন্ধ অনুসরণের জন্য রীতিমত ধিক্কার। নগ্নতা কবিতার কিছু অংশ:

শুধাই ও মোর কোকিল রাণী
আমার গানের বুলবুলী
মা'বাদের সুর তোমার কণ্ঠে, কণ্ঠে তোমর মুওসেলি।
বন্দীনি মোর, হৃদয় তোমার ব্যথিত কিনা বিরহভারে
রাত কেটে যায় বিনিদ্র না
ঘুমাও পংকে নয়নভরে।
বন্দী তুমি, খাঁচায় আমি ব্যাকুল তোমার প্রেমের টানে।
রাগ করোনা মুক্তো-মানিক
সবাই লুকায় সংগোপনে।
উজাড় করে প্রেম দেবো তাই
লুকিয়ে রাখি; স্নিগ্ধ- শাখে;
পক্ষ মেলে বের হয়োনা
ভীড় করেছে শকুন, কাকে।

পাশ্চাতের নগ্নতা ও বেহায়াপনার ব্যাপারে, পরিপূর্ণ প্রত্যয়বাদী সাংস্কৃতিক যোদ্ধাদের সচেতন করবার লক্ষ্যে এবং ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে ঐ কবিতার উদ্ধৃতি টেনেছেন প্রফেসর আল-আমিন এবং বলেছেন:

কবে আবার মেয়েরা সমাজে চিৎকার শুরু করে দেয়, কবে না আবার বলে বসে আমাদের নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে, ইউরোপের নারীদের মতো অবাধ মেলামেশার দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে, সামাজিকভাবে বয়ফ্রেন্ডদের স্বামীর মর্যাদা দিতে হবে এবং তাকে পরিবারেরও সদস্য করে নিতে হবে।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ, তার প্রকৃতি অনুধাবনের জন্যে আধুনিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলামী সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ড. মুহম্মদ ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরতে হচ্ছে:

**এক.**

জাতি, গোত্র, বংশ, বর্ণ ও ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে বাস্তব বৈষম্য দূর করে এবং তাদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম তেরশ' বছরে এমন একটা কৃতিত্ব অর্জন করেছে যা অপর ধর্মবিধানসমূহ তিন হাজার বছরেও করতে পারেনি।


www.nagorikpathagar.org

আমি বলতে চাই যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থা হচ্ছে উপলব্ধি ও অনুভূতির অতীত এক জীবনতাত্ত্বিক মনস্তাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা, মিশনারী ব্যতীত মানব জাতির চিন্তা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করতে সমর্থ বর্তমান রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের উদ্ভাবিত নববিধান প্রয়োগ করে সেই কর্মতৎপরতাকে অগ্রাহ্য করে দিলে যেমন মানবজাতির অনিষ্ট সাধন করা হবে, তেমনি যে নবুওতের বিশ্বজনীনতা থেকে তার জন্ম, তাকেও বিনষ্ট করা হবে।

## দুই.

দার্শনিক কবি খাক্বানির সমসাময়িক যে সব মুসলিম চিন্তানায়ক ভাবতেন যে, গ্রিক দর্শনের আলোকে ইসলামী সত্যের ব্যাখ্যা করলেই জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সম্ভব হবে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই কবি এ পংক্তি ক'টি লিখেছেন। এর অর্থে সামান্য একটি পরিবর্তন করলেই তা আজকের দিনের মুসলিম চিন্তানায়কদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেঃ

দ্বীনের বাহন আমাদের
জন্মলাভ করেছে আরবের মাটিতে
চিহ্নিত করো না তার উরুদেশ
ইউনানি দাগে;
অপরিণত নয়া শিক্ষার্থী যারা
বগলে তাদের দিও না
দুর্ভাগ্যের লিপি-ফলক।

## তিন.

কোরআনের মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সাংস্কৃতিক অথবা রাজনৈতিক অনুভূতির দিক দিয়ে একটি জাতি কায়েম করে দেয়। এই কারণেই কোরান সুস্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ইসলামের জীবন-পদ্ধতি ব্যতীত যে-কোনো পদ্ধতিকেই অস্বীকার করতে হবে। জ্ঞান এবং বুদ্ধির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় ঐ দু'টি বিষয়ের যথার্থ বিকাশের মধ্য দিয়ে। মূলত ইসলামী সংস্কৃতি জ্ঞান এবং বুদ্ধির চর্চাকে অপরিহার্য করে, তার বিকাশের পরিপন্থী কোনো মতাদর্শকে সে প্রশ্রয় দেয় না।

ইসলামী সংস্কৃতির স্বরূপ উদ্ধারের জন্য হযরত ওমর (রা.) এর সময়কালের একটি ঘটনা এবং হয়রত ইবনে আব্দুল আজিজ (রা.) এর আমলের একটি ঘটনাকে তুলে ধরা যায়ঃ


www.nagorikpathagar.org

আদি ইবনে নযলা হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর একজন প্রশাসক। অশ্লীল কবিতা পরিবেশনার খবর গেলো খোদ ওমর ফারুক (রা.)–এর কাছে। আদি ইবনে নযলা অভিযুক্ত হলেন এবং পদচ্যুত হলেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের আমল। আমর ইবনে রাবিয়া এবং আবুল আহওয়াস কবিতায় অশ্লীলতা প্রয়োগের অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ রা. দু'জনকেই দেশান্তরিত করলেন। অবশ্য আমর ইবনে রাবিয়া পরে তওবা করেছিলেন এবং তার তওবাকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, ইসলামী সাহিত্য ইসলামী সংস্কৃতিরই একটি বাহন। ইসলামী সংস্কৃতি কি ধরনের সাহিত্যের বিকাশধারাকে স্বাগত জানায় তা বুঝবার জন্যে ওপরে আমরা মাত্র দু'টি উদাহরণ পেশ করেছি। কিন্তু ঈঙ্গিত দিয়েছি ইসলামী সংস্কৃতির অন্যান্য বাহনগুলোর মূলভিত্তি নীতি-পদ্ধতি কি হবে, তারও।

## উপসংহার

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মরহুম ড. হাসান জামান 'সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে সমাজ সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন:

আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বাদ দিয়ে আমাদের সমাজ সংগঠন করতে অগ্রসর হই, তবে আগে চলার ধাপ্পা আমাদের পেছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তা হবে গতির নামে বিকৃতি ও পরের ধনে পোদ্দারি। ...

সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সহনশীলতা, ধৈর্য ও আত্মনির্ভরতা আমাদের বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের তমদ্দুন ও জীবনদর্শনের যোগসূত্র সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের ব্যাপারেও তিনি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন:

অজ্ঞানতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষার কুয়াশা আমাদের জীবন ও জীবনবোধের আসল রূপ সম্পর্কে একটা ঘোলাটে ভাব তৈরি করেছে। তাছাড়া ইসলামী সমাজ ও আমাদের দেশে এতোদিন কায়েম হয়নি। কাজেই সাহিত্য, তমদ্দুন ও সমাজের সংগে আমাদের জীবনদর্শনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যোগসূত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা গঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অপরিসীম।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে উল্লেখিত উদ্ধৃতি অনুপ্রেরণাবহ, সন্দেহ নেই।


www.nagorikpathagar.org

বলা বাহুল্য, গত কয়েক দশকে আমাদের মূল্যবোধ ও শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক অধঃপতন ঘটেছে তা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎকে এক ভয়াবহ শূন্যতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রই আজ অশিক্ষা ও নৈরাজ্যের শিকার। এই অশিক্ষা ও নৈরাজ্যের অর্থাৎ সর্বৈব শূন্যতার আশু মোকাবেলা না করলে আমাদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ অভিভাবকহীন অরাজকতার মধ্যে অচিরেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে বলে ধরে নেয়া যায়। সুতরাং একটি দুঃখজনক অন্ধকারকে প্রতিবাদহীনভাবে মেনে নেয়া শুধু অন্যায় নয়, অপরাধও।

'মানুষ বাঁচে না, সে কিছু বাঁচিয়েও রাখে, তার বেঁচে থাকার রূপময়তা এবং বাঁচিয়ে রাখার ফলশ্রুতি নিয়েই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। দীর্ঘদিনের জীবন-চর্চার নিয়ম ও জীবন চর্চার ফসল একত্রিত হয়ে সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ নির্মিত হয়। মানুষের স্বাধীন সত্তা তার সাংস্কৃতিক তৎপরতার মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির সত্তা বজায় রেখে চলতে না পারলে জাতীয় অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। জাতি হিসেবে টিকে থাকা যায় না। আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে না পারলে দেশ থাকে না, দেশের স্বাধীনতা থাকে না।'

সত্যিকার অর্থে, সাংস্কৃতিক বিজয় ছাড়া রাজনৈতিক ও সামরিক বিজয়ও ক্ষণস্থায়ী হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে যদি আমরা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় বিকশিত হতে চাই তাহলে আমাদেরও অবশ্যই অচলায়তনের দ্বার ভেঙে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উজ্জ্বল হতে হবে।

আজকাল আমরা প্রায়ই অপসংস্কৃতির কথা শুনে থাকি। অপসংস্কৃতির জয়-জয়কারে আমরা ভীত ও আতঙ্কিত। সুস্থ ও নিরাপদ জীবনযাপন এখন আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষার বিষয়। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি কেন সমাজে অপসংস্কৃতি ও অসুস্থতার আবির্ভাব? আসলে সমাজে যদি সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তথা ইসলামী সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা জোরদার হতো এবং পত্র-পল্লবে বিকশিত হতো, তাহলে অপসংস্কৃতির বদলে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্পন্দনে আমাদের মন-মানস ও সমাজ হতো স্পন্দিত। পৃথিবীতে কোন কিছুই শূন্য থাকে না। পৃথিবীর যে কোন অঙ্গনেই, ভালো বা মন্দ এ দু'য়ের যে কোনো একটি আসন গেড়ে বসবেই। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে এখন আমাদের অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভীত ও আতঙ্কিত না হয়ে সুস্থ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। মুসলিম জাহানের গৌরব ড. ইকবাল একদা বলেছিলেন :

শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাই দেশের একমাত্র সমস্যা নয়। সাংস্কৃতিক সমস্যা মুসলিমদের পক্ষে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রশ্ন অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে কোনক্রমেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।



www.nagorikpathagar.org

১৯৩২ সালের ২১ মার্চে এক বক্তৃতায় তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন :

আমি....সবগুলো বড় বড় শহরে.... সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করি।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও চট্টগ্রামের এক সম্বর্ধনা সভায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

আমাদের ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম) হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান-আরাফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা এসে এখানে ভীড় করুক।

সুতরাং সময়ের এক অকুণ্ঠ দাবী হচ্ছে : ইসলামী সংস্কৃতিকে জানা এবং যথার্থ ইসলামী সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসা।



www.nagorikpathagar.org

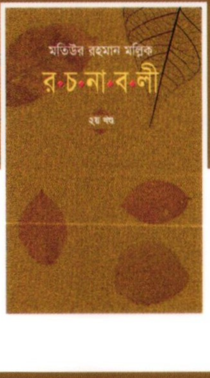


দেশজ প্রকাশন

**Motiur Rahman Mollik**
**Rachanabali- 2nd Part**
Published on September 2024
Price: 610 Tk only

ISBN: 978-984-98985-7-3